□ প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৭ / ডিসেম্বর ১৯৬০

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ

**শ্রীসমরেশ বসু**

শ্রদ্ধাস্পদেষু

□ বড়গল্প □

১
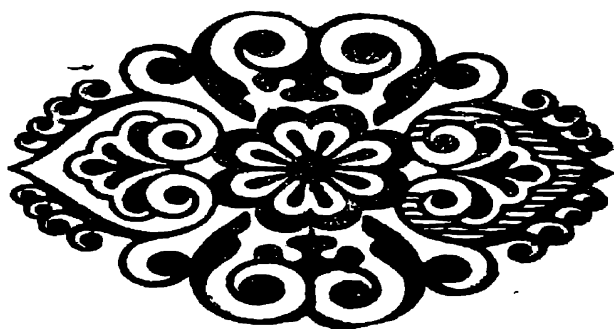
নবাব ছেলেটা খুবই নোংরা আর একগুঁয়ে স্বভাবের ছিল। তবু যে জারিনা তাকে পছন্দ করত, তার কারণ জারিনার হাতে ধুম্‌ধাম্‌ পিটুনিখেয়ে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদত ঠিকই, তারপর আবার সব আগের মতই করেও যেতো, অন্য সব চাকর বাকরদের মত রাগ করে বিছানাপত্তর বেঁধে পিট্টান দিত না।

ধসালাগা গমের যেমন রঙ হয়, তার মুখের রঙ ছিল তেমনি, তার ওপর আবার বসন্তের দাগ। পাতলা টিঙ্‌টিঙে চেহারা আর সেই চেহারানিয়েই যে পরিমাণ খেতো, জারিনা তো বুঝতেই পারতো না যে খাদ্যগুলো যায় কোথায়। কথা বললে সামান্য তোত্‌লামি আছে বোঝা যেতো। আর যখন দাঁড়াতো—কখনও সোজা ভাবে দাঁড়াতে পারতো'না ; এসেই দেয়ালে বা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে আধবাঁকা হয়ে দাঁড়াতো, পা ঘষতে থাকতো মেঝেতে, মাথাটা বাঁদিকে হেলে পড়তো, একটা হাত মাথার ওপর তো অন্য হাত দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে। আর মেয়েদের মত হাত নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলার অভ্যেস তো ছিলই। যেমন মেয়েরা বলে—কথাগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে বা চ্যাপ্টা করে করে, কি রবারের মত টেনে টেনে, নবাবও তেমনি করে কথা বলত। কিন্তু বাইরের কাজকর্মে খুব হুঁশিয়ার ছিল। সে জন্যেই তার এসব হাস্যাস্পদ হাব-ভাব বা মেয়েলীপনা সত্ত্বেও তাকে ছাড়িয়ে দেবার কথাই উঠতো না।

বাড়ীর একমাত্র বাবুর্চি তো দিন তিনেক ধরে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। ফলে—নবাবকেই রান্নাঘরের কাজকর্ম সামলাতে হচ্ছে। যদিও তার সে কাজ করার কথা নয়। কারণ বাইরের অন্যান্য কাজের জন্যই তাকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জারিনা মেয়েদের কলেজে পড়াতে যায়, আমার নিজেরও তো অফিস আছে। কাজেই নবাব রান্না না করলে

আর করবেটা কে? তার চেয়েও কঠিন সমস্যা বাবুর্চি খুঁজে আনবে কে? এ বাড়ীতে তো কারও সে ফুরসতই নেই।

তা সেই নবাবকে যখন তিন দিন ধরে তরকারি কুটে, রশুন পিশে, মশলা বেটে, কারি-কোর্মা বানাতে হলো, তার সমস্ত তোতলামি আর মেয়েলিপনা ঘুচে গেল। মর্দ-জোয়ানের মত কড়া, ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল সেদিন—"সাহেব, আমার দ্বারা এসব হবে না আমাকে একদিনের ছুটি দিন। আমি আপনাদের জন্যে একজন বাবুর্চি খুঁজে আনি।"

"তোমার পরিচিত কোন বাবুর্চি আছে নাকি?" জারিনা তার ঝাঁঝালো স্বর উপেক্ষা করে মিষ্টি করে হেসে জিজ্ঞেস করল।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খোলা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই ফের নবাবের সেই মেয়েলিপনা উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। তার ওপর স্বয়ং ঘরের গিন্নির মিষ্টিমুখের হাসি পেয়ে একেবারে যেন গলে গেল। একদিকের কাঁধ ওপরে তুলে অন্যদিকেরটা নামিয়ে বাঁদিকের কোমর বাঁকিয়ে ডানদিকে খানিক দুলিয়ে দিয়ে একেবারে বিগলিত দুই হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলল, "যে করে হোক, নিয়ে আসব কাউকে না কাউকে আপনার জন্যে।" চোখ মুখ ঘুরিয়ে নাচিয়ে বাবুর্চি সমস্যাটাকে একটা রহস্যপূর্ণ রাজনৈতিক গুপ্ত তথ্যের মত আমাদের কাছে এমনভাবে বলল যে হৃদ্‌পিণ্ডটা জ্বলে কাবার হয়ে গেল আমার! ইচ্ছে হ'লো—দুই থাপ্পড় মেরে শালার ইতরামো একেবারে ঘুচিয়ে দিই। কিন্তু গরজ বড় বালাই! বাবুর্চির দরকার, আর খোঁজবার ফুরসত না আছে আমার না জারিনার। সে জন্যেই নবাবকে একদিনের ছুটি দিতেই হলো।

একদিন বাদে সেদিন রবিবার। বেজার হ'য়ে নিজের ঘরেই বসেছিলাম আমি। সকালবেলাই মেঘলা। ময়লা ময়লা আলোতে ঘরের মধ্যে বসে নিজের মাথা নিজেই টিপে যাচ্ছিলাম। কখনও কখনও আমার মনে হয় মাথাটা আমার টুথপেষ্টভর্তি টিউবের মত; যতক্ষণ না টিপছ' কিছুই বেরুবে না।

এর মধ্যেই দেখি কি নবাব দরজার দুপাশে হাত রেখে, গলাটা

একদিকে বাড়িয়ে আধখোলা চোখ নিয়ে আমাকে দেখছে।

"হি হি ! মুচকি হেসে বলল, "আমি বাবুর্চি নিয়ে এসেছি।"

"কোথায় আছে ?"

নবাব এবার ঢোক গিলে সহজ হয়ে দাঁড়াল। দু'হাত দরজার ওপর থেকে নামিয়ে কোমরের ওপর রাখল। তারপর একটু পিছিয়ে গিয়ে কাউকে রাস্তা দিয়ে বলল : "ভেতরে চলে এস !"

কালো, রোগা-পাতলা, কটা চোখওয়ালা লোকটা ভেতরে এল। বয়স পঁয়ত্রিশের মত হবে ছোট ছোট কালো কালো দুটো ঠোঁট, ছোট ছোট কটা চোখ, রুক্ষমাথায় অবিন্যস্ত চুল, গালদুটো ভেঙ্গে ভেতর দিকে বসে গেছে, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পানের ছোপ ধরা ময়লা জমেছে. দাড়ি কামানোও ভাল হয়নি, গাল বা থুতনীর নিচে খোঁচা খোঁচা দাড়ি রয়েই গেছে। শরীরের ভেতরটা আমার কেমন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠল :

"তুমি বাবুর্চির কাজ কর ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আজ্ঞে।"

"তোমার নাম কি ?"

"ওমপ্রকাশ।"

আমি তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলাম। তারপর নবাবকে বললাম: "একে বেগম সাহেবার কাছে নিয়ে যাও। উনি দেখে নিন, চাইলে রাখতেও পারেন।"

দুপুরে খাবার সময় শাহজহানী কোর্মা ছিল আর সিমলাই মরিচে ভরা কিমা, তার সঙ্গে আলুর দম। মটরপোলাও আর রায়তা, সঙ্গে দুরকমের মিষ্টি—শাহীটুকরা আর দুধের হালুয়া। প্রত্যেকটা জিনিষই অতীব সুস্বাদু ঠিক যেটা যে রকম হওয়া উচিত।

আমি খুশী হয়ে বললাম, "ওমপ্রকাশ, রান্না তো তুমি বেশ ভালই করেছ।"

"ওমপ্রকাশ ?" জারিনা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এর নাম তো ইশ্‌তিয়াক ?"

আমি বাবুর্চির দিকে তাকালাম। সে তখন দুহাত পেছনে নিয়ে

এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে না তাকিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি রে? তুই আমাকে নিজের নাম মিথ্যে করে বললি কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম বাবুর্চিকে, একটু কড়া ভাবেই।

বলল, "সাহেব, যখন আমি আপনার ঘরে এলাম আর আপনাকে দেখলাম, তো আমার মনে হলো আপনি বোধ হয় হিন্দু। তো আমি আপনাকে নিজের নাম বললাম ওমপ্রকাশ। তারপর যখন বেগম সাহেবার ঘরে গেলাম, তো আমার মনে হলো ইনি বোধ হয় মুসলমান। তো আমি ওনাকে নিজের নাম ইশ্‌তিয়াক বলে দিলাম।"

"আরে বেবকুফ! তুই একঘরে ওমপ্রকাশ আবার অন্যঘরে ইশ্‌-তিয়াক হবি কি করে?"

"দিল্লীতে এইরকম করতে হয় সাহেব! একঘরে ওমপ্রকাশ তো দ্বিতীয় ঘরে ইশ্‌তিয়াক বলতে হয়,—পেট রুটি চায়, সাহেব।" বেশ একটু অভিযোগের স্বরেই সে কথাগুলো বলল, আর তার কথাগুলো থেকে এটাও বেশ বোঝা গেল যে তার এই অভিযোগ কেবল নাম মিথ্যে করে বলতে হয়েছে সে জন্যে নয়, বরং তার আসল অভিযোগ— পেট কেন রুটি চায়?

গরমকাল দুপুরের দিকে তাপ যখন বাড়তেই লাগল, তখন আর একবার স্নান করার জন্য হুড়বড় করে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। নব্‌টা ঘুরিয়েই বুঝলাম যে শাওয়ারটা খারাপ হবে গেছে। নবাবকে ডাকলাম। সে তখন তালুতে চব্‌চব্‌ করে তেল মাখতে ব্যস্ত। ইশ্‌তিয়াক এলো প্রায় দৌড়তে দৌড়তে। তাকে বললাম, চকের মোড়ে যাও। প্লাম্বার মুন্সীসিংকে ডেকে আনো। শাওয়ারটা খারাপ হয়ে গেছে।"

"আমি ঠিক করে দিচ্ছি" ইশ্‌তিয়াক বলল।

"তুমি?"

সে মাথা নেড়ে খুবই আত্মবিশ্বাসের স্বরে বলল, "আজ্ঞে, আমি প্লাম্বিং-এর কাজও জানি।"

পাঁচ মিনিটেই সে শাওয়ার ঠিক করে দিল।

বিকালে দেখা গেল পেডেস্টাল পাখাটা খারাপ। চলছে না। জারিনা নবাবকে ডাকতে জানা গেল তার এখনও দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা ভঙ্গ হয়নি। অগত্যা ইশতিয়াকেই ডাকা হলো। তাকে বলা হলো যে সে যেন চকে গিয়ে পাখাওলার কাছে নিজে বসে থেকে পাখাটাকে ঠিক করিয়ে নিয়ে আসে। ভীষণ গরম পড়েছে আজ। রাত্রে পাখা না চললে অসুবিধা হবে।

অনেকক্ষণ ধরে পাখাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ইশতিয়াক। তারপর দুহাত কোমরে রেখে পাখাটার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'হুজুর! আমি এই পাখা ঠিক করে দিতে পারি।'

'সে কি! তুমি পাখার কাজও জান নাকি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নীচু করে বলল, "আজ্ঞে! ইলেক্ট্রিকের কাজও জানি। পাখা ফিট্‌করে ফেলতে পারি। এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দেড়ঘণ্টার মধ্যে পেডেস্টাল-ফ্যান ফর্‌ফর্ করে চলতে আরম্ভ কলল। —আমি তো ইশ্‌তিয়াকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। সে একটু লজ্জাপেল। একটু লজ্জার হাসি হাসল। শেষে সঙ্কুচিত, লজ্জিতভাবে একটু কুঁক্‌ড়েগিয়েই যেন রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

রাতের খাবার ছিল রামপুরী মুরগী। মুরগী ছুরি দিয়ে কাটতেই ভেতরে বিরিয়ানি, বিরিয়ানির নীচেই চিকেন-চাট। চিকেন-চাট খাওয়া হয়ে গেলেই তার নীচে বাদাম আর কিস্‌মিস্ দিয়ে ডিমের রসালো বড়া। আস্ত মুরগীর পেটের ভেতরে গোলকধাঁধার মত স্তরে স্তরে সাজানো অদ্ভুত রান্না, কিন্তু অতীব সুস্বাদু, মজাদার!

আমি তো একটা টাকা বখ্‌শিষ দিয়ে দিলাম। তো সে মাথা ঝুঁকিয়ে সাতবার কুর্নিশ করল, বলল:

"আপনি দিলেন এই দান,<br>অধম দাসের এই তো পরম সম্মান।"

"আরে!" বিস্মিত আমি বলে উঠলাম।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ," মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে বলল, "আমি একজন কবিও বটে। আমি "তুহ্‌নাই" ছদ্মনামে লিখে থাকি!"

২

কবিদের দেখলেই আমার শরীরের ভেতর একেবারে পাক দিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে। শুনেছি যে তারা নাকি সবসময় খচরমচর করে পান চিবোয় আর অনবরত কবিতার লাইন বমি করতে থাকে। প্রথমে তো মনে হলো আজই ব্যাটাকে জবাব দিয়ে দিই। কিন্তু পরবর্তী বিশ দিনেই মালুম হলো ইস একজন 'মহাশয়' ব্যক্তি। আরও অন্ততঃ বিশ-বাইশ রকমের কাজে তার পেশাদারী দক্ষতা। বেতের চেয়ার বুনতে পারে, মোড়া ঠিক করতে পারে। কাঠের ভাঙ্গা চোরা জিনিষপত্র বেশ দুরস্ত হাতে সারিয়ে নিতে পারে—কেন না, ছুতোরের কাজও একসময় সে করেছে, সিনেমার গেটকীপারি করেছে। ফল বিক্রি করেছে। বড় পানের দোকানে কাজ করেছে। ঠেলা টেনেছে। খেলনা তৈরীর কারখানায় কাজ করেছে। নাপিতের কাজ করেছে সেলুনে। সেলাই ফোঁড়াই থেকে কাপড় ধোলাই—অর্থাৎ ধোপার কাজও একেবারে পেশাদারী দক্ষতায় পরীক্ষা করা হয়েগেছে। ভালো মালিশ করতে তো পারে বটেই, কপালে হাত ঠুকে ঠুকে মাথার যন্ত্রনাও সারিয়ে দিতে পারে। কান পালিশ, কানের ময়লা সাফ করাতেও ওস্তাদ। ভাল চাট্ বানাতে পারে। আর সবচে' বড়কথা হলো—খোরাক অতি কম। আর জারিনার তো এই গুণটাই সবচে' মনে ধরেছে। কেন না, নবাবের খাবার বহর দেখে ও সব সময় খিচড়ে থাকে। সেজন্যেই ও ঘরের সমস্ত কাজ আস্তে আস্তে ইশ্‌তিয়াকের হাতেই তুলে দিল।

মাস দুয়েকের মধ্যেই সারা বাড়ীতে ইশ্‌তিয়াকের একেবারে একচ্ছত্র আধিপত্য হয়ে গেল। এমন দৌড় দৌড়ে সে কাজ করতে লাগল যে নবাব তো আরও কহিল আর নিষ্কর্মা হ'য়ে যেতে লাগল।

আর আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে ইশ্‌তিয়াকও যেন এইটাই চাইছিল। বয়সে নবাব ইশ্‌তিয়াকের চেয়ে সতের আঠার বছরের ছোটই হবে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইশ্‌তিয়াকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে আরম্ভ করল নবাব যেন সে-ই মালিক আর ইশ্‌তিয়াক তার গোলাম। প্রথম প্রথম আমার মনে হলো যে হয়তো বা কৃতজ্ঞতা বশতঃই ইশ্‌তিয়াক সব মেনে নিচ্ছে। তারপর মনে হলো—হ'তে পারে নবাবের ওপর ইশ্‌তিয়াকের কোন রকম দুর্বলতা জন্মে গেছে। কেন না, নবাবের মত মানুষের হুকুম মেনে নেওয়া বেশ উদারতার পরিচয়। দোষ দেখেও না দেখা, খারাপ কথা শুনেও না শোনা, কোন রকম চিন্তা ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে কাজ করে যাওয়া—এ সবই দুর্বলতা ছাড়া আর কি! কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম আমার এই ভাবনা চিন্তা ঠিক নয়। নবাবের প্রতি ইশ্‌তিয়াকের কোন রকম কৃতজ্ঞতা বা দুর্বলতা কিছুই নেই। তার কেবল একটা ইচ্ছাই প্রবল। সেটা হ'চ্ছে, অন্যদের খাওয়ানো। অন্যদের খাওয়াতে পারলেই সে একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আন্তরিকভাবে খুশী হয়। সে যেহেতু কম খেতো, সেজন্যে নিজের ভাগের খাবারও সে বেশীটাই নবাবকে দিয়ে দিত। আমাদের খাইয়ে দেবার পর তরকারী টরকারীর বেশীর ভাগটাই আলাদা সরিয়ে রাখত। প্রথমে নবাবকে খাওয়াতো, তারপর নিজে খেতো। আস্তে আস্তে এমন হলো যে নবাব আর কাজে কর্মে বিশেষ মনোযোগই দিতনা। কাজ করা সে প্রায় ছেড়েই দিল। একেবারে বড় ঘরের বিবিদের মত কেবল খাটে শুয়ে শুয়ে আলিস্যির হাই তোলা আর আড়মোড়া ভাঙ্গা—এই তার কাজ হয়ে দাঁড়াল। আর আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে নবাবের এই ভান করে পড়ে থাকাটাকেই ইশ্‌তিয়াক খুব কঠিন অসুখ বলে বর্ণনা করতে বেশ মজা পাচ্ছে। তারজন্যে ওষুধ আনা, বাজার থেকে ফলমূল, বিড়ি সিগারেটের পয়সা সে নিজেই জোগাতো। কখনও কখনও এক আধটা—বুশশার্ট আর পাজামা বা পাতলুনও সেলাই করে দিত। শেষে এমন হলো যে ইশ্‌তিয়াকের বেতনের বেশীর ভাগটাই নবাবের জন্যই খরচ হ'তে

লাগল আর নবাব তার নিজের বেতনের পুরোটাই বাঁচিয়ে নিজের মা-এর কাছে—আলীগড়ে পাঠিয়ে দিতে লাগল।

জারিনা বেশ কয়েকবারই ইশ্‌তিয়াককে বোঝালো। নিজের টাকা পয়সা—সঞ্চয়ের উপকারীতার কথাও বলল। কিন্তু ইশ্‌তিয়াকের ওপর জারিনার কথার কোনও প্রভাবই পড়ল না। হেসে বলল, "বেগম সাহেব! ছেলেমানুষ, খাচ্ছে তো কি হয়েছে!"

"আরে, কম্‌বখ্‌ত্‌, তুই নিজের জন্যে অন্ততঃ কিছু রাখ, নিজের কিছু কর!" জারিনা বেশ রেগে গিয়েই তাকে বলত, "অন্যের জন্যে নিজে কেন মরছিস্?"

"আমার আর আগু পেছুতে কে আছে বেগম সাহেব?" ইশ্‌তিয়াক মাথা নীচু করে জবাব দিত, "ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, বাপ নেই—সবাই ভরতপুরের দাঙ্গায় মারা পড়েছে। বুকের ভেতরটা সবসময় আমার খালি খালি লাগে!"

কয়েকদিন পর নবাবের মার কাছ থেকে চিঠি এল। আলীগড় থেকে। নবাবের জন্য একটি কনে ঠিক করা হয়েছে। মায়েরই পছন্দ। দু'মাস পর বিয়ে। মা তাকে তাড়াতাড়ি যেতে লিখেছে। সাইকেল ওলা গফুর, যার কাছে দিল্লীতে আসার আগে নবাব কাজ করত, সে আবার তাকে কাজে নিতে প্রস্তুত। সে জন্যেই নবাব আবার আলীগড়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত হ'য়ে গেল। আমরাও ভেতরে ভেতরে বেশ খুশীই হলাম। কারণ, নবাব ইদানীং বলতে গেলে মুকতেই শুধু শুধু খেয়ে যাচ্ছিল। কোন কাজই করত না। সব কাজই তো ইশ্‌তিয়াকই করে নিতো। জারিনাও ঠিক করে ফেলেছিল যে নবাব চলে গেলে বাইরের অন্যান্য কাজের জন্য আর কাউকে রাখবে না। ইশ্‌তিয়াক থাকতে অন্য কোন চাকরের দরকারও নেই।

জারিনা বলল,—"ছাখ্‌, নবাবের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এবার তুইও একটা বিয়ে করে ফেল, ইশ্‌তিয়াক। তোর বউকেও আমার কাছেই রেখে দেব। আমার একজন চাকরানীরও দরকার।"

বিয়ের নামেই, আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ইশ্‌তিয়াক যেন কেমন

হয়ে গেলো। ওর মুখটা গম্ভীর হ'য়ে গেলো। অবিন্যস্ত মাথার চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে পাকিয়ে যেন টেনে উবড়ে নিতে চাইল। আর ওর ছোট ছোট ঠোঁট দুটো তির্ তির্ করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। মাথা নীচু করে খাবার ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

সে চলে যাবার পর নবাবের মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল। খাবার টেবিলের কাছে এসে বেশ রাজকীয় ঢঙে বলল, "আরে সাহেব! ও বিয়ে করবে কি! ওর বউ তো বিয়ের দ্বিতীয় দিনেই ওকে ছেড়ে ভেসে গেছে।"

"কেন?" জারিনা জিজ্ঞেস করল।

"জানি না, বেগম সাহেব।" নবাব বলল, "ওতো কিছুই আর বলে না।"

কয়েক মিনিট পর আমাদের খাওয়া শেষ করে যখন বাথরুমে হাত মুখ ধুতে এলাম তো দেখলাম ইশ্তিয়াক রান্নাঘরে এঁটো বাসন পত্তর আর একরাশ ছাই সামনে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে, আর ওর ছোটো ছোটো চোখে কে জানে কেন অজানা দুঃখের অশ্রুজল এসে দূর আকাশের গায়ে নক্ষত্রের মত চিক্ চিক্ করে চম্‌কে চম্‌কে উঠছে।

এই প্রথমবার ইশ্তিয়াকের জন্য আমার বুকটা ভারী হয়ে এলো।

৩

আট-দশ দিন বাদে নবাব আলীগড়ে ফিরে যাবার সব বন্দোবস্ত করে ফেলল। সে চলে যাবে তাই ইশ্তিয়াক লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদল। তার চোখ দুটো সব সময়ই ভেজা ভেজা থাকত আর ঠোঁটদুটো কেবলই পড়্তো। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা কিছু বলত না। নবাবের জন্যে সে খাবার তৈরী করল বেশ ভাল করে। ট্রেনে খাবে। যদিও মাত্র ঘণ্টা আড়াইয়ের রাস্তা, তবু কিমারপুর দিয়ে পরোটা, শুকনো লঙ্কার

আচার, আলুভর্তা, বেসনদিয়ে রুটি আর এক তাবুড়া মাখন। নবাবের ক্ষিদে যে বেশী তাতো সে জানতই। নিজের খরচেই সে নবাবের জন্য এসব খাবার তৈরী করল। আর সে জন্যেই আমরা কিছু বলতেও পারলাম না। নিজে গিয়েই সে নবাবের জন্য স্কুটার-ট্যাক্সী ডেকে নিয়ে এল। জিনিষপত্র স্কুটারে তুলে নবাবকে পুরোনো দিল্লীর ষ্টেশনে একেবারে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে এলো।

দিন দুই ঘরে সে এমন উদ্বিগ্ন আর অস্থির ভাবে চলা ফেরা করতে লাগল যেন তার সর্বস্ব খোয়া গেছে, আর সে নির্জন ধূ ধূ মাঠের মধ্যে উদাসীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাওয়া দাওয়া একেবারেই যেন ছেড়ে দিল। কোর্মা রান্না করল বিস্বাদ, মুখে দেওয়া যায় না, ডাল এত পাতলা করল যেন কেউ তার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা জল ঢেলে ভাসিয়ে দিয়েছে। রুটি করেছে বেডৌল, ত্যাঁড়া ব্যাঁকা, তারওপর ছোপ্ ছোপ্ ছাই লাগা যেন তার মনের বিষণ্ণতার মতোই।

দুদিন তো কোন রকমে সেই সব ছাই পাঁশ আমরা গলার ভেতর দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম—ভাবলাম যদি এই রকমই চলে তো ইশ্ তিয়াককে জবাব দিতেই হবে।

কিন্তু দুদিন পরেই ইশ্ তিয়াক সামলে নিল। কোত্থেকে যেন একটা বিড়ালের বাচ্চা তুলে নিয়ে এল। সেটার ওপরেই তখন ইশ্ তিয়াক সব ভালবাসা উজার করে দিল: সেটাই হলো তার চোখের মণি। ঘরের কাজ করার পর বাকী সমস্তটা সময়, যেটা সে আগে নবাবের জন্য ব্যয় করত, এই বিড়ালের বাচ্চাটার জন্যে খরচ করতে লাগল। নিজের বেতনের বেশীর ভাগটাই বিড়ালের বাচ্চার জন্য দুধ, মাছ, মাংস কিনে খরচ করতে লাগল। আর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই বিড়ালের বাচ্চাটাও নবাবের চেয়ে কোন অংশে কম খায় না। এমন কি তার ভাব ভঙ্গী চলাফেরাও নবাবের চাইতে কিছু কম নয়। একেবারে নবাবের মতই ইত্ রামো আর অহঙ্কারী স্বভাব এই বিড়ালের বাচ্চার। যা হোক, দুদিনেই ইশ্ তিয়াক সামলে নিল। রান্না বান্না ঠিক হ'তে হ'তে আবার—আগের মতই চলতে লাগল।

আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ইশ্‌তিয়াকের কোন কাজেই না নেই, কারণ, মোটামুটি সবরকম কাজেই তার একধরণের পারদর্শিতা আছে। এবং সেজন্যে তার কোন রকম নাক উঁচু ভাবও নেই। বরং এমন একটা জেদ যে আমাকে এই কাজটা করে দেখিয়ে দিতে হবে। নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে সে সদাই উন্মুখ; একটা অদ্ভুত তন্ময়তা তার বুকের মধ্যে এমনই প্রবল ভাবে ধাক্কা দেয় যে সব কাজই শেষ না করা পর্যন্ত কিছুতেই সে ক্ষান্ত হয় না—হ'তে পারে না, তা কাজটা সম্পর্কে সে কিছু জানুক বা না জানুক। ক'দিন ধরে রেডিওটা খারাপ হয়ে রয়েছে। আর আমি যেহেতু রেডিওর কাজ খুব ভাল করেই জানি, তাই জারিনা বেশ করেকবারই আমাকে রেডিওটা ঠিক করে দিতে বলেছে। কিন্তু সারাটা দিন অফিসের কাজের ঝকমারির পর বাড়ী ফিরে এসে শরীর যে পরিমাণে ক্লান্ত থাকে তাতে রেডিও সারাতে বসার ইচ্ছেই হয় না। সে জন্যেই আমি আজ না কাল বলে ঠেকিয়ে রাখছিলাম।

একদিন অফিস থেকে সবে ফিরেছি, দেখি কি ড্রইংরুমের এক কোণায় রেডিওর ভেতরের সব যন্ত্রপাতি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে আর ইশ্‌তিয়াক বেশ ঘাব্‌ড়ে গিয়ে সেগুলোকে আবার ঠিক ঠিক জায়গায় লাগাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পাশেই জারিনা শুকনো মুখ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমি চোখ দিয়ে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলাম যে ব্যাপারখানা কি?

জারিনা বলল, "ইশ্‌তিয়াক বলল যে রেডিও আমি সারাতে পারি। তোমাকে কদিন ধরে বলছি। তোমার তো ফুরসতই হয় না। সে জন্যে ইশ্‌তিয়াককেই কাজে লাগিয়ে দিলাম। দু আড়াই ঘণ্টা ধরে কাজ করে যাচ্ছে। তুমি তো বলেছিলে যে সামান্য গোলমাল হয়েছে।"

আমি তো ব্যাপারটা দেখেই বুঝে গেছি। ইশ্‌তিয়াক এক একবার মাথা চুলকোচ্ছে, আমার দিকে চোরা চাউনিতে দেখছে আর খুটুর খাটুর কাজ করে যাচ্ছে। পরিস্কার বুঝতে পারছিলাম যে খুলে তো

ফেলেছে রেডিওটা, কিন্তু এখন আর ঠিক মত জায়গারটা জায়গায় বসিয়ে জুড়তে পারছে না। মুখটুখ ঘেমে গেছে।

জারিনাকে চলে যেতে বলে আমি ইশ্‌তিয়াকের সঙ্গে কাজ করার জন্য বসে পড়লাম। ইশ্‌তিয়াককে কিন্তু আমি বুঝতে দিলাম না যে সে রেডিওর কাজ জানেনা এটা আমি ধরে ফেলেছি। বরং এইভাবে আমি কাজ করতে লাগলাম যেন ইশ্‌তিয়াকের নির্দেশমতই আমি রেডিওতে যন্ত্রগুলো জুড়ে যাচ্ছি।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে গেলো রেডিও। জারিনা তো মহাখুশী। দু'টাকা বখ্‌শিষই দিয়ে দিল ও ইশ্‌তিয়াককে। তারপর দিন কয়েক বাদে ফের ইশ্‌তিয়াকের কেরামতি দেখাবার পালা এল। জারিনা সেদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে ফেলল, "আচ্ছা, তুই রসগোল্লা বানাতে পারিস্?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।" ইশ্‌তিয়াক তক্ষুনি বলে উঠল।

"তাহলে একদিন বানিয়ে দেখা।"

"আজকে রাতেই বানাবো।"

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে রান্নাঘরে কি সব খটর পটর করতে লাগল সে। ছোট্ট উনুনটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলল। মুখেও বিড়ি জ্বলতে লাগল। প্রায় রাত একটার সময় রান্নাঘরের বাতি নিবল। পরদিন ইশ্‌তিয়াক জলখাবারের সঙ্গে একেবারে যেন ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা, তাজা, সুস্বাদু, সুগন্ধী গোলাপ জল দেওয়া রসগোল্লা পরিবেশন করল।

"এই রসগোল্লা তুমি বানিয়েছো, ইশ্‌তিয়াক?" অবাক বিস্ময়ে জারিনা জিজ্ঞেস করল।

"আজ্ঞে' এই অধমই বানিয়েছে।" ইশ্‌তিয়াক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি নীচে ঝোঁকানো, পা দিয়ে পাপোষটার ওপর ঘষতে ঘষতে বলল।

"একেবারে যেন দোকানের রসগোল্লা বলে মনে হ'চ্ছে।" জারিনা কতকটা তারিফের স্বরে বলে উঠল।

"সেটাইতো এর চালাকি", আমি বললাম, "সোজা দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসেছে আরকি।"

"মোটেও না, স্যার," ইশ্‌তিয়াক জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল।

তার প্রতিবাদের ধরণ দেখে জারিনার সন্দেহ যেন বেড়ে গেল। বললঃ "ঠিক আছে। আজ রাতে আমার সামনেই রসগোল্লা বানাবে। আমি দেখবো।"

"আজ্ঞে, ঠিক আছে।"

রসগোল্লা বানাবার জন্যে কিছু জিনিষপত্র কেনার পয়সাকড়ি ইশ্‌তিয়াকের হিসেব মত দেওয়া হল। দুপুরে বাজারে বেরিয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে এল ইশ্‌তিয়াক। জারিনা তো থলের ভেতরের সমস্ত জিনিষপত্র পরীক্ষা করে দেখল যে সত্যিই দোকান থেকে রসগোল্লা সে কিনে এনেছে কিনা। রাতে খাওয়ার পাট চুকে যাবার পর খুব ঠাট-বাটের সঙ্গে রান্নাঘরে রসগোল্লা বানাবার কাজকর্ম শুরু করে দিল ইশ্‌তিয়াক। ভেতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল জারিনা। পনের কুড়ি মিনিট পর উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখতেও লাগল রান্নাঘরের মধ্যে সত্যিই কি করছে ইশ্‌তিয়াক। প্রায় রাত দুটোনাগাদ যখন চোখের ঘুম আর বাধা মানছেনা, সেই সময় রসগোল্লা তৈরী হয়ে গেল। ইশ্‌তিয়াক একটা প্লেটে করে রসগোল্লা নিয়ে এল। চিনির শিরার মধ্যে টিক্‌টিকির ডিমের চাইতেও যেন ছোট সাদা সাদা কতকগুলো গুলির মত সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জারিনা তো চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আরে, এগুলো রসগোল্লা? ছাগলের নাদির মতন?

এখন ছোট দেখছেন। দেখুন, বুঝে দেখুন বেগম সাহেব, এই রসগোল্লা গুলো এখন এইরকম ছোটো, কিন্তু রাত ভর শিরা খাবে, খেয়ে ফুলে উঠবে, ফুলতে ফুলতে সকালে উঠে দেখবেন একেবারে রসগোল্লা—এই এত বড় বড় সাইজ হয়ে গেছে।"

জারিনাও বিশ্বাস করল না, আমিও না। কিন্তু ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছিল। আমরা শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে, জলখাবারের সময়

পুরো গোল রসে টইটম্বুর সাদা ধব্‌ধবে রসগোল্লা পেয়ে গেলাম। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে রাতে দেখা ছোট ছোট কুইনিনের বড়ির মত দেখতে রসগোল্লাগুলো ফুলে গিয়ে এইরকম বড় হয়ে গেছে। কিন্তু সারারাত জাগবে কে? চৌকিদারীই বা কে করবে। ইশ্‌তিয়াক নিশ্চয়ই খুব ভোরে উঠে দোকান থেকে রসগোল্লা কিনে এনেছে আর রাতের ওই সাদাগুলিগুলো নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। তা আর কি করা যাবে। যে লোক নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সারা রাত জেগে থাকতে পারে এমন কি নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে অন্যদের রসগোল্লা খাওয়াতে পারে, কেবল নিজের তুচ্ছ অহঙ্কারটুকু বজায় রাখার জন্যে, সে লোকের পেছনে লেগে আর কি লাভ!

৪

বিড়ালের বাচ্চাটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আর মমতাও বাড়ছে ইশ্‌তিয়াকের তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই দেখি একটা সুন্দর বিড়াল সারাবাড়ীতে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোমগুলো একেবারে মাখনের মত মোলায়েম, গলায় মিষ্টি মিউ, আর ঘুর্‌ঘুর্‌। আর যখন ঘাড় ঘুরিয়ে, চোখ দুটো ঘুরিয়ে কটাক্ষে চাইত' ইশ্‌তিয়াকের দিকে তখন তো বেচারার একেবারে কাহিল অবস্থা। সত্যিই বিড়ালটা হয়ে উঠেছিলও তেমনি, মোটা সোটা, তুলতুলে, আদুরে আদুরে, কখনও ধীরপায়ে কোমর নাচিয়ে চলছে তো কখন আবার একেবারে চঞ্চল হ'য়ে উঠে একলাফে ইশ্‌তিয়াকের কাঁধে চড়ে বসে তার গাল চেটে চেটে আদর করছে। কখনও বা ইশ্‌তিয়াকের কোলে বসে আরামসে রোদ পোয়াচ্ছে, কখনও আবার তার দুহাতের মধ্যে আরাম করে টানটান হয়ে শুয়ে মজা উপভোগ করছে যেমন নারী পুরুষের দু'বাহুর মাঝে নিজেকে সমর্পণ করে। কখনও বা দুষ্টুমী করে, উপেক্ষাভরে, শরীরটা বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গে অলস ভঙ্গীতে, আর ইশ্‌তিয়াক তাকে ধরতে গেলেই মুখ লুকিয়ে পালাতে থাকে, তখন ইশ্‌তিয়াকের মুখেরভাবে

এক বিচিত্র. অনাস্বাদিত আনন্দ নাচতে থাকে, সে, থেমে গিয়ে মুখে হাসি নিয়ে দেখতে থাকে বিড়ালটাকে। ইশ্‌তিয়াক বিড়ালটার নাম রেখেছিল গুলশন কিন্তু আদর ক'রে সে ডাকত 'গুল্লা' বলে।

একদিন—সেদিন আমি বাড়ীতে ছিলাম না, ইশতিয়াক গিয়ে জারিনার বেডরুমের দরজায় ঠক্ ঠক্ করল। শীত পড়বার সময় হ'য়ে এসেছে তাই জারিনা সকালের রোদ্দুর ঘরে এসে পড়তে নাইট-গাউনটা পরেই বসে বসে সোয়েটার বুন্‌ছিলো।—"কে?" জারিনা জিজ্ঞেস করল।

"আমি—ইশ্‌তিয়াক"

"ভেতরে এসো" জারিনা বলল।

হাতে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বেশ কিছুটা সঙ্কুচিতভাবে, সমম্ভ্রমে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর নিঃশব্দে কাগজ পেন্সিল বাড়িয়ে ধরে বলল, "লিখুন!"

জারিনা বলল, "কি, কালকের হিসাবপত্র? এখন নয়, পরে দেখব' খন!"

"হিসাব নয়।"

"তাহলে কি?"

"আপনি লিখুন তো···" ইশ্‌তিয়াক বার বার কাগজ পেন্সিল বাড়িয়ে ধরতে লাগল জারিনা কাগজ পেন্সিল নিয়ে কিছুটা রুক্ষ স্বরেই জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কি?"

"একটা গজল গানের তিনটে স্তবক তৈরী হয়েছে।"

জারিনা থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ওর মনের মধ্যে হাসি ফুটে উঠতে লাগল। মুখেও হাসি এনে বলল, "তুমি নিজে লিখে নিতে পারছ' না।"

"আজ্ঞে না, আমি লিখতেও পারিনা, পড়তেও পারিনা"

"···কিন্তু কবিতা বানাতে পারি!" জারিনাই বাকী কথাগুলো পুরণ করল।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, ঠিকই! কবিতা আমি বানাতে পারি। আপনি

*লিখুন, আমি বলে যাচ্ছি।”*

“তা বলুন শুনি···” জারিনা একটু বিরক্তি মেশানো ব্যঙ্গের স্বরে বলল।

ইশ্‌তিয়াকের চোখ ছুটো বন্ধ হয়ে গেল। একটা বিচিত্র তন্ময়তা নেমে এলো তার মুখের রেখায় রেখায়। বলতে লাগল সে ঃ

“তন্‌হাই’ আমার নাম, গুলশন তোমার নাম, সে যাহোক তাহোক; আমি মরছি তোমার জন্যে, তুমি পাচ্ছ আমাকে ভয় সে যাহোক তাহোক।”

“কিন্তু এর বিষয়টা কি?” জারিনা জিজ্ঞেস করল।

“বিষয়?” ইশ্‌তিয়াক অপ্রতিভ হয়ে চোখ ছুটো খুলে উত্তর দিল, “এটাতো দেখতেই পাচ্ছেন গজল খাঁটি গজল।”

“কিন্তু এর ছন্দটা কি?” জারিনা একটু টিপ্পনী কাটল।

“খুবই চমৎকার ছন্দ আছে, বেগম সাহেব, আপনি লিখুনই না।” ইশ্‌তিয়াক খুবই আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বলল। অতিকষ্টে জারিনা হাসি চেপে রেখে বলল, “ঠিক আছে, বলে যাও!”

ইশ্‌তিয়াক আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল আর যেন গভীর সমাধিতে ডুবে গিয়ে বলতে লাগল ঃ

তোমার বিরহে আমি চঞ্চল লাউয়ের মত, সে যাহোক তা হোক;

‘তনহাই’ বলে, এই বাগানে এখন কে এলো, সে যা হোক, তা হোক।”

জারিনা বলল, “তনহাই বলে···কিন্তু তন্‌হাই তো স্ত্রীলিঙ্গ?”

“কিন্তু ‘তন্‌হাই’ তো আমার ছদ্মনাম আর আমি তো স্ত্রীলিঙ্গ নই।” ইশ্‌তিয়াক বুঝিয়ে বলল। তার মুখে এমন একটা উপেক্ষার হাসি ফুটে উঠল যেন সে বলতে চাইল—আরে, বেগম সাহেব! এসব গান আর কাব্যের সূক্ষ্ম ব্যাপার আপনি আর এসবের কতটুকুই বা বুঝবেন!

“আর এই ‘চঞ্চল লাউ,’ এটা কোন্ দেশী উপমা, তন্‌হাই সাহেব!” জারিনা ঠোঁটের কোনে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল।

“আমাদের মোরদাবাদে এই রকম ভাবেই বলে।” ইশ্‌তিয়াক

জবাব দিল।

জারিনা কাগজ পেন্সিল বেডরুমের জানলা দিয়ে একদম বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর যেন গর্জে উঠল, "ইশ্‌তিয়াক, আর কোন দিন যদি আমাকে কবিতা বা গজল শোনাতে আসিস্‌, তাহলে তক্ষুনি এই বাড়ী থেকে বিদায় করে দেবো।"

ইশ্‌তিয়াক লজ্জায় শিঁটিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে ফেলল। তারপর মাথা চুলকোতে লাগল। সত্যি সত্যিই খুবই অসহায়, লজ্জিত বলে মনে হলো তাকে। জারিনার মনটা নরম হয়ে গেল হঠাৎ। এই লোকের ওপর রাগ করে থাকা যায় না। তাই নরম স্বরে মুচকী হেসে বলতে লাগল, "আমার মতে তুমি যদি এই সব কবিতা-গানটান ছেড়ে দিয়ে নভেল লেখার দিকে মনোযোগ দাও তো সেটাই ভাল হবে তোমার পক্ষে।"

তক্ষুনি মাথা তুলে ইশ্‌তিয়াক বলে উঠল, "একটা নভেল তো প্রায় তৈরী করে এনেছি।"

"তাই! কি নাম?" জারিনা জিজ্ঞেস করল।

"লাইফ এণ্ড কুক্‌।" ইশ্‌তিয়াক ইংরেজীতে বলল।

৫

ইশ্‌তিয়াকের ইংরেজী ছিল অনেকটা সেকালের ইংরেজ সাহেবদের বাবুর্চিরা যেমন বলত তেমনই। কিংবা বলা যায়, আজকাল বড়বড় কারখানায় অশিক্ষিত মজদুররা কাজ করতে গিয়ে যেমন নানারকম টেক্‌নিক্যাল শব্দ নিজেদের মত করে শিখে নিয়ে বলে তেমনই ইশ্‌তিয়াকের ইংরেজী। এই ইংরেজী শব্দগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে, অবশ্য ধাতু ক্রিয়াটিয়ার ধার ধারে না এসব শব্দ। কিন্তু আসল বিষয়টি এমন প্রাঞ্জল হয়ে যায় যে আজকাল ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ফাইনাল পড়তে গিয়ে যতটুকু ইংরেজী শেখে তার চেয়ে যে ভাল, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

একদিন ইশ্‌তিয়াক বেশ সুন্দরভাবে আমার মাথাটা টিপে দিচ্ছিল। তো আমি তাকে বললাম, "তুমি এতরকমের সব কাজ জানো। যদি তুমি যে কোন একটা কাজ নিয়ে লেগে থাকতে তো তোমার খুবই উন্নতি হয়ে যেতো।"

"সাহেব, কোন কাজেই আমার মন বসে না," ইশ্‌তিয়াক একটা ছোট তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, "এক বছর ছ'মাস একটা কাজ করলাম, তারপরই সেটা ছেড়ে অন্য একটা কাজ গিয়ে লাগলাম। এভাবেই জীবনের পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটা বছর কেটে গেল। বাকীটুকুও এভাবেই চলে যাবে।"

"তা তুমি একটাই কাজে লেগে থাকতে পার না কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"মন বসে না।" ইশ্‌তিয়াক মাথা নীচু করে প্রথম অপরাধীর মত লজ্জিত স্বরে বলল," আমার বুকের ভেতরটা সবসময় খালি খালি লাগে।"

"মিঁয়াও।"

দরজার ধারে এসে গুল্লো বড় বড় চোখ করে ইশ্‌তিয়াকের দিকে দেখতে লাগল। ইশ্‌তিয়াক তাকে কোলে তুলে নিয়ে নরম লোমের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "গুল্লোর খিদে পেয়েছে, ওকে দুধ খাইয়ে আনি।"

"যাও।"

ইশ্‌তিয়াকের ওপর মাঝে মাঝে কি যেন একটা ভর করে। সেই সময় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের খেয়ালে মগ্ন হয়ে বসে থাকে। কি জানি কিভাবে। নিজে নিজেই হাসছে, পায়চারী করছে, কখনও বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। কখনও আবার বিড়্‌বিড়্ করে কি সব বলছে তো বলছেই। কি ভর করে তার ওপর? কি সে বেদনা, যন্ত্রনা, ভেতরটা তার কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে—কে জানে! কিছুই তো বলে না। কখনও কখনও নেশাও করে। আমার স্থির বিশ্বাস—যখন বুকের

ভেতর যন্ত্রণা আর শূন্যতার বোঝা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তো তখন সে কোন নেশা অবশ্যই করে ; কেননা, মাসে দু-একদিন এমন হয়ই যখন ইশ্‌তিয়াক কোন কাজই করতে পারে না। সারাদিন প্রায় মরার মত নিজের চারপাইটার ওপর পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে বুকটা উঁচু করে কাশির তীব্র দমকটা চাপতে গিয়েও পারে না যেন। তারপর দুদিন পর যখন হুঁশ হয়, তখন কিছু বলতে গেলে বিশ্বাসই করতে চায়না যে ইতিমধ্যে দুদিন কেটে গেছে, তারিখ বদলে গেছে, এবং সে যে কোন নেশা করেনি, এটাও বেশ জোর দিয়ে বলে। আমরাও এজন্যেই চুপ করে থাকি যে কাজকর্ম তো খুবই ভালভাবে করে। নিজের কাজে যে কেবল দক্ষ তাইনা, প্রায় শিল্পীই বলা যায় : আর শিল্পীদের যে মাথার যন্ত্রপাতি একটু ঢিলে ঢালা হয় —তা তো সবাই জানে।

এজন্যেই কখনও কখনও এমন হয় যে বললাম হায়দারাবাদি বেগুন রান্না করতে তো খাবার সময় এমন অদ্ভুত একটা রান্না সামনে ধরেছিল, বাটিভরতি—ট্যাল্‌টেলে পাতলা ঝোল, তার মধ্যে ভালো হয়ে পুড়ে যাওয়া ছোট ছোট বেগুনের টুকরোগুলো নেংটি ইঁদুরের মত যেন সাঁতার কাটছে।

"এটা কি হায়দরাবাদি-বেগুন ?" জারিনা চিৎকার করে বলে ওঠে।

"আজ্ঞে না, এটা চায়না-টাউন", ইশ্‌তিয়াক নির্বিকার বলে যায়, "একদম নতুন রকমের রান্না। খেয়ে দেখুন, চাখুন, বুঝবেন একদম নতুন রান্না, নতুন স্বাদ।"

"এক্ষুনি তুলে নিয়ে যা এগুলো, না হলে তোর মাথায় ঢেলে দেব আমি।" আমি একেবারে গর্জে উঠি। কারণ বাটিরদিকে তাকিয়েই আমার প্রায় বমি উঠে আসার জোগাড়।

তখনকার মত ইশ্‌তিয়াক তো বাটিগুলো তুলে নিয়ে গেল, কিন্তু পরে একসময় সে জারিনাকে বলল, "সাহেবের কি অবিচার দেখুন! উনি খাবারটা একটু চেখে না দেখেই বাতিল করে দিলেন···"

ইশ্‌তিয়াক মেটে-কালিয়া ভীষণ ভাল রান্না করে। একবার

কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হলো। ইশ্‌তিয়াককে ভাল করে মেটে কালিয়া রান্না করতে বলা হলো। খাবার জায়গা করে অন্যান্য সব তরিতরকারির সঙ্গে নেহাৎই দুর্গন্ধেভরা, যেন পচা-গচ্‌রা কি একটা জিনিষ এনে সামনে রাখল।

"এটা কি মেটে-কালিয়া না কি?" জারিনা প্রায় হায় হায় করে উঠল।

"আজ্ঞে না," ইশ্‌তিয়াক তক্ষুণি উত্তর দিল, "এটা হচ্ছে স্পেট্।"

"স্পেট্! স্পেট্ কি? তোমাকে তো মেটে-কালিয়া করতে বলেছিলাম—বলেছিলাম কিনা?" জারিনা ভীষণ রাগে বলে উঠল।

"আজ্ঞে, তা বলেছিলেন। মেটে-কালিয়াটা কেমন গ্যাচ্‌রা মেরে গেল, তাই সেটা দিয়েই আমি নতুন একটা রান্না করে ফেললাম।"

ইশ্‌তিয়াকের এই অভ্যেসটা এখন আমাদের জানা হয়ে গেছে যে যখনই কোন কারণে তরকারি ইত্যাদি খারাপ হয়ে যায় তক্ষুণি যে একটা নতুন নাম দিয়ে সেটাকেই খাবার সময় পরিবেশন করে দেয়, আর খারাপ হয়ে যাবার কারণটা এমনভাবে বর্ণনা করে বলতে থাকে যেন কোন বড় এবং ভদ্রঘরের ছেলে যদি নিজে থেকেই খারাপ হয়ে যায় তাতে তার তো কোনও হাত নিশ্চয়ই থাকতে পারে না।

এখন কি বলব এটাকে? ক'জন এমনই মান্য অতিথিকে খেতে বলেছি যে তাদের সামনে ধমক ধামক করে নিজেকে তো আর ছোট করতে পারি না। তা না হলে ইশ্‌তিয়াককে আজ আমি তাড়িয়েই ছাড়তাম ঠিক। কিন্তু বিশিষ্ট অতিথিদের কথাভেবেই চুপ করে গেলাম। তা ছাড়া, অন্য সবকটা তরিতরকারীই এত ভাল হয়েছিল যে চুপ করে যেতেই হলো।

যাহোক, দুপুরের এই খাওয়ার পর অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ম্যাটিনী শো দেখতে চলে গেলাম। যাবার আগে জারিনা রাত্রের খাবার কি হবে সে সব ইশ্‌তিয়াককে বুঝিয়ে বলে গেল। ম্যাটিনী শো দেখে বিকেলে যখন আমরা ফিরলাম, তো দেখি যে বাড়ীর সামনে দমকলের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বহুলোক জমায়েত হয়েছে চারপাশে।

রান্নাঘরের চিম্‌নি, ছাত আর জানালাগুলো থেকে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

"আগুন! আগুন! আমার ঘরটা বাঁচাও।" বাড়ীওলা তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে।

"ইশ্‌তিয়াক কোথায়?" আমি জিজ্ঞস করলাম।

"কি করে জানব?" বাড়ীওলা ছুহাতে মাথার চুল টানতে টানতে বলে উঠল, "এক ঘণ্টা ধরে চেঁচাচ্ছি। দরজাটা খুলছেই না। রান্না-ঘরের ভেতরই হয়তো নেশা করে বেহুঁশ পড়ে আছে!"

আমি আর জারিনা ছ'জনে মিলে চিৎকার করে ডেকে ডেকে শেষে ইশ্‌তিয়াককে দিয়েই দরজা খোলালাম। সে তো যেন খুব ঘাবড়ে গেছে এমন ভাবভঙ্গী করে রান্নাঘর থেকে বেরুলো। তারপরই ধোঁয়া দেখে ফিরে রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে ছুটো উনুনেই জল ঢেলে ঢেলে নেবাতে লাগল। ছুটো কড়াতেই তরকারী সব পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। কিন্তু, ঈশ্বর জানে, কি এমন মশলা দিয়েছিল যে ঘন, কালো মেঘের মত ধোঁয়া তখনও ছুটো কড়াই থেকে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

"আগুন! আগুন!" রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে বাড়ীওলা তখনও সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

"আগুন! আগুন কোথায়" উদ্বিগ্নমুখে ইশ্‌তিয়াক জিজ্ঞেস করতে লাগল।

জারিনা কোনমতে রাগ দমন করে বলল, "ইনি বেচারী একঘণ্টা ধরে চেল্লাচ্ছেন, দরজায় ছুম্‌দাম্‌ পেটাচ্ছেন আর তোমার কোনও হুঁশই নেই। এমন কি দমকলের গাড়ী এসে গেছে। আর তুমি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্তে বসে আছো!"

ইশ্‌তিয়াক এবার চারপাশের জমায়েত লোকেদের দৃষ্টি তারও পরেই দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে ফেলল। একটা আঙ্গুল দিয়ে নিজের মাথায় টোকা মেরে বলল:

"খুব জোর ঝগড়া চলছিল।"

"কিসের ঝগড়া?" জারিনার রাগের পারা চড়তে লাগল, "তুমি

তো এখানে একা একা বসে আছো ?"

"কোর্টে মোকদ্দমা চলছিল।"

"কিসের মোকদ্দমা ?"

"পৈতৃক বাড়ী নিয়ে মোকদ্দমা চলছিল—আমার আর খুড়তুতো ভাই লতিফের মধ্যে। স্ব-পক্ষের উকিল আর বিরোধীপক্ষের উকিলদের মধ্যে কথা কাটকাটি—ঝগড়া চলছিল।"

"কোথায় সেই তোমার স্ব-পক্ষের উকিল আর ভাই লতিফরে বিপক্ষের উকিল ?" জারিনার রংগের পারা আরও চড়ে গেল।

"আমি নিজেই তো দু'তরফের উকিল। নিজেই কোর্ট, নিজেই বিচারক-বিচারালয়। নিজেই সওয়াল করছি, নিজেই জবাব দিচ্ছি।" ইশ্‌তিয়াক প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল।

"কিন্তু ঝগড়াটা চলছিল কোথায় ?" দাঁতে দাঁত পিষে জারিনা জিজ্ঞেস করল।

"এখানে !" ইশ্‌তিয়াক নিজের মাথায় একটা আঙ্গুল ঠেকিয়ে বলল। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৬

ইশ্‌তিয়াকের প্রতি জারিনার যে একটা সমবেদনার ভাব ছিল, তা কমতে লাগল। আমারও। বাবুর্চি হিসেবে ভাল হওয়া সত্ত্বেও তার এই সব খামখেয়ালী পনা আমাদের পক্ষে বিলক্ষণ বিপদের কারণ হ'য়ে দাঁড়ালো। ইশ্‌তিয়াকের চেয়েও বেশী বিরক্ত করে মারছিল আমাকে তার আদরের বিড়াল গুলশন। আমি তো এতদিন বলতে গেলে ইশ্‌তিয়াকের মুখ চেয়েই সহ্য করে যাচ্ছিলাম। ইশ্‌তিয়াক চাইতো না যে সে ভিন্ন আর কেউ তার ওই সাধের বিড়াল নিয়ে মাথা ঘামাক। অথচ, তার বিড়াল, ওই গুলশন, বোধ হয়, প্রভুর মতে সায় দিতে রাজী ছিল না। গুলশন বিড়াল হলে কি হবে, চাইত যাতে আমিও তাকে সমানভাবে আদর যত্ন করি এবং এজন্যে সে চেষ্টার ত্রুটি

করত না। একদিন সে আমার ঘরে কোমর নাচিয়ে হেলতে দুলতে এসে হাজির। কিন্তু আমি শ্ শ্ শ্ করে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিলাম। তারপর একদিন যখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না বিড়ালটা সেই অবকাশে আমার বিছানায় উঠে দিব্যি শুয়ে পড়ল। আসলে ঘুমোয়নি মোটেও, ঘুমোবার ভান করে শুয়েছিল। সময়টাও বেছে নিয়েছিলো বিড়ালটা ঠিক আমি যাতে অফিস থেকে ফিরেই দেখতে পাই। ভাবটা এইরকম যে দেখো, আমি তোমার বিছানায় উঠে শুয়ে থাকব, আর যদি তুমি এটা মেনে নাও, বরদাস্ত করো, তাহলে এরপর দ্বিতীয়বার তোমার বুকের ওপর উঠে শুয়ে থাকব। অর্থাৎ, আমি যেমন তাকে কিছুতেই আমার কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে উপেক্ষা করে যাচ্ছি, তেমনি আমি যাতে তাকে আদর করে কাছে টেনে নিই সেটা সম্ভব করতেও সে পদ্ধপরিকর। সেদিন তো আমি ওটাকে বিছানার ওপর শুয়ে থাকতে দেখেই রাগের চোটে ঘাড় ধরে তুলে বিছানার নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বেটা বিড়াল তো রেগে গর্‌গর্ করে উঠে লেজ তুলে কোমরে একটা উপেক্ষার ঝট্‌কা মেরে ঘরের বাইরে চলে গেল। কিন্তু এর প্রতিশোধ গুলশন এমনভাবে নিল যে দ্বিতীয় দিন অফিস থেকে তো এসেছি—তা দেখি কি শিমুল তুলোয় তৈরী দুটো বালিশই ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে, আর গুলশন তখনও সমানে পথ দিয়ে টেনে টেনে আরও ছিঁড়ছে আর ঘরময় তুলোগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। আমার মাথায় একেবারে খুন চড়ে গেলো। একলাফ দিয়ে যেই ধরতে গেছি অমনি গুলশনও তরাক্ করে একলাফে ঘরের বাইরে চলে গেলো ; আর পরিত্রাহী চিৎকার করতে লাগল "ম্যাঁও মিয়াঁও।" কিন্তু আজ আমারও প্রতিজ্ঞা এই আপদটাকে না মেরে ফেলে আমি ছাড়ব না। আমি বেরুবার সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর একবার ড্রইংরুম, তো ফের বেডরুম, বেডরুম থেকে রান্নাঘর, রান্নাঘর থেকে বাথরুম গুলশনের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে ধরে ফেললাম। তারপর তার গলা চেপে নিয়ে ধরে চললাম ঘরের বাইরে। ইশ্‌তিয়াক তো তাই দেখে ছুটে এসে আমার মুখের চেহারা দেখে থম্‌কে গিয়ে আমার

পেছু পেছু আসতে লাগল। আমি যে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছি সেটা বুঝেই মুখে কোন কথা বলতে পারল না। কেবল তার ঠোঁটের কোন দুটো থির্ থির্ করে কাঁপতে লাগল।

বড় রাস্তার কাছে এসে আমি একধারে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বড় রাস্তাটা ভীষণ এব্ড়ো খেব্ড়ো। এখানে গাড্ডা। কিন্তু তারই ওপর দিয়ে অগুনতি ভারী মাল বোঝাই লরি শোঁ শোঁ করে যাতায়াত করে। আমি একটা ট্রাকের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখে শুনে সেই ছুটন্ত ট্রাকের সামনে গুলশনের ঘাড়টা শক্ত করে ধরে দোলাতে দোলাতে নিশানা করে তার নীচে ছুঁড়ে দিলাম।

ইশ্তিয়াক চাপা স্বরে আর্তনাদ করে উঠল.

ট্রাক্ তো সাঁ করে চলে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত। মনে হলো যেন গুলশন রাস্তার বুকে লম্বা হয়ে একেবারে পিষে গেছে। কিন্তু গুলশন ঠিক ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে উল্টো দিকে চলে গেল। কিছুই হয়নি তার। দু'একবার ফিরে দেখল আমাদের দিকে। কিন্তু এদিকে, আমাদের বাড়ীর দিকে না এসে উল্টো দিকেই দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল। আমাদের বাড়ীতে আর ফিরে এলোই না।

তিন দিন ধরে অপেক্ষা করে রইল ইশ্তিয়াক। কিন্তু গুলশনের কোথাও দেখা পাওয়া গেল না। চতুর্থদিন সে তার জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিল। বলল ঃ

"সাহেব। আমার হিসেব চুকিয়ে দিন? আমি চলে যেতে চাই।"

"কেন? তোমার এখানে কি অসুবিধা হচ্ছে?" জারিনা জিজ্ঞেস করল। ইশ্তিয়াক আমার দৃষ্টি এড়িয়ে জারিনাকে বলল, "বেগম সাহেব, যেভাবে আমার বেড়ালটার সঙ্গে সাহেব ব্যবহার করলেন, ওটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

"আর তোমার বিড়ালটা যেভাবে আমার চল্লিশ টাকা দামের বালিশ দুটো ছিঁড়ে ফরদা ফাঁই করে দিল তার সে খোরতটা কে দেবে?" আমি রাগে গম্ভীর স্বর করে বললাম।

জারিনা ব্যাপারটাকে একটু হালকা করে দেবার জন্যে বললঃ "আরে, সামান্য একটা বিড়ালের জন্যে এমন একটা সুখের চাকরী ছেড়ে দেবি ? আমি তোকে এরকমই দশ দশটা বিড়াল এনে দেব যা।"

"না, ওই বিড়ালটা তো আমার গুলশন ছিল।" ইশ্‌তিয়াকের গলার স্বর কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনাল, যেন সে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।

"আরে, গুলশন ছিল কি জুলকন্ নয় করিমন্ যে নাম খুশী রেখো," আমি তাকে একটু শান্ত করার জন্য বলে উঠলাম, "শয়ে শয়ে বিড়াল এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

ইশ্‌তিয়াক তখনও আমার দিকে না তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জারিনার দিকে তাকালো। তারপর বলল, "আমারই তো এখন সাহেবকে দেখে খুব ভয় লাগছে।"

"কেন ?" জারিনা প্রশ্ন করল।

"সাহেব গুলশন্‌কে ধরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তখন ওর যা চেহারা দেখলাম আমি তাতে মনে হল আমি যেন ঠিক আমার বাবাকে দেখলাম।"

"তোমার বাবাকে দেখলে ? মানে ? কি বক্‌বক্ করছ তুমি ?" জারিনাও রাগের স্বরে বলে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত ইশ্‌তিয়াক সেভাবেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলঃ "এই রকম ভাবেই একদিন আমার বাবা নেশার ঘোরে আমাকে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সে সময় আমার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। আমি হয়তো মরেই যেতাম। কিন্তু রাস্তার যেখানে আমি গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে একটা বিরাট গর্ত ছিল। আমি ওই গর্তের ভেতর থেকে কিছুতেই বেরুতে পারি নি। রাত্রিবেলা। দু' একটা ট্রাক আমার মাথার ওপর দিয়ে চলেও গেল। তারপর বোধহয় আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলাম। মা তো বুক চাপ্‌ড়িয়ে চিৎকার করে যাচ্ছিল সমানে। এক সময় বাবার যেন হুঁশ হ'লো। হ'তেই দৌড়ে দৌড়ে এসে রাস্তার ওই গর্ত থেকে আমাকে তুলে নিয়ে—একেবারে বুকে তুলে

নিয়ে, ঘরে চলে এল। তারপর এক একবার আমার গালে মাথায় চুমু খায় আর হাউ হাউ করে কাঁদে। কখনও মা আমাকে বাবার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে নিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরছে, কখনও বা কের বাবা আমাকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরছে। কিন্তু আমি কখনও আর বাবার সেই চেহারাটা ভুলতে পারব না যখন বাবা রেগে গিয়ে আমাকে রাস্তার সেই গাড্ডার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঠিক সেই একই রকম চেহারা হয়েছিল সাহেবের গুলশনকে ছুঁড়ে ফেলার সময়। তাই বলছি আমার হিসাব চুকিয়ে দিন। আমি আর এখানে থাকবনা।”

ইশ্‌তিয়াক আমার পা দুটো বার বার জড়িয়ে ধরতে লাগল যেন নিজেরই কোন ত্রুটির জন্যে বার বার মাপ চেয়ে নিচ্ছে সে···। জারিনা তার হিসাব টিসাব সব মিলিয়ে মিটিয়ে দিল।

৭

বছর তিনেক বাদে বোম্বাইতে যখন বদলী হয়ে এলাম তখন ফের আবার ইশ্‌তিয়াকের সঙ্গে দেখা হলো। আমি তো একটা বাসস্থান খুঁজছিলাম হন্যে হয়ে। ইশ্‌তিয়াক তখন একজন হাউস এজেন্ট বাড়ী খোঁজার দালাল। তার নাম এখন লালু করমানী এবং সে জাতে সিন্ধি। ফর্‌ ফর্‌ করে সব সময় একেবারে ঠেট্‌ সিন্ধিতে কথা বলে যাচ্ছে। পরনে তখন তার খদ্দরের পাজামা আর শার্ট। দেখেই মনে হচ্ছিল যেন স্থানীয় মহল্লা কমিটির কোন কংগ্রেসী নেতা!

“এ আবার কি ঢঙ তোমার, এখানে?” জারিনা দুহাত তুলে একটা বিশেষ ভঙ্গী করে বলল।

এখানে!······বাড়ী টাড়ি বা ফ্ল্যাট ট্যাট্‌ পেতে হলে এখানে সিন্ধিদের কাছে আসতেই হবে। সেজন্যে আমিও একজন সিন্ধি হয়ে গেছি বেগম সাহেব। কি করি। রুটি না হলে তো পেটমানে না।

"কোন বিড়াল টিড়াল পুষছো নাকি এখানেও?" আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

ইশ্‌তিয়াক স্পষ্টতঃই লজ্জা পেয়ে গেল। চোখ তুলে আবার নাবিয়ে নিয়ে বলল, "এখানে, এই বোম্বাই শহরে কোন রকমে বেঁচে বর্তে থাকাই মুশকিল। এক ইরানী হোটেলের মালিক দয়া করে আমার ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা বাবুর্চিখানায় রাখতে দিয়েছে। রাতে তার দোকানের সামনে কোন রকমে পড়ে থাকি। সকাল এগারটা পর্য্যন্ত তার দোকানে সিঙ্গারা বানাতে ব্যস্ত থাকি। তারপর রামদাস মাকিজানীর অফিসে চলে যাই।"

"মাকিজানীটা আবার কে?" জারিনা জিজ্ঞেস করল।

"আসলে হাউস্-এজেন্ট তো সে-ই। আমি তার দ্বিতীয় সহকারী।

"তুমি কি রকম পাও টাও?"

"কমিশন পাই।"

"কত?"

"মাকিজানী পায় টুয়েন্টি পার্সেন্ট। প্রথম যে সহকারী সে পায় ফায়্ (ফাইভ্) পার্সেন্ট।" ইশ্‌তিয়াক ইংরেজী বলতে লাগল, "আর আমি পাই ওয়ান পার্সেন্ট।"

-"ওয়ান পার্সেন্ট? ওয়ান পার্সেন্ট অফ্ হোয়াট, মানে, কত টাকার ওয়ান পার্সেন্ট?" জারিনা ফের জিজ্ঞেস করল।

ইশ্‌তিয়াক বলল, "ওয়ান পার্সেন্ট অফ্ দি ফায়্ পার্সেন্ট অফ্ দি টুয়েন্টি ফায়্ পার্সেন্ট, অফ্ দি হান্‌ড্রেড্ পার্সেন্ট।"

জারিনা তো শুনে হাসতে হাসতে একেবারে লুটিয়ে পড়ল।—ইশ্‌তিয়াক নিজেও যেন বলতে পেরে খুব প্রসন্নমুখে হাসতে লাগল। শেষে জারিনা যখন কোন মতে হাসির বেগ একটু সামলে নিল, তখন সে বলল, "আপনাদের একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পারি।"

"ফ্ল্যাটটা কি রকম শুনি?"

ইশ্‌তিয়কে আঙ্গুলে কর গুনতে গুনতে বলল, "ওয়ান বেডরুম, ওয়ান বাথরুম, ওয়ান বেডরুম মোর, ওয়ান কিচেন (রান্নাঘর), ওয়ান

হল ( বারান্দা ), অ্যাণ্ড সপ্‌রেটস।"

"অ্যা ? এই "অ্যাণ্ড সপ্‌রেটস।" বস্তুটা কি ? জারিনা জিজ্ঞাসা করল। "ইয়েস, অ্যাণ্ডস্‌রেস্।" ইশ্‌তিয়াক এমন একটা মুখভঙ্গী করে জারিনার দিকে তাকালো যেন বলতে চাইছে—এম, এ, পাশ করেও এই সামান্য একটা ইংরেজী শব্দের অর্থ বুঝতে পারছেন না আপনি ? "অ্যাণ্ড সপ্‌রেটস্ বেগম সাহেব।" ইশ্‌তিয়াক আবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলল।

এইবার যেন জারিনা মোটামুটি একটা আঁচ করতে পারল, বলল, "আচ্ছা, তুমি বলতে চাইছ যে "অল সেপারেট" মানে প্রত্যেকটা ঘর অন্য ঘর থেকে আলাদা আলাদা, তাইতো ?"

"ইয়েস অ্যাণ্ড সপ্‌রেটস্।" ইশ্‌তিয়াকের মুখের ভাব-ভঙ্গীতে এবার এমন একটা গর্বিত ভাব ফুটে উঠল—একটা সবজান্তাভাব, যেন বলছে "ওফ্‌হো! একটা সামান্য কথা বুঝতে এতক্ষণ লেগে গেল আপনার!"

জারিনা ফের হাসতে আরম্ভ করল। আমি কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললাম, "আর কোনও কাজটাজ কর না কি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা টুথপেষ্ট তৈরী করেছি—"আমার টুথপেষ্ট।"

"এই "আমার" মানে কার ?" জারিনা কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করল। লজ্জাপেয়ে বলল, 'একটা মেয়ে আছে···।'

"তোমার প্রেমিকা না বাগদত্তা ?"

'আজ্ঞে তা না', মাথা হেলিয়ে বলল, "আমাদের হোটেলে একটা— খ্রীষ্টানবুড়ী কাজ করে। তার একটা মেয়ে আছে। থাকে কোঙ্কন জেলার কোন গ্রামে। এই বুড়ী তার মেয়ের বিয়ে দিতে চায়।"

"তোমার সঙ্গে ?" জারিনা খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না, কোনও খ্রীষ্টান ছেলের সঙ্গেই। তার নাম আল্‌ফ্রেড্। সেও ওই কোঙ্কনের কোন গ্রামেই থাকে। কিন্তু বুড়ী খুব গরীব। টাকা পয়সা বলতে কিচ্ছু নেই তার। সে জন্যেই আমি "আমার টুথপেষ্ট" নাম দিয়ে একটা দাঁতের মাজন বার করেছি। তাই বিকেল

বেলার দিকে বেচি। বেচে যা টাকা পয়সা হয় সব ওই খ্রীষ্টান বুড়ীকে দিয়ে দিই।"

"যাতে ওই বুড়ী তার মেয়ের বিয়ে তোমার সঙ্গ না দিয়ে অন্য কারো সঙ্গে দিতে পারে?" জারিনার গলার স্বরে রাগের সঙ্গে বিরক্তি ফুটে উঠল।

বুঝতে পেরে ইশ্তিয়াক একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মুখটা সরিয়ে নিয়ে চোখ দুটোকে এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগল। ঠোঁটের কোন দুটো থির্থির কাঁপতে লাগল। ভাঙ্গা গাল দুটো তুবড়ে যেন আরও ভেতরে ঢুকে গেল; মুখটা তার অকস্মাৎ এমনভাবে আলাদা হয়ে ফুটে উঠল যেন গলা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ফোঁপড়া নারকেল, যার বাইরেটা আবরণে ঘেরা কিন্তু ভেতরটা ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে। কি জানি কেন তাকে দেখে মনটা আমার সমবেদনায় দ্রব হ'য়ে এল। সে তখন জারিনার দৃষ্টি বাঁচিয়ে এমনভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল যেন চারপাশ থেকে দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ঠিক তার ওপরেই এসে পড়ছিল—অথচ একপাশে সরে গিয়ে যে সে নিজের প্রাণটা বাঁচাবে—তার কোন উপায়ই নেই আর।

আমি তাড়াতাড়ি কথার পরিবেশটা পাল্টে দেবার জন্যে বলে উঠলাম, গান—কবিতা লেখা চলছে তো?"

মাথা হেলিয়ে না করল সে।

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এখন আমি একটা ফিল্মের কাহিনী লিখছি," ইশ্তিয়াক গর্বভরে ঘোষণা করল। এতক্ষণে সঙ্কুচিত অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সে।

"হীরো হবে কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ইশ্তিয়াক!" নিজের নামটাই সগর্বে বলে উঠলো, "এই ছবিতে—ইশ্তিয়াকের ডবল রোল থাকবে।"

"আর ভিলেন কে হবে?" জারিনা জিজ্ঞেস করল।

"হয়তো দিলীপকুমারকে দিয়েই করাতে হবে!" ইশ্তিয়াক খুব চিন্তা ভাবনা করতে করতে বলল যেন, "ভিলেনের রোলটা করা

খুবই মুস্কিল হবে।"

জারিনা নিজের হাসি চাপবার জন্য দোপাট্টার আঁচলটা মুখে গুঁজে দিতে চাইল।

"আর হিরোইন—নায়িকা কে হবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীতে কেউ নেই নায়িকা হবার মতো" তেমন ভাবতে ভাবতেই বলল ইশ্‌তিয়াক, "বাইরে নতুন কারো খোঁজ খবর করছি।"

"গোটা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীতে কেউ নেই?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।—তারপর তার সেই খিচুড়ী ইংরেজী কথাগুলোই ফের বলে গেলাম, "কেউ নেই বলছ? নট্ ইভেন ওয়ান পার্সেণ্ট, অফদি ফায়্ পার্সেণ্ট, অফদি টুয়েন্টী ফায়্ পার্সেণ্ট, অফদি হান্‌ড্রেড্ পার্সেণ্ট?"

"নো স্যার!" ইশ্‌তিয়াক মাথা নেড়ে জবাব দিল।

"তা সেই ফিল্মের গান কে লিখবে? তুমি তো গান কবিতা লেখা ত্যাগ করেছ?"

"হ্যাঁ, মানে," ইশ্‌তিয়াক এক হাতের নখে অন্য হাতের নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বলল, "কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি বটে তবে এই ফিল্মের গান তো আমিই লিখব। খানিকটা লিখেওছি।"

"কি কি লিখেছ?"

চোখ দুটো নামিয়ে মাটির দিকে তাকাল ইশ্‌তিয়াক। তারপর চোরা দৃষ্টিতে অপাঙ্গে, খানিকটা ভয়ে ভয়েই জারিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাহেব! কথাটা কি জানেন, আমার লেখা গজল গান নিয়ে বেগম সাহেবা আমাকে যা ভয় খাইয়ে দিয়েছেন—গজল গানের ভাব খুব গম্ভীর হয় নাকি—সে জন্যে আমি গজল লেখা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু ফিল্মি গানে দেখলাম যে ওসব ভাবটাব খুব একটা থাকে টাকে না। মানে দু' একটা যেমন তেমন কথা, তার মাঝে মাঝে মিউজিক দিয়ে ভরিয়ে দিলেই হলো। সে জন্যেই আমি ওই রকম একটা ফিল্মি গীত দু তিনটে কথা জুড়ে দিয়ে দিয়ে লিখে ফেলেছি।"

"শোনাও।" আমি খুব আগ্রহ ভরে বলে উঠলাম।

ইশ্‌তিয়াক বার দু তিন গলা খাঁকারি দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

বলতে লাগলঃ

'ও প্রিয়ম্ ! ওগো প্রিয়ম্ !
আমি নিলাম
প্যাঁচার জনম
ওগো প্রিয়ম্
তোমার তরে !'

জারিনার অবস্থা তো একেবারে কাহিল। মুখের মধ্যে দোপাট্টার আঁচল গুঁজে দিয়েও হাসি চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু 'প্যাঁচার জনম' কেন, ইশ্তিয়াক?" শত চেষ্টাতেও কথাগুলো বলতে গিয়ে ছিট্‌কে ছিট্‌কে হাসি বেরিয়ে যেতে লাগল।

"প্যাঁচার জনম' এই জন্য, সাহেব," ইশ্তিয়াক গলায় খুবই গাম্ভীর্য এনে বলতে লাগল, "যে ইশ্তিয়াকের, মানে ফিল্মের নায়কের, রাতে কিছুতেই ঘুম আসে না, কেবলই নায়িকার চিন্তা করে, নায়িকার চিন্তায়, মানে নায়িকার সঙ্গে মিলনের চিন্তায় রাতের পর রাত জেগে থাকে, আর প্যাঁচারাও রাতের বেলায় জেগে থাকে—সেজন্যেই···! কথাগুলো একটু বোঝবার চেষ্টা করুন! একটু ভাবুন! কি গম্ভীর বাস্তব অবস্থাটা আমি কথাগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি!"

"আরে উল্লুক, পাঁঠা!" জারিনা ঘুম থেকে দোপাট্টা বার করে নিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, "তুই শিগগির ভাগ এখান থেকে, নইলে এক্ষুণি চপ্পল দিয়ে এমন পেটা পিট্‌বো···"

জারিনা নিচু হয়ে যেন পায়ের চপ্পল খুলতে গেল।

সেই অবসরে ইশ্তিয়াক একলাফ দিয়ে পেছন ফিরেই দে ছুট!

৮

ইরানী হোটেলে ইশ্তিয়াকের রব্‌রবা খুব বেড়ে গেল। প্রথম দিকে তো সে কেবল সিঙ্গাড়া তৈরী করতো। একদিন সুযোগ বুঝে সে ইরানী হোটেলের মালিককে শাহীটুকরা, মানে মিষ্টি খাজা তৈরী

করার জন্য পরামর্শ দিল।

"খুব সস্তায় হ'য়ে যাবে, শেঠ। ডবলরুটির টুকরোগুলো তো শুধু শুধু ফেলে দে'য়া হয়, আমি ওগুলো কাজে লাগিয়ে দেব। কেবল চিনির যা খরচ পড়বে। আর খানিকটা মালাই।" ইশ্‌তিয়াক মালিককে বুঝিয়ে বলল, "আপনার এখানে তো একটা ছেড়ে তিন তিনটে রেফ্রিজারেটার আছে। তার একটাতে কেবল শাহীমিষ্টিগুলো থাকবে। খদ্দেরদের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সার্ভ করলেই হবে।

ইরানী রাজী হয়ে গেল, কারণ এতে খরচ খুবই কম পড়বে। প্রথমদিন ইশ্‌তিয়াক যে শাহী খাজা বানালো, সেগুলো প্রত্যেকটা দু'আনা হিসেবে একেবারে ধূলোর মত উড়ে গেল।

এমন উম্‌দা, সরেশ খাবার যাতে পেটও ভরে আবার মিষ্টিকে মিষ্টিও খাওয়া হয়ে যায়, ইরানী হোটেলের খদ্দেররা আর কবে এমন খাবার খেয়েছে! অবস্থাটা তো এমন দাঁড়ালো যে ইশ্‌তিয়াককে দিনে দুবার শাহীখাজা তৈরী করতেই হচ্ছে। ওদিকে বিক্রি বেড়ে যাচ্ছে দেখে ইরানী হোটেলের মালিক ইশ্‌তিয়াককে রান্নাঘরের পুরো দায়িত্ব দিয়ে একেবারে হেড্‌কুক প্রধান পাঠক করে দিল। রান্নাঘরের আর সব পাচকেরা ইশ্‌তিয়াককে তখন থেকে ওস্তাদজী বলে ডাকতে লাগল। আর হোটেলের মালিক তো তাকে শাহীটুক্‌রার সঙ্গে মিল রেখে 'মেরে দিল কা টুকরো' বলে ডাকতে লাগল।

ইশ্‌তিয়াককে কি চেহারায় আর কি মনের দিক থেকে যদি সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং খুশী দেখে থাকি তো তা এই সময়টাতেই দেখেছি। তার কালো রোগাটে চেহারাটা ক্রমশঃ চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠতে লাগল, ভাঙ্গা গাল দুটো ভরে উঠতে লাগল। সব মিলিয়ে তার চেহারায় একটা নধর চাক্‌চিক্য ফিরে এল। আর তার চোখের তারা দুটো—সবসময়ই যেখানে একটা দুর্জ্ঞেয় বিষণ্ণতা, একটা উদ্বিগ্নভাব বিরাজ করত, চঞ্চল হয়ে কি যেন একটা খুঁজে ফিরে বেড়াতো, ক্রমশ সুস্থির হয়ে এল। মনে হলো যেন এই বোম্বাই সমুদ্রের ঘাটে এসে, বহুবড় ছাপ্‌টা পেরিয়ে, অবশেষে তার জীবন-নৌকা নোঙর ফেলতে

পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে গেল। আমাদের বাড়ীটা যেখানে ইশ্‌তিয়াক খুঁজে দিয়েছিল, সেখান থেকে মাত্রই এক ফার্লং দূরে সেই ইরানী হোটেলটা ছিল, চক্‌ এর ঠিক মোড়ে। সামনেই ট্যাকসীষ্ট্যাণ্ড। তার কাছেই নতুন একটা বাজারও সম্প্রতি খোলা হয়েছে। সে জন্যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভীড় লেগেই থাকতো খদ্দেরদের এই ইরানী হোটেলে। বুট-পালিশওলারা, পানওলারা, ভেল্‌পুরীর দোকানদার, কি চাট বেচে যারা এবং আশ পাশের ঘর-বাড়ী বাংলোর চাকর বাকর, কলেজের ছেলেপুলে, কিংবা কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো বেকার মানুষের দল, উঠতি সন্তান কি আবারা ছেলের দল—প্রায় সবরকম মানুষের জন্যেই হোটেলের কি ভেতর কি বাইরেটা সব সময়ই ভীড় গম্‌ গম্‌ করত।

স্বভাবতই এই হোটেলে ইশ্‌তিয়াক খুব পপুলার হয়ে গেল। মানে, তার পরিচিতি খুব বেড়ে গেল। আসা যাওয়ার পথে আমি তাকিয়ে দেখতাম তাকে। তৃতীয় প্রহর বেলা পর্যন্ত তো তাকে হেডকুকের বাহারী পোষাক পরে কখনও রান্নাঘরের ভেতর কখনও বা রান্নাঘরের বাইরে বেশ ওস্তাদি ভঙ্গীতে কাজ করতে দেখা যেতো। প্রায় চারটের সময় সে স্নান টান করে গেরুয়া রঙের বাঙালীদের মতো পাঞ্জাবী, ঢলঢলে পাজামা আর চপ্পল পরে ইরানী হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াতো। সেই সময় কাজের খোঁজে আসা অনেক ছেলেপুলের দল তাকে ঘিরে দাঁড়াতো। সে তাদের এদিক ওদিকের বাংলো বা ফ্ল্যাটে চাকরের কাজটাজ জোগাড় করে দিত, কেন না, হাউস এজেন্টের সহকারী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আশপাশের বাড়ীগুলোতে তার যথেষ্ট পরিচিতি হয়ে গেছলো। বাকী যাদের সেদিনই কাজ হ'তো না সে তাদের অন্য আরেকদিন আসতে বলে সেখান থেকে চলে যেতো। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে জম্পেশ করে টান দিতে দিতে বাটক—লণ্ড্রীর মালিকের সঙ্গে গিয়ে গল্প জমাতো। সে লোকটাও তার দেশেরই লোক, মানে—মোরাদাবাদেরই বাসিন্দা। তার জন্যে ইশ্‌তিয়াক এমন একটা সস্তা সাবান বানিয়ে দিতে চাইছিল যাতে তৈরীর খরচতো

কম পড়বেই, কাপড়—চোপড়ও অনেক বেশী সংখ্যায়, ভালভাবে ধোলাই করা যাবে। কিন্তু ইশ্‌তিয়াক এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারটাতে কিছু করে উঠতে পারেনি।

বাটক—লণ্ড্রী থেকে বেরিয়ে সে হাউস এজেণ্টের ডেরায় চলে যেতো বা নতুন খদ্দেরদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী দেখাতে চলে যেতো। তারপর রাতে ফিরে ন'টা বা দশটার সময় খাওয়া সেরে নিতো। তারপর এক কাপ চা খেয়ে, একটা বিড়ি ধরিয়ে পান খেয়ে সে সন্তু বাবুর্চির ঝোপড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়তো, যেহেতু সে এখন বড় মানুষ হয়ে গেছে, সে জন্যে এখন আর সে ইরানী হোটেলের বাইরে শুতে পারত না। সন্তু বাবুর্চির ঝোপড়িটা বারো নম্বর সড়কের পেছনে একটা ছোট, খালি প্লটের মধ্যে ছিল। তার বউ তখন সন্তান সম্ভবা হয়ে বাপের বাড়ীতে—সেই তেহরী গাড়োয়ালের কোন্ এক গ্রামে চলে গেছে। আরও মাস চারেক বাদে তার ফেরার কথা। কেউ না আসা পর্যন্ত ইশ্‌তিয়াক সন্তুর ঝোপড়িতে থাকতে পারে······সন্তু ওস্তাদজীকে এরকম কথা বলেছিল।

শাহীখাজার বিক্রি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি মনে মনেই ভাবলাম—যাক, এতদিনে ইশ্‌তিয়াকের একটা স্থায়ী চাকরী হ'য়ে গেল। সে জন্যেই মাস দুয়েক বাদে যেদিন ইরানী হোটেলের মালিক বলল যে সে ইশ্‌তিয়াককে বার করে দিয়েছে, তখন তো আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম।

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "টাকা পয়সা চুরি করেছে নাকি?"

"না, আজ পর্যন্ত একটা পয়সারও হেরফের করেনি।" ইরানী হোটেলের মালিক বলল।

"তাহলে? কাজে গাফিলতি করতো?"

"না, কাজ তো খুবই ভাল করতো।"

"তবে?"

ইরানী হোটেলের মালিক কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল। প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই মুখ বন্ধও করে ফেলল। তারপর খুব খেদের স্বরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগল, সাহেব। লোকটার মাথায় কোন গণ্ডগোল আছে। আমি তাকে সত্তর টাকা মাইনের অতিরিক্ত দিতাম। সেই অতিরিক্ত টাকাও সে খরচা করে ফেলতো। সে সব বাদেই—পাঁচশো কাপ চা আর ত্বশো স্লাইস্ পাঁউরুটির বিল হয়ে গেছে তার নামে।

"পাঁচশো কাপ চা আর ত্বশো স্লাইস পাঁউরুটি!" আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম! বললামঃ "ইশ্‌তিয়াক তো কোন দিন এমন পেটুক ছিল না। তার খোরাক তো খুবই কম ছিল।"

"সে আমি জানি, আর সে জন্যেই তো বলছি", ইরানী হোটেলের মালিক বেশ রাগের স্বরে বলল, "সে নিজে যদি পাঁচশো ছেড়ে সাতশো কাপ চা খেতো তা আমি কিছুই বলতাম না। কিন্তু সে তো নিজে বিশেষ খেতো না; কোথাকার সব বেকার লফংগা ধান্দাবাজ লোক সব আশপাশের বাড়ীতে চাকরী পাবার আশায় তার কাছে আসতে. তো সে তাদের খালি পেট দেখে চা রুটি খাওয়াতো। আমি যখনই মানা করতাম তো বলত—আমার নামে হিসেবে লিখে রাখুন। এখন তো পাঁচশো কাপ চা আর ত্বশো স্লাইস্ রুটির বিল হয়ে গেছে তা সেগুলো এখন আমি কার হিসেবে লিখবো, বলুন? সে জন্যে তাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

"বেশ করেছেন, ভাল করেছেন।" আমি ইরানীকে বললাম। কেভণ্ডার তারপর কাউণ্টারের ওপর পয়সা রেখে বললাম, "এক প্যাকেট সিগারেট দিন।"

"মগজের মধ্যে কি যে আছে লোকটার," ইরানী পয়সা গুনতে গুনতে বলল. "ত্বপয়সা কম আছে।"

"সরি।" বলে পকেট থেকে আরও ত্বপয়সা বার করে দিয়ে কেভেণ্ডারের প্যাকেট নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তা ইশ্‌তিয়াক এখন কোথায় আছে?"

"জেলে?"

"জেলে ?" আমি বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে ইরানীর দিকে তাকালাম, "আপনি বেচারাকে এই সামান্য কারণে জেল পাঠিয়ে ছেড়ে দিলেন ?"

"আমি কোথায় পাঠালাম সাহেব! সে তো নিজের কর্মদোষে জেলে গেছে, মদ স্মাগলিং-এর কেসে।"

"আচ্ছা, এসব ধান্দাও সে স্থুরু করেছিল নাকি ?"

"স এসব ধান্দাটান্দা করত না সাহেব। কিন্তু আমাদের বাবুর্চি সন্তু এখানকার কাজের ফাঁকে ধান্দা করত। আশেপাশের অনেক বাড়ীতেই রাতের বেলা মদের বোতল সাপ্লাই করত···"ইরানী বলল, "তারপর একদিন রাতের বেলা পুলিশ তার ঝোপড়িতে হামলা করল। ছ' ছ' টা মদ ভর্তি বোতল ধরা পড়তে ইশ্‌তিয়াক পুলিশদের বলল,—সন্তু নির্দোষ। আমিই এই ছ' বোতল মদ এখানে এনে রেখেছিলাম। ব্যস্‌। ইশ্‌তিয়াকের এজন্যেই তিন মাসের জেল হয়ে গেলো।"

"তা সে ওরকম কথা বলতে গেলো কেন ?"

"ইশ্‌তিয়াকের কথা হলো—আমার আর কি হবে! আমি একা মানুষ। তিন মাসের সাজা চুটকী বাজিয়ে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু যখন সন্তুর বৌ বাচ্চা কোলে এসে এই ঝোপড়িতে দেখবে যে ঝোপড়ি খালি—সে বেচারী তখন কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে যাবে না।"

৯

তিন মাস বাদে জারিনার মনে পড়ল যে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ইশ্‌তিয়াক আমাদের বাড়ীতে আসবে। কিন্তু তিন মাসের ওপর আরও বেশ ক'টা দিন কেটে গেল অথচ ইশ্‌তিয়াক এলো না দেখে ও বেশ একটু মুষড়ে পড়ল। আমারও মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমার তখন মনে হল যে ইশ্‌তিয়াক যদি আমাদের বাড়ীতে নাই আসে, তাহলে, সম্ভবতঃ ইরানী হোটেলের বাইরে এদিকে সেদিকে কোথাও নিশ্চয়ই দেখা হলেও হ'য়ে যেতে পারে। একদিন আমি সন্তু বাবুর্চিকে জিজ্ঞেসও করলাম। তো সে বলল যে তার কাছেও

ইশ্তিয়াক আসেনি। তখন আমাদের মনে হল যে হয়তো, ইশ্তিয়াক লজ্জা পেয়েই আর এদিকে আসেনি। এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও গেছে বা হ'তেও পারে বোম্বাই ছেড়েই বাইরে কোথাও চলে গেছে। যখন এই ভাবে আরও ছু' আড়াই মাস চলে গেল অথচ ইশ্তিয়াক এলো না তখন আমাদের ধারণাই যে সঠিক সেটা বুঝতে পারলাম।

তারপর একদিন হঠাৎ আমরা তাকে এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে দেখলাম। সরদার জোরাবর খাঁ-য়ের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। ওর স্ত্রী নুস্রত খানম্ আমার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আমরা তো খেতে শুরু করে প্রথম পদ চেখেই বুঝতে পেরে গেলাম যে এই রকম ষ্টাইলের রান্না কার। প্রথম পদটা মুখে দিয়েই আমি জারিনার দিকে জারিনা আমার দিকে তাকালো প্রায় চম্কে উঠে। কিন্তু দুজনেই চুপ করে রইলাম। খাওয়া দাওয়ার পর যখন সকলেই রান্নার সুখ্যাতি করতে লাগল তো তখনই রান্নাঘর থেকে বাধো বাধো পায়ে সলজ্জ ভঙ্গীতে ইশ্তিয়াকের উদয় হলো। কালো প্যান্ট, তার ওপর লাল রঙের বুশশার্ট, তার ওপরে চাপানো ঘোলাটে সাদা রঙের আধ ময়লা অ্যাপ্রণ পরে, একটু ঝুঁকে, কবি আবৃত্তিকারদের মত—অভিবাদনের উত্তরে নমস্কার জানানোর ভঙ্গীতে আমাদের প্রশংসাবলী গ্রহণ করতে লাগল।

আমি বা জারিনা কেউই ঠিক ওই পরিস্থিতিতে, ওই পরিবেশে, সে যে আমাদের পূর্ব পরিচিত তা জানাতে চাইছিলাম না। ইশ্তি-য়াকও যেন আমাদের মনের কথাটা বুঝতে পেরে পুরোপুরি অচেনার ভান করে গেল।

পরে একসময় নুসরত্ জারিনাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, "খুব ভাল পাচক পেয়ে গেছি আমি। ইশ্তিয়াক আহ্মেদ খাঁ এর নাম। পুস্তু ভাষায় গর্ গর্ করে কথা বলতে পারে যদিও ছোটবেলা থেকেই এখানে আছে। আর রান্না যা করে না—অপূর্ব! আর খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। জিনিষের অপব্যয় করে না একদম। যখন থেকে এই বাবুর্চি এসেছে, তখন থেকেই রান্না বান্নার খরচই কমে গেছে আড়াইশ' টাকার মত।—বুঝে দেখ,—আমি মাইনে দিই মাত্র সত্তর

টাকা। সত্যি বলতে কি, একশ, টাকা দিলেও আমার লোকসান তো হবেই না সস্তাই পড়বে।

জারিনা অজ্ঞতার ভান করে বলল, "লোকটাকে দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে।"

"আরে ভাল, শুধু ভাল বললে কম বলা হয়।"

নুসরত ইশ্‌তিয়াকের প্রশংসা করে বলল, "আমার ছেলেপুলের জন্যে তো পারলে প্রাণ দিয়ে দেয়। বিশেষ করে ছোট নজ্জুটাকে তো একেবারে বুকে করে আগলে রাখে। কোন সাক্ষাৎ মা আর নিজের সন্তানের কতটুকু খিদমত করে যা ইশ্‌তিয়াক করে নজ্জুর জন্যে! এই তো দিন চারেক আগের কথা, নজ্জু একটা মোটর গাড়ী চাইছিল। আমি বললাম, আনব'খন। আমি একটু টালবাহানা করছিলাম কারণ আগের কেনা দুটো খেল্‌না মোটর ঘরেই রয়েছে। একটু পুরোনো হয়ে গেছে, তাতে কি!" নুস্‌রত জারিনার একটা হাত ধরে খুশী ভগমগ স্বরে বলতে লাগল, "তা এই বোকাটা দশ টাকা দিয়ে একটা মোটর নজ্জুর জন্যে কিনে আনল। তো আমি বেশ রেগে গিয়েই ধম্‌কে বললাম, আমি কিন্তু এই মোটরের দাম দেব না। তা ওই বোকাটা বলে কি—না দিলেন বেগম সাহেব। আমি তো আমার নিজের টাকা খরচ করেই নজ্জুর জন্যে মোটরটা কিনে এনেছি। তাই শুনে কর্তাও তো রেগে গেলেন। বেশ ধমক দিয়েই বললেন, বাপু, তোমাকে কে নজ্জুর জন্যে মোটর কিনে আনতে বলেছে? ইশ্‌তিয়াক তো প্রথমটা কর্তার রাগ দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপরই মাথা তুলে বেশ সাহসের সঙ্গেই বলে উঠল—সাহেব! আমি নজ্জুর আব্‌দার না রেখে থাকতে পারবো না। ও যখন যা বলবে, চাইবে, আমি অবশ্যই নিয়ে আসব। এমন স্বরে. এমন ভাবে, কথাগুলো বলল ইশ্‌তিয়াক যে কর্তার রাগ তো গলে জল হয়ে গেল। উনি মুচ্‌কি হেসে একদিকে সরে গেলেন। আমি আর কি বলব বল্ বোন, চুপচাপ জাঁতি দিয়ে সুপুরি কেটে যেতে লাগলাম।"

জারিনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃদু হাসতে হাসতে নুস্‌রতের সব কথা শুনে

যাচ্ছিল। কিন্তু ভুল করেও একবার বলেনি যে ইশ্‌তিয়াককে জানে চেনে। পরবর্তী এক বছরে ইশ্‌তিয়াকও কোনদিন এমন ভাব প্রকাশ করেনি যে সে আমাদের জানে, চেনে। আমাদের মনের বেচারা যেখানে আছে, সেখানেই থাক। তাকে ভাঙ্গিয়ে এনে ভাব হলো আর কি লাভ? আর এখানে এই জোরাবর খাঁয়ের বাড়ীতে থেকে ইশ্‌তিয়াক ক্রমশঃ সুস্থ হ'য়ে আসছিল, এখন আর মাথার চুল এলোমেলো থাকে না তার। আগে যেমন মাঝে মাঝেই বে-খেয়াল হয়ে দু' একদিন খুব খারাপ ভাবে রান্না করে ফেলত। তেমনটা আর এখন হচ্ছিল না। সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে থাকে। কবিতা গজল লেখাটেখা নিয়েও আর মাথা ঘামায় না। বরং দিনরাত হয় রান্নাঘরে নয়তো খাঁ সাহেবের ছেলে-পুলেদের খবরদারি করেই তার দিন কাটে। যদিও বাচ্চাদের দেখ ভাল করবার জন্য দুজন আয়া ছিলই, কিন্তু বাচ্চাগুলো ইশ্‌তিয়াকের যতটা ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল ঘরের আর কারো প্রতি তাদের ততটা ভাব ভালবাসা ছিল না। আমি আর জরিনা বলতে গেলে খুশীই হয়েছিলাম। সুখের নিশ্বাস ফেলেই ভেবেছিলাম যে যাক, শেষ পর্যন্ত ইশ্‌তিয়াক মোটামুটি স্বাভাবিক হয়েই তো উঠেছে।

একদিন রাতে ঝন্ ঝন্ করে জোরে কলিংবেল বেজে উঠল। রাত তখন তিনটে বাজে প্রায়। আমি তো বেশ ঘাবড়ে গিয়ে দরজা খুললাম। যাইরে সবদার জোরাবর খাঁয়ের ড্রাইভার হামিদ দাঁড়িয়ে আছে।

"হুজুর, তাড়াতাড়ি চলুন, বেগম সাহেব গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"ব্যাপারটা কি হামিদ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ইশ্‌তিয়াক বিষ খেয়েছে।"

"অ্যাঁ?" আমার মুখ থেকে স্বতঃই চিৎকার বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ সাহেব, ইশ্‌তিয়াক বিষ খেয়েছে আর ওদিকে খাঁ সাহেব গেছেন পুনাতে। বাড়ীতে বেগম সাহেবার দুই ভাই আছে। কিন্তু তারা ভেবে পাচ্ছে না যে এ অবস্থায় কি করা যায়। ডাক্তার মকবুল

সাহেবকে ফোন করেছিলেন বেগম সাহেবা। কিন্তু তিনি বললেন যে এটা পুলিশকেস, আমি যেতে পারব না। এদিকে ইশ্‌তিয়াক এখন মরতে চলছে।"

জারিনা আমার পেছনে দাঁড়িয়েই থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিল। কাঁপা কাঁপা স্বরেই ও আমাকে বলে উঠল, "তুমি এক্ষুনি চলে যাও! বেচারী নুসরত হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়েছে।"

খাঁ সাহেবের ড্রইংরুমের মাঝামাঝি জায়গায় মেঝের ফরাসের ওপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া একটা লাশ পড়ে আছে; নুসরত এবং তার দুই ভাই আর বাড়ীর অন্যান্য কয়েকজন উদ্বিগ্ন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি লাশের দিকে।

"কি হলো? মরে গেছে?" আমার অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

"না, এখনও বেঁচে আছে।" একজন আয়া অস্ফুটে, ফোঁপানো স্বরে বলল।

আমি চাদর সরিয়ে নাড়ী দেখলাম। মাঝে মাঝে হিক্কার মত উঠছে, হৃদপিণ্ড ক্রমশঃ কম জোর হয়ে পড়ছে, নাড়ীতে স্পন্দন কমছে। নুসরত একটা শাল গায়ে দিয়ে যেন ইহলোক পরলোকের কথা ভুলে গিয়ে রক্তবর্ণ দুটি অস্থির চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে চার দিকে চেয়ে কি দেখছে—কে জানে।

"বিষটা খেয়েছে কখন?" আমি নুসরতকেই জিজ্ঞেস করলাম।

নুসরত কিছুই বলল না, যেন আমার প্রশ্নটা শুনতেই পায় নি, নুসরতের ছোট ভাই বলল, "প্রায় দুটো বাজার কাছাকাছি সময়ে আমি আমার বিছানার কাছে কারো কথা বা শব্দ শুনতে পাই। কেউ যেন—আস্তে আস্তে আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছিল। জাগবার পর দেখি ইশ্‌তিয়াক দাঁড়িয়ে। রান্নাঘর থেকেই সে কোন মতে পা টেনে টেনে আমার ঘরে এসে আমাকে বলছিল—"আমাকে বাঁচান, আমি বিষ খেয়ে ফেলেছি।"

"আমি জিজ্ঞেস করলাম কি বিষ খেয়েছো?"

"বলল—টিক্ টু।"

"টিক্ টু আবার কি ?"

"টিক্ টু !—টিক্ টু—বিষের প্রতিক্রিয়ায় তার জিভ ভারী হয়ে আসছিল—কথাগুলো বেশ জড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সে বলতে চাইছিল টিক্ টুয়েন্টি, কিন্তু তার মুখ থেকে কেবলই বেরিয়ে আসছিল—টিক্ টু। তারপর আমার খাটের পাশে বসে পড়ে সে কাত্রাতে লাগল।' নুসরতের ভাই এইভাবে মোটা মুটি সব বলল।

আর কোন কথা শোনার প্রয়োজন নেই বুঝেই আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, "একে তুলে নিয়ে নীচে গাড়ীতে ওঠাও। হাসপাতালে নিয়ে যাবো।"

"কিন্তু পুলিশ···?" নুসরত কেঁপে উঠে বলল।

"পুলিশকে ওখান থেকেই জানিয়ে দেবো," আমি বললাম, "ধারে কাছে কোন্ হাসপাতাল আছে ?"

"জানাবতী।"

"এখান থেকে কতটা দূর হবে ?"

"প্রায় মাইল চারেক।"

"তাড়াতাড়ি চলো।"

চারজনে মিলে ধরাধরি করে যখন ইশ্তিয়াককে দোতলা থেকে নিচে নামালাম, তখন হালকা হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সড়কের ধারে ধারে ল্যাম্পপোষ্ট গুলো এখানে সেখানে জমে থাকা জলের ওপর আলো ফেলে এমন ভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল যেন নিজেদের ধিকৃত জীবনের দুঃখে নিঃশব্দে কাঁদছিল। ভেজা পথের ওপরও কোথাও কোথাও ছেঁড়া কাটা আলো এসে ছিটকে পড়েছিল। আর চারপাশ থেকে গাঢ় অন্ধকার এসে তাদের গ্রাস করার জন্য ওৎ পেতেছিল। গাড়ী চলতে আরম্ভ করে এবড়ো খেবড়ো গাড্ডায় পড়ে এমন নড়বড় নড়বড় করে চলছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কোন মেয়ে নিজের সর্বস্ব খুইয়ে রাতের অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে নিজের বাড়ীর দিকে কোন মতে দেহটাকে টেনে টেনে নিয়ে চল্ছিলো।

ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে।

'এ' ফর্ম ভরো।

'বি' ফর্ম ভরো।

'সি' ফর্ম ভরো।

( জীবন !—তুমিও একটু অপেক্ষা করো ! )

ইশ্‌তিয়াক মাথাটা হলদে রঙের অয়েল ক্লথ মোড়া গদীর ওপর পড়ে আছে। চোখ দুটো তার কোটরের গর্তে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে যেন তাদের ওপর দিয়ে স্মৃতির মাল গাড়ীটা ধু ধু করতে করতে চল্‌ছে—চলছেই।

"পঁচাত্তর টাকা অ্যাডভান্স দাও।"

"এই রশিদ নাও।"

"বিঠঠল ! রুগীকে ওপরে সাত নম্বর কামরায় নিয়ে যাও লিফটে করে ! আমি এক্ষুনি ডাক্তার কোঠারীকে ফোন করে দিচ্ছি।"

বাইরে রাস্তা দিয়ে বোধ হয় ট্রাক যাচ্ছে একটা।

ধু ধু।

ইশ্‌তিয়াকের বুকও হাঁকুপাঁকু করছে—

হুঁ…হুঁ… !

অয়েল ক্লথে মোড়া নোংরা বিছানা সহ ষ্ট্রেচারে করে লিফটে ভরা হলো ইশ্‌তিয়াককে। লিফ্‌টে ওপর তলায় গিয়ে থামল। বিছানা বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছে। সাত নম্বর কামরার ভেতরে চলে গেল। একজন ডাক্তার দুজন নার্স ভেতরে এল। সাত নম্বর কামরা পর্দাফেলে বন্ধ করে দেওয়া হলো। আর আমরা বাইরের বেঞ্চে বসে পড়লাম।

লম্বা করিডোরে নিঃশব্দ পায়ে নার্সেরা আসা যাওয়া করছে।—আর্দালী বিরক্তিতে ভরা মুখ নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও কখনও আশপাশের কোন কোন কামরা থেকে যন্ত্রণার কাতর শব্দ বা জোরে জোরে কষ্ট করে নেওয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে।

"ইশ্‌তিয়াক বিষ খেলো কেন ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পয়সাকড়ি চুরি করেছিল বোধহয়।" মুসরভের ছোট ভাই

কতকটা আন্দাজেই বলল, দিদিতো আস্তে আস্তে সংসার খরচের টাকা সমস্তই ইশ্‌তিয়াকের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। সব সময়ই চার পাঁচশো টাকা ইশ্‌তিয়াকের পকেটে থাকতই। গতকাল দিদি তাকে হিসাব দিতে বলেছিল। আজই সে বিষ খেলো। আমার মনে হয় কি···”

তোমার মনে হওয়াটা ভুল, আন্দাজটাও ঠিক নয়,” নুসরতের দ্বিতীয় ভাই বলে উঠল, “ইশ্‌তিয়াকের হয়তো দশরকমের দোষ থাকতে পারে, কিন্তু সে চোর নয়! আজ পর্যন্ত কোনদিনও সে আধ পয়সারও হেরফের করেনি। আমার ধারণা, গত সপ্তাহে মোরাদাবাদ থেকে যে খবর এসেছিল যে তার পৈতৃক বাড়ী নিয়ে মোকদ্দমায় হার হয়েছে তার, তাতেই একেবারে মুষড়ে পড়েছিল।”

“আজ্ঞে না,” বুড়ো হামিদ ড্রাইভার নিজের ঘন দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলতে লাগল, “দোকানপাট, বাড়ীটাড়ি, টাকাপয়সা —কোনকিছুর জন্যেই ইশ্‌তিয়াকের কোন টান ছিল না। এটা তো ওই ছুকরির ফাঁদ—ওই গুলশন নামে ছুক্‌রিত··· ।”

“গুলশন?” খট্‌করে কানে লাগল নামটা। গুলশন কে?—মনের পর্দায় একটা বিড়ালের ছবি দৌড়দৌড়ি করতে লাগল···”

“একজন নতুন আয়া রেখেছেন সাহেব। কি বিচ্ছিরি দেখতে ছুক্‌রিটাকে। কিন্তু বয়স তো ষোল সতেরো! খুব চটপট দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে। সেই মেয়েটার নাম গুলশন। আর সাহেব, আমি শুনেছি যে ইশ্‌তিয়াকের প্রথম বউয়ের নামও ছিল নাকি গুলশন।

“অ্যাঁ! সে কি?” আমি চম্‌কে উঠলাম।

“আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই মেয়েটার চক্করে পড়েই বিষ খেয়েছে।”

“কি রকম?”

“প্রথম প্রথমতো ইশ্‌তিয়াক সাহেবকে বলত মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিতে; সে নাকি কাজ কর্ম ঠিক মত করে না। তারপর একদিন ইশ্‌তিয়াক—আমাকে বলল যে মেয়েটাকে আমি তাড়িয়ে দিতে চাইছি কেন জানো? মেয়েটার নাম গুলশন! সে জন্যেই। তা আমি

বললাম," তুমি তো ভালমানুষ! মেয়েটার গুলশন্ বলেই তাকে তাড়াতে চাইছ কেন? কাজ কর্ম তো ভালই করে মেয়েটা! কিন্তু ইশ্‌তিয়াক আমার কথা মানল না; মেয়েটার সম্পর্কে সব সময় একটা না একটা অভিযোগ করতেই লাগল। তবু সাহেব যখন তার নালিশ কিছুতেই কানে তুললেন না; তখন, ঠিক কবে থেকে, কখন যে সে মানে ইশ্‌তিয়াক মিঁয়ার কথা বলছি, হঠাৎ মতটা পাল্টে ফেলল— তা আমি বলতে পারব না। হঠাৎই দেখি ইশ্‌তিয়াক মেয়েটাকে খুব আদর-যত্ন করছে। মানে, অন্য চাকর বাকররা যেখানে কেবল চা খাচ্ছে, সে মেয়েটাকে তখন কফি করে দিচ্ছে। কফি তো সেরেফ সাহেব আর বেগম সাহেবানের জন্যই তৈরী হবার কথা। শেষে একদিন গুলশন যেই জানতে পারল যে সে কফি খাচ্ছে অথচ অন্য চাকররা খাচ্ছে চা, সেদিন থেকেই সে একদম বিগড়ে গেল। সে সাফ অস্বীকার করল কফি খেতে। একদিন গুলশন ইশ্‌তিয়াককে বাজার থেকে দেশী সাবান আনতে বলল তো ইশ্‌তিয়াক নিয়ে এল বিলেতী সাবান। মাথায় মাখবার জন্যে গুলশন তেল চাইল তো ইশ্‌তিয়াক "গুলজার হেয়ার অয়েল নাম্বার ওয়ান" কিনে নিয়ে এল। কালকে—গুলশনের মায়ের কাছ থেকে একটা চিঠি এল। বেগম সাহেবা পড়ে শোনালেন। ইশ্‌তিয়াকের তো স্বভাব, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোরের মত কান পেতে শোনা। গুলশনের মা চিঠিতে লিখেছে যে সে গুলশনের বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে ফেলেছে। ছেলে কোন এক বড় সীমেণ্ট কোম্পানীতে দারোয়ানের কাজ করে। আর ইশ্‌তিয়াক তো সামান্য একজন বাবুর্চি। তার কি সাধ্য গুলশনের মত মেয়েকে বিবি করবে! ব্যস্! ওই কথা শোনার পর থেকেই ইশ্‌তিয়াক রান্নাঘরে বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল আব আমাকে বলতে লাগল,—আর বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি হলো?—বলল, কিছু না! পরক্ষণেই নিজের বুকে হাত চাপড়ে বলল,—আর বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। এ সবই আজ দুপুরবেলার কথা।···রাতেই সে বিষ খেলো।" হামিদ এ পর্যন্ত

বলে চুপ করে গেলো।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর আমি বললামঃ "কিন্তু বিষ খাবার আগে হতভাগাটা গুলশনের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বলে নি?"

"কিছু বলে নি সাহেব!" হামিদ ক্ষোভের স্বরেই বলল, "একেবারে যাকে বলে একতরফা ভালবাসা। মাত্র তো দিন দশেক আগে গুলশন এ বাড়ীতে কাজে লেগেছে; এই দশদিনের মধ্যে মেয়েটাকে সে ঘেন্নাও করল, আবার ভালমানুষ সেজে খুব আদর যত্নও সুরু করল, ভালও বাসলো, আবার নিজেকে নিজে মেরেও ফেলল। সব কিছুই ঘটে গেল এই দশদিনের মধ্যে। মেয়েটাতো এসবের কিছুই জানেও না সাহেব! মেয়েটা দেখতে এত খারাপ, গায়ের রঙও এত কালো যে সে নিজেও কোনদিন কল্পনা'ও করেছে কিনা সন্দেহ যে তার মত মেয়েকে কেউ ভালবাসতে পারে।"

হামিদ তো বৃদ্ধমানুষ। তার মত বয়সে কেউ প্রেম-ভালবাসার কথা ভুলেও ভাবে না। সে জন্যেই বোধহয় ইশ্‌তিয়াকের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তার ভাষা, ভঙ্গী এমন কটু কঠোর হয়ে উঠছিল যে শুনতে শুনতে আমার মনে কেমন একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল। যদিও মুখে তাকে কিছু বললাম না।

বোধহয় সাড়ে ছ'টার কাছাকাছি সময়ে ডাক্তার কোঠারী সাতনম্বর কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে বললেন, "এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা খুবই সঙ্কটজনক। আমি পাকস্থলীতে যা বিষ ছিল বার করে দিয়েছি। গ্লুকোজ স্যালাইন চলছে। খাওয়ার ওষুধও দিয়েছি। কয়েকটা ইনজেকশন দিয়েছি। কয়েকটা আরও লিখে দিয়েছি।"

"ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। রুগীর কি জ্ঞান ফিরেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"জ্ঞান ফিরেছে। তবে খুবই দুর্বল। এখনই বেশী লোকজন দেখা না করাই ভাল।" বলে ডাক্তার আমার দিকে ইশারা করে

বললেন, "কেবল আপনি কয়েক মিনিটের জন্যে একটু দেখা করতে পারেন। আমি থানায় টেলিফোন করে দিয়েছি। যে কোনও মুহূর্তে ইন্সপেক্টার এসে রুগীর একটা বয়ান নেবেন। কেন না, রুগীর অবস্থা খুব একটা ভাল নয়।"

কথাগুলো বলে ডাক্তার কোঠারী চলে গেলেন। তখনই নুসরতের ছোট ভাই রেগে গিয়ে বলে উঠল, "খাঁ সাহেব তো এখানে নেই। পুলিশ এসে আবার বার বার বক্তব্যের বয়ান নেবে কে জানে। ব্যাটা উল্লুক,—পাঁঠা, তোর এটুকু বুদ্ধি হলো না যদি মরতেই হয় তো সমুদ্রে ডুবে মরলেই পারতিস, কিংবা চলন্ত গাড়ীর সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরলেও হতো। যেখানে খুশী, যেমন ভাবে খুশী মরতিস—আমাদের বাড়ীতে না মরলেই পারতিস্, আমাদেরও তাহলে এরকম হয়রান হতে হ'তো না।"

"বাঃ! বেশ কথা বললেন আপনি," আমি বলে উঠলাম, "যারা মরবে তারা মরবার আগে ভাববে যাতে জীবিত লোকেরা পরে কোন বিপদে না পড়ে। তা এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি একটা "আত্ম-হত্যার গাইড" বই লিখে প্রচার করেন তো বহুজনের উপকার হবে!" কথাগুলো বলেই আমি সাতনম্বর কামরার ভেতর চলে গেলাম।

ভাগ্যই বলতে হবে। কামরায় সে সময় কেউ ছিল না। নার্স কোন একটা ওষুধ আনতে নীচে গেছে। ইশ্‌তিয়াক নরম বিছানায় নিস্তেজভাবে শুয়েছিল। তার ডান হাতের কনুয়ের কাছে শিরার মধ্য দিয়ে স্যালাইন যাচ্ছে। অন্য হাত বুকের ওপর রাখা। চোখ দুটো বোঁজা সাদা ধব্‌ধবে বালিশের ওপর তার কালোবর্ণ মুখটা দেখা যাচ্ছে। মাথার পেছনে জানালার কাঁচের ওপর বৃষ্টির ছঁচ তার সঙ্গে ভোরের আলো মিশে আলো আঁধারির মায়া যেন আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে···!

"ইশ্‌তিয়াক!" আমি বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলাম, "ইশ্‌তিয়াক, শোনো?" তারপর একটু জোরে আবার ডাকলাম," ভাল করে শোনো, ইশ্‌তিয়াক। সময় বেশী নেই। এক্ষুনি নার্স এসে পড়বে।"

ইশ্‌তিয়াক চোখ মেললো। বুঝতে পারলাম সে আমাকে চিনতে পেরেছে। তখন আমি কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললাম, এক্ষুনি হয়তো পুলিশ ইন্সপেক্টার তোমার জবানবন্দী নিতে আসবে। তাকে শুধু তুমি এইটুকু বলবে যে তোমার পেট ব্যথা করছিল, তাই ওষুধের শিশিটা মাথার কাছে রেখে রান্নাঘরেই তুমি শুয়েছিলে। সেখানেই টিক-টুয়েন্টির শিশিটাও কে জানে কে রেখে দিয়েছিল, তুমি খেয়াল করোনি। দুটো শিশিই একরকম বলে চিনতে পারো নি তুমি।. মাঝরাতে যখন আবার পেটটা ব্যথা করতে লাগল, তখন তুমি পেট ব্যথার ওষুধ ভেবে ভুলে টিক-টুয়েন্টি খেয়ে ফেলেছো। ব্যস্‌! আর কিছু বলবে না। বুঝতে পেরেছো?"

ইশ্‌তিয়াক আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

চোখের তারা দুটো তার স্থির হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছিল আমার। কোটরগত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ, ঠোঁট দুটো উল্টে ভেতর দিকে ঢুকে গেছে, খোলা বুকের রোমরাজি ঘামে ভিজেই বোধহয় লেপ্টে গিয়ে নির্জন পর্বতের ধারে পড়ে থাকা প্রাণহীন পাথরের টুকরোর মত মনে হচ্ছে। .পাঁজরগুলো যেন ভাঙ্গাচোরা মন্দিরের সিঁড়ির মত শুকিয়ে যাওয়া জীবন-সায়রের খোঁজে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে।

"ইশ্‌তিয়াক! ইশ্‌তিয়াক, তুমি এরকম করতে গেলে কেন?" আমি তার মাথার কাছে মুখ নামিয়ে গভীর সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

তার মুখ, শরীর স্থির হয়ে রইল। একটুও নড়ল না। যেন আমার কথা সে শুনতেই পেল না। তারপর হাতটা তার বুকের ওপর নড়ে চড়ে উঠল। ধীরে ধীরে নিজের বুকেই আঙ্গুল দিয়ে বোলাতে সে রবারের মতই উদাস স্বরে বলে উঠল, 'বুকটা খালি হয়ে গেছে!"

তার জবাব শুনে আমার বুকের ভেতরে কেমন যেন ধ্বস্‌ নামতে লাগল······বুক খালি হয়ে গেছে! কত শত শতাব্দী ধরে মানুষের বুক খালি হয়েই তো যাচ্ছে; শূন্য হয়ে যাচ্ছে; আর মানুষের এই শূন্য বুক না পেরেছে কোনও শ্রীরামচন্দ্র ভরে দিতে, না পেরেছে কোন স্বর্গীয়

দেবদূত বা পয়গম্বর হুসেন ভরে দিতে ; আর সেখানে তুই কোথাকার কে রে সেই শূন্য বুক ভরে দিবি, আহাম্মক বাবুর্চি ! আরে, এই বুকের খাঁচাটার ভেতর কত যে ভয়ঙ্কর সব গর্ত, কত গভীর অতল খাদ আর কত কতরকম সীমাহীন বিস্তৃত শূন্যতা, যার মধ্যে তুই এখান সেখান থেকে কিছু কাঠ-কুটো জোগাড় করে এনে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবছিস্ যে এবার বুঝি সেই শূন্যতার গর্ত ভরে উঠল ?—প্রথমে তো ওই নবাবকে আদর যত্ন করে বুক ভরাতে চাইলি। তারপর একটা বিড়ালের বাচ্চাকে পুষে, তাকে নিয়ে ফেললি বুকের ভেতর, যাতে সেই শূন্যতার শেষ হয়। তারপর শত শত কাপ চা ঢাললি, ডবলরুটি কেটে কেটে ফেলতে লাগল ওই বুকের ভেতর। তারপর "আমার টুথপেষ্ট" বানিয়ে বিক্রি করতে লাগলি। নিজে বেঘর হয়ে অন্যের জন্যে ঘর খুঁজে দিতে লাগলি আর নিজের না পাওয়া সন্তানের দুঃখ ভুলতে অন্যের সন্তানদের বুক ভরে—ভালবাসা বিলিয়ে দিলি। কিন্তু গুলশনকে কিছুতেই ভুলতে পারলি না, আর বুকের সেই অসীম শূন্যতাও তোর ভরলো না ! সেই গুলশন-বাগানে গিয়ে একটাও ফুলের সন্ধান না পেয়ে কেবল কাঁটার পর কাঁটাই বয়ন করে গেলি, আর অস্থির, উন্মাদের মতো আজ এই কাজ তো কালকে অন্য কাজের চক্রে কেবলই পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগলি যাতে কোন না কোন ভাবে সেই শূন্যতাটা ভরে যায়—যে শূন্যতা ভরার জন্যে কেবল এক নারীর বুকভরা ভালবাসারই প্রয়োজন ছিল তোর··· আহ্ !···

নার্স ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো।

আমি একমুহূর্ত ইশ্তিয়াকের নিঃশব্দ, স্থির হয়ে শুয়ে থাকা, বিষের প্রকোপে কালি হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। শিয়রের বালিশের দিকের বন্ধ জানালার কাঁচের ওপর একটা বাতাসের ঝাপ্টা আছড়ে পড়ে ঝন্ঝন্ শব্দ করে উঠল। তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি কামরা থেকে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।
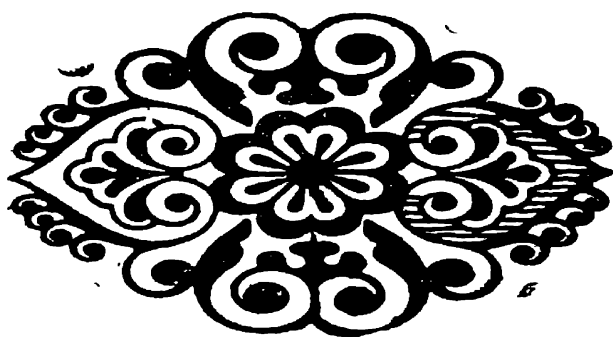
□ গল্পগুচ্ছ □

য়ুক্যালিপটাস্ গাছগুলো যেখানে একটা কুঞ্জবনের মতো তৈরী করেছে, সেখানে এসে জালিম্ সিং দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর মাথার ওপর ট্রাঙ্ক পিঠের ওপর বিছানার গাটরী আর কাঁধের ওপর থেকে ঝোলানো রাইফেল। মুহূর্তকয়েক দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল ও।

চার হাজার ফুট চড়াই পেরিয়ে তবে এখানে পৌঁছেচে ও। এখন ওর দৃষ্টির নীচে পাহাড়ী ঘাঁটি আর ঢ্লানগুলো যেন গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। চীর গাছে ভর্তি জঙ্গলগুলোও যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে আরও নীচের দিকে। সব চেয়ে নীচে অবশ্য ঝিক্‌মিক্ শোন্‌নদী যেন কোন সুন্দরী মেয়ের সুললিত কোমরে দোল খাওয়ার মত ঢেউ তুলে পাথরের কোমর ছুঁয়ে ছুঁয়ে খল্‌খল্ করে বয়ে যাচ্ছে।

জালিম সিং-এর মুখে হাসি ফুটল। একটা নিশ্চিন্ত তার, বাতাস ওর বুকের মধ্যে বয়ে গেল! এই সব দৃশ্য কত বছর কত যুগ ধরে যে ওর পরিচিত। ওর হাতের রেখাগুলোর মতই এই সব দৃশ্যগুলো, তাদের কোথায় কি আছে না আছে ও এক পলকেই সব বুঝে ফেলতে পারে। দুই নাকের মধ্য দিয়ে ও আপন দেশের বিশুদ্ধ হাওয়া বুক ভরে টেনে নিতে লাগল। চীর গাছ আর য়ুক্যালিপটাস্ গাছের এলাচ এলাচ সুগন্ধে ওর শরীর-মন ভরে উঠল। বারকয়েক ও ওইভাবে সেই সুগন্ধী সমীর বুকের মধ্যে ফুস্‌ফুসে টেনেটেনে ভরে নিলো।

তারপর ও মাথার ওপর থেকে কালো রঙ করা ট্রাঙ্কটা, যার ডালার ওপর সাদা অক্ষরে লেখা 'সুবেদার জালিম সিং', নামিয়ে মাটির ওপর রাখল। পিঠটা বাঁকিয়ে এক ঝাপটা দিয়ে বিছানার গাটরীটাকে নীচে ফেলল। তারপর কাঁধ থেকে সাবধানে রাইফেলটা খুলে নিয়ে পাশের খাড়া পাথরের চাঁইটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। শেষে বড় বড় ফৌজী বুটজোড়ায় মশ্‌মশ্ শব্দ তুলে য়ুক্যালিপটাসের কুঞ্জ

মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনীর দিকে এগিয়ে গেল।

ওর পায়ের বুটের ঠোক্করে কয়েকটা ছোট ছোট পাথর ছিট্‌কে গেল। আর ছিট্‌কে গিয়ে স্রোতস্বিনীর জলে পড়ে গুড়ুপ্‌ গুড়ুপ্‌ শব্দ তুলে ডুবে গেল। ও স্রোতস্বিনীর নরম, সোনালী, চক্‌চকে বালিয়াড়ীর ওপর গিয়ে সোজা শুয়ে পড়ল। যেমন ও ছোটবেলায় এই বালিয়াড়ীতেই এসে শুয়ে থাকত। তারপর কড়া রৌদ্রের তাপে তামাটে হয়ে যাওয়া ওর গাল দুটো স্রোতের জলে ধুয়ে নিল। প্রথমে ডান গালটা আলগোছে জলের ওপর পেতে দিল—ওর মনে হলো যেন ঠাণ্ডা মালাইয়ের মোলায়েম স্পর্শ ওর গাল ছুঁয়ে রয়েছে। তারপর ও বাঁ গালটা জলের ওপর পেতে দিল। ওর বুকের মধ্যে একটা খুশীর লহর হিল্‌মিলিয়ে উঠল। আর সমস্ত শরীরটাকেই ও জলে ডুবিয়ে দিল যতক্ষণ দমে কুলোলো ও জলের মধ্যে ডুব দিয়ে রইল। চোখ দুটো খুলে স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কেমন করে সোনালী রঙের বালি আর ফার গাছের চক্‌চকে পাতাগুলো জলের নীচ দিয়ে নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে। জলের ঠাণ্ডা হিমেল পরশ ওর শরীরের ভেতর পর্যন্ত জুড়িয়ে দিল।

তারপর মুখ দিয়ে বুড়বুড়ি ছাড়তে ছাড়তে ও জলের ধারে এসে মাথা তুলল। হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ে এসে উঠে বসল। য়ুক্যালিপ্‌টাসের ডালে বসে একটা কাক কা-কা করে জোরে ডেকে উঠল। জালিম সিং চম্‌কে উঠল। পাশ থেকে একটা ছোট পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে জোরসে ছুঁড়ে মারল। কাকটা কা-কা করতে উড়ে গেল। জালিম সিং নিজের মনেই হা-হা করে হেসে উঠল।

হয়তো, ওর বাড়ীর কাছের কোন গাছের ডালে বসে এই মুহূর্তে আর একটা কাক এমনি কা-কা করে কর্তারোকে কোন অতিথির শুভাগমনের খবর জানিয়ে দিচ্ছে! তিন বছর পর ও দেশে ফিরছে। নিজের বাড়ীতে। ও কর্তারোকে চিঠি লিখে দিয়েছে। এই মুহূর্তে ও যেমন দুরু দুরু বুকে আনন্দের ঢেউগুলোকে কোন মতে দমন করে কেবল কর্তারোর কাছে পৌঁছে যাবার শুভক্ষণটুকুর প্রতীক্ষা করছে; তেমনি

হয়তো উথাল পাতাল আনন্দকে বুকের মধ্যেই কোন মতে থামিয়ে রেখে ওর প্রাণের প্রতিমা স্ত্রীও ওর জন্যে প্রতীক্ষার দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে পড়ছে!

তিন বছর আগে যেদিন ও কর্তারোর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছলো, তো সেদিন এই য়ুক্যালিপ্টাসের কুঞ্জ পর্যন্ত ওর বউও ওকে শেষ বিদায় জানাতে এসেছিল সেই সময় কর্তারোর পরনে যে বেশবাস ছিল, জালিম সিং-এর স্মৃতিতে সেই পোষাকেই ওর বউ এই মুহূর্তে যেন বড় বাস্তব হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কর্তারোর ঈষৎ খাটো শরীর, কিন্তু সুডৌল য়ুক্যালিপ্টাস্-ডালের মত ভরা-ভর্তি গড়ন, একটু পাতলা অথচ তীক্ষ্ণ নাক-চোখ, নীলরঙ সার্টিন কাপড়ের লম্বা ফুলদার কামিজে উপ্‌চে পড়া ভরন্ত কোমরে হিল্লোল তুলে যখন ও হাঁটে···অকস্মাৎ জালিম সিং-এর শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত উত্তাল হয়ে যেন তুফান তুলল! সেই ভয়ঙ্কর রক্তের তুফান ওর শরীরের মধ্যে এত জোরে শব্দ করে গজরাতে লাগল যে ওর মনে হলো সেই শব্দ যেন আশপাশের পাহাড়, বন-জঙ্গল-খাদ-নদীর প্রান্তে প্রান্তে এসে আছড়ে পড়ে সেই শব্দকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওর যেন আর কর্তারোর কাছে গিয়ে পৌঁছবার সময়টুকুও সইছিল না। ওর বাড়ী অবশ্য আর মোটেও দূরে নয়। এই য়ূক্যালিপটাস্ কুঞ্জ থেকে মাত্রই আধ ক্রোশ দূরের যে বাঁক, সেটা ঘুরলেই ওর বাড়ী। কিন্তু ওখানে পৌঁছবার জন্য ওইটুকু সময়ই বা আর কে অপেক্ষা করে। সর্বক্ষণের জন্য তো সবারই একটা করে হেলীকপ্টার থাকা উচিত। হেলীকপ্টার উড়িয়ে নিয়ে ও সোজা নিজের বাড়ীর ছাদে গিয়ে নামতে পারত আর দু বাহু ছড়িয়ে গর্বিত ভাবে কর্তারোকে ডাকতে পারতো:

"মাখিয়ো···মায় আ গয়া!—মিষ্টি-বউ! আমি এসে গেছি!" হ্যাঁ, ও বউ কর্তারোকে 'মাখিয়ো', পাহাড়ী ভাষায় যার অর্থ 'মিষ্টি', তাই মিষ্টি-বউ বলে ডাকতো। সত্যি। কর্তারো বাস্তবিক এক টুকরো মিষ্টির মতই, যেন এক টুকরো সোনালী রঙের নতুন গুড়ের মতই। ওর গলার স্বর শুনে, ঘরের মধ্যে কোন কাজে ব্যস্ত ওর বউ কর্তারো প্রথমে

চম্‌কে উঠত, তারপর ছুটে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বড় বড় দুটি স্বপ্নিল, দীবল চোখে পৃথিবীর বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতো, কোন কথা বলতে পারতো না, আর ও তখন ছাদের ওপর সোজা উঠোনে লাফিয়ে পড়েই কর্তারোকে, ওর মিষ্টি-বউকে, টেনে নিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিত।

ওর শরীরের রক্তস্রোত এত জোরে গর্জন করে ছুটতে লাগল, আগুনে ওর গাল দুটো এমন তম্‌তম্‌ করতে লাগল যেন গম্‌গমে ভেতরের আগুনের ওপর তামার একটা টুকরো রেখে দিয়েছে কেউ। জালিম সিং তাড়াতাড়ি আঁজলা ভরে জল তুলে চোখে মুখে গালে ঝাপ্‌টা দিতে লাগল, দুই, তিন, চারবার। যখন স্রোতস্বিনীর শীতল জলের স্পর্শে আবার শরীর জুড়িয়ে এল, সেই মুহূর্তেই লাফিয়ে জল থেকে উঠে আগে রাইফেলটা তুলে নিয়ে কাঁধে লট্‌কে দিল, বিছানাটা পিঠের ওপর ফেলল, আর কালো রঙ করা ট্রাঙ্কটা, যার মধ্যে ওর আর কর্তারোর কাপড়-চোপড় আর চন্দনের জন্য উপহার ইত্যাদি ছিল, নিজের মাথার ওপর তুলে নিল আর বড় বড় পা ফেলে গাঁয়ের দিকে রওনা হলো।

যেতে যেতে ও মনে মনেই প্রার্থনা করতে লাগল যেন কারো সঙ্গে ওর দেখা না হয়ে যায়। কর্তারোকে দেখার আগে অন্য আর কারো সঙ্গে ওর দেখা হোক, তা চায় না ও। তিন বছর পর ও নিজের গ্রামে ফিরছে। ও ভালভাবেই জানে যে যদি পথে কারো সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়, তাহলে প্রথমেই সে ওকে গলা জড়িয়ে ধরে অভিনন্দনের ঠেলায় অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাটিয়ে দেবেই। তারপর কাঁধে হাত রেখে ওর খবর হালচাল জানতে চাইবে; এবং পরক্ষণেই গলা সপ্তমে তুলে আশেপাশের ক্ষেতে যারা কাজ করছে, তাদের ডাকতে থাকবে,—'ও বন্তাসিংহা, ও মুহম্মদ দীনা, ও কাদ্‌রে, ওয়্‌ পেড়া রাম—ছাখ, কে এসেছে!—আমাদের গাঁয়ের সুপুত্তুর সুবেদার মেজর জালিম সিং··· ! ব্যাস্‌! ফল হবে এই যে গাঁয়ের সীমানায় এসেও ঘণ্টা তিনেকের আগে আর নিজের বাড়ীতে পৌছনো যাবে না!···আচ্ছা, এমন হয় না যে

গাঁয়ের সব লোক, ওর কর্তারো, আর ভাই চন্দন সিং বাদে, মরে যায় …এই অল্প সময়ের জন্য…বা ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা অন্ধ হয়ে যায়? কয়েক মিনিট—মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে…চলতে চলতেই ও ভাবতে লাগল যে অমনটা তো কখনোই ঘটবে না, তাই সঙ্গে সঙ্গে ও রাস্তা বদল করল।

ও ত্রাসনালীতে ঢুকে পড়ল। এই নালীটা গ্রামের ঠিক পেছন দিকে চড়াইয়ের নীচে দিয়ে একটা বিপজ্জনক গড়খাইয়ের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। চড়াইয়ের ওপরেই গ্রাম। গ্রামের অন্যদিকে পাহাড়ের ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া ক্ষেতের সবুজ শতরঞ্চি বিছানো। এখন থেকে ও যেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, ওকেও কেউ এখানে দেখতে পাবে না। কারণ, বসতি ওপরে। আর ও ত্রাসনালীর কিনার ধরে, নীচ দিয়ে, জঙ্গলী আখরোট গাছের ঘন ছায়ার মধ্য দিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছিল। কেন না, ঢলান এখানে খুবই ভয়ানক, পিছলে পড়ে গেলে দেহ আর আস্ত থাকবে না। আর এদিক দিয়ে গ্রামে যাবার কোন রাস্তাও নেই। কিন্তু, একটা রাস্তা ও জানতো—ছেলেবেলার সেই রাস্তা—থ্যাবড়া থ্যাবড়া পাথরের ওপর দিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পিচ্ছিল রাস্তা—যেখান দিয়ে ছাগল গুলো কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে পার হ'তো। কোন কোন সময় গাঁয়ের কিছু দুষ্টছেলের দল সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে নীচে ত্রাসনালীর ধারে আখরোট গাছের জঙ্গলে পৌঁছে যেতো আর আখরোট ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতো। ওই রাস্তাটা ঠিক ওদের বাড়ীর পেছন দিকের চড়াইয়ের নীচ দিয়ে সুরু হয়েছে।

এই রাস্তা দিয়ে যেতে গ্রামের কারো সঙ্গে ওর দেখা তো হবে না বটেই, এমন কি কর্তারোও আগে ভাগে জানতে পারবে না যে ও এসে পড়েছে। ও যতক্ষণ না উঠোনে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে 'মাখিয়ো' বলে হাঁক পাড়ছে, ততক্ষণ ও নিজেও মিষ্টি। বউকে দেখতে পাবে না।

চলতে চলতে ও হঠাৎ চমকে উঠল—দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনেই ছুটো নীল রঙের পাথরের চাঁইয়ের মাঝখানে একটা আখরোট গাছ।

গাছের ওপর দুটো ছেলে বসে আখরোট পাড়তে গিয়ে চকিতে থেমে, আশ্চর্য হয়ে ওর ঝকঝকে সৈনিকের উর্দি আর কাঁধের ঝোলানো রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেলে দুটো ছাগলের মতই লাফাতে লাফাতে পাথর ডিঙ্গিয়ে চড়াইয়ের ওপর উঠেই চিল্লিয়ে মিল্লিয়ে গ্রামে ওর আগমন বার্তা পৌঁছে দেবে; মানে দিতে পারে। কিন্তু তার আগেই ও হাতের ইশারায় ছেলে দুটোকে গাছ থেকে নামতে বলল। প্রথমে চুপচাপ বসেই রইলো ছেলে দুটো। তারপর ওর রাগী রাগী চেহারা দেখে একটু ভয় পেয়ে নীচে নেমে এসে দাঁড়ালো।

জালিম সিং ওর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেলোফোন কাগজ মোড়া একটা প্যাকেট থেকে টফি বার করল—এগুলো কর্তারোর জন্যে এনেছে ও।

চারটে টফি নিয়ে ও ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নে, ধর!'

ছেলে দুটো সবিস্ময়ে দাঁড়িয়েই রইল।

'নে'! ও ধমকের স্বরে বলল, 'অংগ্রেজী মিঠাই!'

ইংরেজী মিঠাইয়ের নাম শুনে ছেলে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল।

জালিম সিং তখন কাঁধের রাইফেল দেখিয়ে বলল, 'যদি তোরা কাউকে বলিস যে জালিম সিং গাঁয়ে এসে গেছে, তাহলে গুলি করে মেরে ফেলব—বুঝেছিস্?'

ভয়ে, আতঙ্কে ছেলে দুটোর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কোন মতে মাথা নেড়ে জানালো যে তারা বুঝেছে। জালিম সিং আবার এগিয়ে চলল। চলতে চলতে নিজের মনেই মুচকি হাসতে লাগল—এখন ঘণ্টা খানেক অন্ততঃ ছেলে দুটোর সাহসই হবে না ওপরে গাঁয়ের দিকে যেতে। ও বুঝতে পারছিল যে ছেলে দুটো ওই আখরোট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে এখনও পেছন থেকে ওকে দেখছে। ও অবশ্য পেছন ফিরে দেখাটা ঠিক মনে করল না। তাতে ভয়ের প্রভাবটা কমে যেতে পারে। ও হাসতে হাসতে একেবারে ওদের বাড়ীর পেছন দিককার চড়াইটার নীচে এসে দাঁড়ালো। ওপরে উঠলেই কয়েক পা ওর বাড়ীর পাছদুয়ার!

ওপরে উঠবার বলতে গেলে কোন রাস্তাই নেই। দেখেই বোঝা যায় যে বহুদিন ধরেই এদিক দিয়ে কেউ যাতায়াত করেনি। গ্রামের ছেলেপুলেরাও বোধ হয় নীচে ত্রাসনালীতে আসবার অন্য কোন সহজ রাস্তা বার করে নিয়েছে এর মধ্যে!

এখানে তো কেবল উঁচু উঁচু পাথরের চাঁই। মাঝে মধ্যে যেটুকু মাটি আছে, তা বেশ পিচ্ছিল। জায়গায় জায়গায় মৌরী গাছের বা জংলীকুলের ঝাড়। কুলগুলো খেতে কিন্তু খুব মিষ্টি! তিন বছর ও কুল চাখে নি। তিন বছর ও কর্তারোর ঠোঁট দুটোর স্বাদ থেকে বঞ্চিত! সারা রাস্তা চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, কুলের স্বাদের কথা ভাবতে ভাবতে কেবলই কর্তারোর কথা ওর কেন যে মনে পড়ে যাচ্ছিল!

জোর কদমে ওপরে উঠতে লাগল ও।

অন্তিম চড়াইটুকু পার হতে বেশ কষ্টই হলো ওর। অবশ্য সৈনিকদের স্বাভাবিক কুশলতা এখানে বেশ কাজে লেগে গেল। তবুও শেষ ধাপ এখনও বাকী। এবং কোন রাস্তাই নেই এখানে। ও যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গা থেকে মাথার ওপরে অর্ধেক বেরিয়ে আসা চাঁদোয়ার মত যে চ্যাপ্টা পাথরের ফালিটা বেরিয়ে আছে, সেটা প্রায় পৌনে গজ ওপরে ওর হাতের সীমা থেকে। কিন্তু সেই ওপরে ও পৌঁছবে কি করে···মাথার এই বোঝা নিয়ে?

ও খুব সাবধানে মাথার ওপর দুহাতে ট্রাঙ্কটা তুলে ধরে, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে শরীরের পুরো শক্তি একত্র করে ওপরের দিকে পাথরের ওপর ছুঁড়ে দিল। পরক্ষণেই নিজেও লাফ দিয়ে ওপর দিকে দেহটা ছুঁড়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে পাথরের ধার ধরে ফেলল। ওর শরীরটা তখন শূন্যে ঝুলছে ও হরাইজণ্টাল বারে দোল খাওয়ার মত শরীরটা বার কয়েক সেই শূন্যে দুলিয়েই বাঁদরের মত হাতের ওপর চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে দেহটাকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল!

ওপরে, ওর শরীরটাকে লম্বা লম্বা ঘন ঘাসের জঙ্গল যেন কোল পেতে গ্রহণ করল। ওর বাড়ীর পাছদুয়ারেই এই ঘাসের জঙ্গল। শুধু ঘাসই নয় অবশ্য। আপনা থেকেই গজিয়ে ওঠা ভাঙ-এর গাছ বা

পোস্তর চারাও আছে। আর আছে লাউ গাছ। ঘরের ছাদের ওপর থেকে দেয়াল বেয়ে নীচে এসে এই ঘাসের জঙ্গলেও ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় লাউ পাতা, ভাঙ আর পোস্ত গাছ, ঘাসের জঙ্গল থেকে একটা অদ্ভুত নেশা ধরানো কড়া গন্ধ ওর নাকের ভেতর দিয়ে শরীর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। ভালই লাগছিল ওর। কিছু সময় ও চুপচাপ সেই নরম ঘাসের ওপর শুয়ে রইল। কোথাও কারো সাড়া নেই। এক গভীর নিস্তব্ধতা চারপাশে। যেন সমস্ত বাতাবরণ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আর কর্তারো ওর শরীরের ওপর নুয়ে পড়ে যেন শ্বাস নিচ্ছে, ছাড়ছে···ধড়মড় করে ও উঠে বসল। ট্রাঙ্কটা আবার মাথার ওপর তুলে নিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দেয়াল ঘেঁষে চলতে চলতে ও নিজের ঘরের দরজায় পোঁছে গেল।

দরজা খোলাই ছিল। চৌকাঠ থেকে ভেতর বাড়ীর লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে রান্নাঘরের উনুনের পাশে বসে থাকা কর্তারোর ওপর ওর নজর পড়ল। কর্তারো ওকে দেখতে পেল না। কারণ, এদিকে পেছন ফিরে বসে ছিল সে। কিন্তু জালিম সিং দেখতে পাচ্ছিল। ঢেউ খেলে যাওয়া পিঠের ওপর তার এলানো কেশরাশি, হলুদ রঙের ফুল তোলা কাপড়ের সালোয়ার আর কামিজ, ভরন্ত হাতের কুনুইয়ের টোল খাওয়া গর্ত আর সোনার বালার চিকচিক ওর দুচোখে যেন নেশা ধরিয়ে দিল। ঠোঁট চেপে খুব সাবধানে মাথার ওপর থেকে ট্রাঙ্কটা নামিয়ে কোন শব্দ না করে দরজার ভেতর এক কোণে রাখল। তারপর বিছানাটা···। এবার অতি সন্তর্পণে দেহটা ঝুঁকিয়ে পা টিপে টিপে বারান্দার দিকে এগোল।

কিন্তু ওর পরনে ফৌজীবুট। কয়েক পা চলার পরই কিসে যেন একটা ঠোককর খেতেই শব্দ শুনে চমকে উঠে কর্তারো ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালো। দেখল। আর দেখা মাত্রই কর্তারোর সমস্ত মুখ—অবয়ব লাল হয়ে গেল। যেন আকাশে থেকে একরাশ লাল মেঘ নেমে এসে তাকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিল! বসে থেকেই সে আরও ঝুঁকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে নিজেরই দুই হাঁটুর ভাঁজে সমস্ত শরীরটাকে

যেন লুকিয়ে ফেলতে চাইল কর্তারো।

দু-তিনটে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়েই জালিম সিং কর্তারোকে নিজের দু'হাতে ধরে তুলে নিয়েই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। কর্তারোর যেন দম আটকে আসতে চাইল। ছাতাটা পড়ে গেল মেঝেয় তার হাত থেকে। স্বামীর বুকের সঙ্গে মিশে থেকেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অনেকটা সময় কেটে যাবার পর জালিম সিং এর বুকের ধুকপুকুনি যখন কিছুটা প্রশমিত হলো তখন তেমনি ভাবেই কর্তারোকে বুকের সঙ্গে ধরে রেখে সে প্রশ্ন করল ঃ

"চন্দন কোথায়?"

জালিম সিং-এর এবার নিজের ভাইয়ের কথা মনে পড়ল।

কর্তারো জবাবে কিছুই বলল না। কেবল জালিম সিং এইটুকু অনুভব করতে পারল কর্তারোর শরীরটা জোরে কেঁপে উঠল একবার।

তারপর ওর দু হাতের মধ্যে তার শরীরটা কেমন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

"কি হলো? কথা বলছিস্ না কেন? চন্দন সিং কোথায়?..." জালিম সিং কর্তারোকে নিজের বুক থেকে আলগা দিয়ে প্রশ্ন করল।

কিন্তু কর্তারো স্বামীর বুক থেকে নিজেকে সরালো না। বরং আরও জোরো আঁকড়ে ধরে ফোঁপানির মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

'কি হয়েছে, কর্তারো? বলছিস না কেন? চন্দন সিং কি মরে গেছে?'

মুখে কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে 'না' করল কর্তারো।

'তবে'? অন্য কোন গাঁয়ে গেছে?'

কর্তারো আবার মাথা নেড়ে জানালো, না।

'তাহলে সে কোথায় গেছে?' জালিম সিং এবার একটু কড়া স্বরে প্রশ্ন করল।

'তোমার আসার খবর শুনেই পালিয়েছে,' কর্তারো ফোঁপাতে

ফোঁপাতেই বলল। এখন সে তার সরু সরু গোলাপী আঙুল দিয়ে জালিম সিং-এর চওড়া, রোমশ বুকে বিলি কেটে দিচ্ছিল।

'পালিয়েছে! কেন?' জালিম সিং কিছুই বুঝতে পারছিল না। চন্দন ওর ছোট ভাই। বাপ-মা মরা ছোট ভাই ওর। জালিম সিং কেবল ভাই নয়, চন্দনকে নিজের ছেলের মতই দেখে। খুবই আদর যত্ন দিয়ে ভাইকে বড় করেছে ও। দুই ভাইয়ে ওদের ভালবাসা মিল-মিশও যথেষ্ট। সে জন্যেই—জালিম সিং কর্তারোর কথা ঠিক বুঝতে পারছিল না।

কর্তারো স্বামীর বুকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে মুখ উঁচু করে কানের কাছে নিয়ে গেল। কর্তারোর পাতলা ঠোঁটের ছোঁয়া লাগল জালিমের কানে আর তার উষ্ণ নিঃশ্বাসের বাতাস গালের ওপর পড়তে বেশ ভালই লাগল ওর। কর্তারো আস্তে আস্তে মাঝে মধ্যে ফোঁপাতে ফোঁপাতেই জালিমের কানে কানে কিছু বলতে লাগল। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই জালিম সিং কর্তারোকে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দিল নিজের বুক থেকে যেন এতক্ষণ একটা বিষধর সাপকে ও বুকে ধরেছিলো!

তারপর, কেমন যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে কর্তারোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল ও। ওর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মত জমে যেতে লাগল। গলার মধ্যে কি যেন একটা আটকে গেল—মনে হলো যেন কেউ একটা বরফের বড় টুকরো জোর করে ওর গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে!

হঠাৎ ও চিৎকার করে বলে উঠল: ঠিক বলছিস? সত্যি সত্যি বলছিস?'

কর্তারো স্বামীর ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। দুতিন বার যেন নিরুপায় ভঙ্গীতে হাত দুটোয় ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেও ফের পড়ে গিয়ে দুহাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মুখে কিছুই বলল না।

জালিম সিং হঠাৎ রাইফেলটাকে তুলে নিল এক হাতে। অন্য হাতের এক ঝট্‌কায় কর্তারোর পড়ে থাকা দেহটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে

দিল। তারপর বারান্দার দেয়ালের সঙ্গে হেলানো একটা কোদাল তুলে নিয়ে কর্তারোর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'চল্ আমার সঙ্গে।'

কর্তারো ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছো?

'বেশী বকবক করবি না, আমার পেছন পেছন চলে আয়!' জালিম সিং গর্জে উঠল।

কথাগুলো বলেই ও দরজা দিয়ে বাইরে পা বাড়ালো। কাঁপতে কাঁপতে কর্তারোও ওর পেছু পেছু চলতে লাগল।

পশ্চিম দিকে পাহাড় যেখানে ঢালু হয়ে নেমেছে সেখানে কিছু ছাগল চরে বেড়াচ্ছে আর তাদের পাহারা দিচ্ছে একটা কুকুর। জালিম সিং চিনতে পারল কুকুরটাকে—ওদেরই ডাকু নামে কুকুরটা।

"ডাকু!" জালিম সিং হাঁক পাড়লো।

প্রভুর গলা শুনে ডাকুও চিনতে পেরেই তীরবেগে দৌড়তে দৌড়তে এসে একেবারে লাফ দিয়ে কাঁধে উঠে পড়ল। কিন্তু জালিম সিং তাকে একটুখানি কাঁধে রেখেই নামিয়ে দিয়ে কর্তারোকে বলল, "চন্দন সিং-এর কোন কাপড় চোপড় থাকলে নিয়ে আয়! ডাকুকে শোঁকাতে হবে। অবশ্য আমি জানি সে কোথায় লুকিয়ে আছে। তবু কুকুরটাও সাহায্য করতে পারে। ডাকু খুব হুঁশিয়ার কুকুর।"

দিনভর ওরা পাহাড়ে—জঙ্গলে ঘুরতে লাগল।

কর্তারো বার বার ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল আর বিবশ দুর্বল স্বরে বার বার জালিম সিংকে এমন করে ফিরে যেতে বলছিল যে তাতে জালিম সিং-এর রাগ ডবল হয়ে যাচ্ছিল আর প্রচণ্ড ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার এগিয়ে যাচ্ছিল। ডাকুও যেন কিছু গন্ধ পেয়েছে। বেশ খুশী খুশী ভাবে লেজ নাড়তে নাড়তে ঝোপ-ঝাড়, গাছের তলা বা রাস্তার এধার ওধারে পড়ে থাকা পাথরের চাঁই গুলো শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলেছে। সেও যেন নিজের ভাই চন্দনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। ডাকুও চন্দনকে খুবই ভালোবাসে। সে জন্যেই তাড়াতাড়ি করে পৌছতে চাইছে সে।

"ওখানেই গেছে," প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ডাকুর গতিপথের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করল জালিম সিং। একবার ছোটবেলায় দুষ্টুমী করার জন্য চন্দনকে খুব পিটিয়েছিল ও। পিটুনি খেয়ে চন্দন ভয়ের চোটে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে, চীরবনের ওপারে শাহ্‌পীরের চটিতে চলে গেছল। এই চটি কোনো থাকার জায়গা নয়। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই, লক্ষলক্ষ বছর ধরে যাদের ওপর বরফ জমে, আবার গলে যায়। যখন বরফ গলে যায় কেমন উদোম ল্যাংটো মনে হয়। ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু বরফের জাফরিগুলো জমেই থেকে যায়। এরই মধ্যে একটা মস্তবড় গুহা যাতে প্রবল ঝড় বাদল বা বরফ-ঝড় শুরু হলে বিদেশীরা সাময়িক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দুদিন ধরে খোঁজার পর জালিম সিং চন্দনকে সেই গুহা থেকেই উদ্ধার করেছিল। এর পরেও যখনই জালিম সিং-এর সঙ্গে কোন কারণে চন্দনের কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া-ঝাটি হতো—চন্দন রাগ করে এই গুহাতেই এসে আশ্রয় নিত। কারণ সে জানত যে দাদা ঠিক এখানে এসে তার রাগ ভাঙ্গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ওরা শাহ্‌পীরের চটির ওপর এসে পৌছল। জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর। অনেক দূর-মাইলের পর মাইল পাহাড় উঁচু-নীচু হয়ে আকাশের গালে চুমু খেতে খেতে যেন ছুটে পালাচ্ছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র ধরনের বরফের জাফরিগুলো যেন প্রাকৃতিক নয়—কোন শিল্পীর কারিগরী বলে মনে হয়। কিন্তু জালিম সিং-এর চোখ এখন এই সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছিল না।

একটা জাফরিকাটা খাড়া পাথরের কাছে গিয়ে ডাকু ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। জালিম সিং কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিল।

"এ কি করছো? কি করছো তুমি?" কর্তারো কান্না মেশানো গলায় বলে উঠল, "ও তোমার ভাই—চন্দন!"

"কিন্তু ও আমার ইজ্জতের ওপর হামলা করেছে," বলেই কর্তারোকে ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে কুকুরের পেছনে এগিয়ে গেল জালিম সিং।

কুকুরের ডাক আর পায়ের শব্দ শুনে একজন কেউ পাথরটার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। চোখের ওপর তৃতীয় প্রহরে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার। মাথাটা একটু বড় আকারের, খোলা কমলের মত দুটি চোখ, বছর কুড়ি বয়সের যুবক, জালিম সিং-এর মতই লম্বা চেহারা। তবে জালিমের মত মজবুত দেহ নয়। বরং কিছুটা রোগা-পাতলা এবং একটু দুর্বলও বটে। কিন্তু তার দাঁড়ানোর নিশ্চিন্ত ভঙ্গী এবং তার দেহের সুষমা যেন নিটোল এক কবিতার মতো। অত্যন্তই সুন্দর তার চেহারা। ভাইয়ের এই সুন্দর চেহারা নিয়ে জালিমের কতই না গর্ব ছিল। তার সেই সৌন্দর্যই এই মুহূর্তে ওর গালে চড় হয়ে বাজল যেন। ও রাইফেল সোজা করে ধরল।

"ভাইয়া!" দু'বাহু ছড়িয়ে চন্দন ডাকল।

"ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক!" জালিম সিং কঠিন গলায় বলেই নিশানা ঠিক করে নিল।

"ভাইয়া, আমার কথা তো শোন!"

কিন্তু চন্দন সিং-এর খোলা মুখ খোলাই রয়ে গেল। জালিম তার বুকে গুলি করে দিয়েছে। এক পল মাত্র। চন্দন সেই নীল নীল জাফরিকাটা পাথরটার তলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল; পরক্ষণেই ঘুরপাক খেয়ে নীচে গিয়ে পড়ল চ্যাটালো একটা পাথরের ওপর। পড়েই স্থির হয়ে গেল দেহটা।

রাইফেলের ভয়ঙ্কর আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। যেন একসঙ্গে শত-সহস্র রাইফেল গর্জে উঠল। দূরের আকাশের ওপর কোন চিল চিংকার করে উঠল। তারপরই চারপাশে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

জালিম সিং কর্তারোর দিকে ফিরে তাকালো।

কর্তারো ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার দু'চোখে রাজ্যের ভয় আর ঠোঁট দুটো এমন সাদা যেন কেউ তার ঠোঁটের সমস্ত রক্ত চুষে নিয়েছে।

জালিম সিং তার হাতে ধরা কোদালটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "আমি

নীচে গিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ছি এটাকে পুঁতে ফেলার জন্যে। ততক্ষণ লাশটাকে পাহারা দিবি তুই!"

কর্তারো কিছুই বলল না। তার চোখে এক ফোঁটা জলও নেই, না আছে কোন শব্দ তার মুখে। চুপচাপ একই জায়গায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর যখন জালিম সিং কোদাল হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে পাথর টপকাতে টপকাতে দূরে নীচের দিকে চলে গেল—একেবারে চক্ষুর সীমানা পার হয়ে গেল, তখন সে ধীর পায়ে, ভয়ে ভয়ে লাশের কাছে এগিয়ে এলো…দেখতে লাগল অপলক হয়ে…দেখতে দেখতে কর্তারোর উদাস শরীরে স্পন্দন জাগল, বিচিত্র এক হাসি জেগে উঠল তার নিঃশব্দ ঠোঁটের কোণে, চাপা হুল বেঁধানো স্বরে সে বলে উঠল, "আমাকে ছেড়ে ওই সাবিত্রী মাগীটার সঙ্গে প্রেম করতে গেছলে! কেমন?"

বলে একটু ঝুঁকলো, তারপর আরেকটু নুয়ে পড়ল, শেষে ক্লান্ত শরীরটা বসে পড়ল চন্দনের শিয়রের কাছে। চন্দনের মাথা নিজের কোলে তুলে নিল কর্তারো। হুহু করে দু'চোখের কোল ছাপিয়ে নেমে এলো অশ্রু অবিরল ধারায়। চন্দনের মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে তারঠোঁটের ওপর অবিশ্রান্ত চুম্বন করতে করতে সে বলতে লাগল, "আর তুমি কারো কাছে যেতে পারবে না…তুমি এখন আমার… চিরদিনের জন্য…আমার চন্দনহার…!"

## ভালোবাসার এক টুকরো

আজ মনোহরেরর বারে কোনো হাঙ্গামা হয় নি। লম্বা কাউণ্টারের সামনে অর্ধাকৃতি চাঁদের মতো বারোটা গদীওলা ষ্টুলের ওপর মনোহরের বারোজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাথা নীচু করে চুপচাপ এমনভাবে মদ খেয়ে যাচ্ছিল যেন মদ নয় জোলাপ জাতীয় কোন ওষুধ খাচ্ছে, তাদের হাবভাবে এরকমই একটা কষ্টের ভাব ফুটে বেরুচ্ছিল। কাউণ্টারের সামনে হলের মেঝেতেও এইরকম একটা নিস্তব্ধতা। ভেতরে ঢুকেই একটু সময় আমার মনটাও কেমন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। এত নিস্তব্ধ কেন সব বুঝলাম না। কেননা, এই মনোহরের বার দিল্লীর মধ্যে সব চেয়ে ভব্য-সভ্য বার বলেই পরিচিত। ঝগড়া কখনও হতো না, কিন্তু হাঙ্গামা রোজ হতো। এখানে শহরের সব জ্ঞানী ব্যক্তিরা আসেন। কবি এবং পণ্ডিত, দার্শনিক ও সঙ্গীতকার, লেখাপড়া জানা ব্যবসায়ী আর দামী পোষাক পরা—যাকে বলে মাঞ্জা দেওয়া বিলাসীবাবুরা এবং মাঝে মধ্যে ঠোঁটের কোণে লজ্জিত হাসি নিয়ে কোন সরকারী অফিসার। যেন অফিসার হয়েও এখানে আসাতে খুবই দুঃখিত এবং লজ্জিত! মনোহরের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অনেক বিস্তৃত এবং এই বার-এ তাদের সংখ্যাই বলতে গেলে বেশী। বিকেল হতে হতেই সব এসে পড়ে। রাত এগারটা পর্যন্ত পান, আর গুলতানি বেশ জমিয়েই চলে। হাসি-মস্করা, কাব্য-কবিতার আলোচনা বা পাঠ, এর ওর পেছনে লাগা—সবই চলে। এগারটা বাজলেই মনোহর বার বন্ধ করে দেয়। তারপর তার অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে অ্যাপোলো হোটেলের লনে চলে যায়।

এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আর একদফা পান চলে সেখানে, কারণ, অ্যাপোলো হোটেলে বারোটা পর্যন্ত মদ্য পরিবেশন চলে।

অ্যাপোলো হোটেলে মদ্যপানের মধ্যে আবার আরেক রকমের মজা। খোলা লন, খোলা আকাশের তলায়, তেঁতুল গাছের নীচে মদ তো নয় যেন জ্যোৎস্না পান, বা নক্ষত্রদের দৃষ্টি-সুধা পান ; রাতের নির্জনে কোন সময় দেখা কোন অপরূপা সুন্দরীর রূপসুধা বা দেহসুধা পান। এই মুহূর্তে প্রত্যেকেই যেন একা—আপন আপন স্মৃতির জগতে হারিয়ে যাওয়া মানুষ। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রাত গভীর হয়, এসে ভর করে প্রতিটি মানুষের ওপর আর তাকে তীব্র আলিঙ্গনে বেঁধে আসঙ্গ-লিপ্সু রমণীর মত উত্তেজিত করে তোলে। তখন গ্লাসগুলোতে মদ আর থাকে না, থাকে শুধু অশ্রু! বারোটা বাজতে বাজতেই মনোহর এই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয়, তারা গম্ভীর উচ্চস্বরে বলে ওঠে, "চল দোস্ত, জি. বি. রোডে যাই।"

জি. বি. রোডের গায়িকার দল যেন বারোটা বাজলেই সবান্ধব—মনোহরের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। চার পাঁচটা মোটরে গাদাগাদি হয়ে পনের বিশজন বন্ধু মনোহরের দৌলতে সব সেরা গানেওয়ালিদের দরজার কড়াগুলোতে খটখট আওয়াজ তোলে। সব জায়গাতেই আধ বা পৌনে একঘণ্টা বসে গান শোনা চলে। রাত তিনটে নাগাদ যখন মনোহর ও তার বন্ধুদের সব পকেট খালি হয়ে যায়, তখন মনোহর ঘন ঘন হাই তুলতে থাকে।

"চল দোস্ত, এবার ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে একটু আরাম করি।"

অদ্ভুত, আজগুবী, চিন্তাভাবনাহীন খোশগপ্পের তীব্র আকর্ষক দিন ছিল সেসব। সেসব দিনে বন্ধুদের কেবল একটাই দুঃখ ছিল—কেন সূর্য ওঠে, রাতগুলো কেন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

সে জন্যেই আজ মনোহরের নির্জন বার দেখে চমকে গেলাম। কাউণ্টারে টাকা-পয়সা নেবার জন্যে মনোহরও সেখানে নেই। তেমনি বিস্মিত হয়েই এগিয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে ডবল-হুইস্কির অর্ডার দিয়ে ঘড়ির দোকানের মালিক, হোলসেলার টেকো রতনলালের মাথায় চাঁটি মেরে বললাম, "কি হে টেকো, আজ এত চুপচাপ কেন?"

রতনলালের একটা রোগ ছিল। যতক্ষণ না ওর টেকো মাথায় বেশ কড়া রকমের দু'চারটে চাঁটি পড়ছে, ততক্ষণ ওর যেন নেশাই হতো না। বেশী নেশা করিয়ে দেবার জন্যে মনোহর কাউন্টারের ভেতর-ড্রয়ারে একটা পাতলা কাঠের পাখার মত রাখত যেটা দিয়ে ও রতনলালের মাথায় দু'চারবার মারতই পটকা ফাটার মত একটা আওয়াজ হতো আর রতনলাল তার গোল গোল চোখ দুটো ঘুরিয়ে দেখে খুশী হয়ে বলতো, "ইয়ার মনোহর, আর একবার পটাস করে মার, নেশাটা দ্বিগুণ হয়ে যাক।'

কিন্তু আজ আমার হাতের চাঁটি খেয়ে রতনলাল একটুও খুশী হলো না। উল্টে বিরক্ত হয়ে আমার দিকে এমনভাবে দেখতে লাগল যেন আমি তাকে বেইজ্জত করবার জন্যে তার মাথায় চাঁটি মেরেছি

আমি খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েই জৌহরীর দিকে ফিরলাম। জৌহরী ফ্রেশম্যান হোটেলে বিদেশীদের কাছে ভারতীয় অলঙ্কার সব আটগুণ বেশী দামে বিক্রি করত। মীরাটে তার এক রক্ষিতা ছিল; দ্বিতীয় আর একজন ছিল জি. বি. রোডে। আর ঘরে তো স্ত্রী ছিলই। কিন্তু তার চোখ-মুখের ভাব ভঙ্গিমায় এমন একটা লাজুক আর কৌমার্যের আবরণ ছিল যেন আজ পর্যন্ত সে কোন রমণীর মুখদর্শনও করেনি।

'জৌহুরী, আজ বারে কি হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

জৌহুরী চমকে উঠে চুপচাপ একবার চেয়ে দেখল আমার দিকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিজে গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

এবার আমি চৈতরামের কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকালাম। দেশের বিদেশী টাকা সঞ্চয়ের সুবিধার্থে সে জাল ডলারের নোট ছাপানার কারবার করত। "আরে, মুখ দিয়ে কিছু বার করবি, না কি?"

চৈতরাম এক ঝটকায় তার কাঁধ থেকে আমার হাত সরিয়ে দিল। স্পষ্টতই রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, "মনোহরের হার্ট-অ্যাটক হয়েছে।"

আমার শরীরটা হঠাৎ শক্ত কাঠ হয়ে গেল। মনোহরের হার্ট-অ্যাটাক! সেই লোকের যে সবসময় হাসি-মস্করা করত। যার শরীরের ভেতর

থেকে অফুরন্ত প্রাণ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক জেনারেটরের মত বিচ্ছুরিত হ'তো। যার হার্ট ঘোড়ার হার্টের মত মজবুত, সেই লোকের কেমন করে হার্ট অ্যাটাক হ'লো? আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি এক চুমুকে মদের গ্লাসটা শেষ করে দিলাম।

মনোহর চারদিন অক্সিজেন নিয়ে হাসপাতালে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সামলে উঠতে লাগল। তিনমাস বাদে মোটামুটি বিছানা থেকে উঠে নিজের ঘরের মধ্যেই দুচার পা চলতে ফিরতে পারল। ছ'মাস পর আবার নিজের বারে এসে বসতে পারল। আবার সেই হাঙ্গামা, অ্যাপোলো হোটেলের বৈঠক, জি· বি· রোডের মহ্‌ফিল মজলিশ, তেমনই চনমনে রাত, খোশগল্পের স্রোত আর মাতামাতি। বার-এর সেই জৌলুস্ আবার ফিরে এল, এবার যেন আগের চেয়েও বেশী, রঙ্গ-তামাসা আর মহ্‌ফিল আরও বেড়ে গেল, মনোহরের গলার স্বর উচ্চ থেকে আরও উচ্চগ্রামে পৌঁছল। ও যেন আগের চেয়েও বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেতে উঠল।

একদিন ওর বড় ভাই গজেন্দর আমাকে ডেকে নিয়ে অন্য একটা ঘরে গিয়ে বলতে লাগল, "তুমি মনোহরের একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি ওকে বোঝাও যাতে ওই হৈ-হুল্লোড় করা ছেড়ে দেয়।"

"কি আর করে ও," আমি বললাম, "গানই তো কেবল শোনে।"

"না, তুমি জান না, ডাক্তাররা ভীষণ কড়াভাবে বলে দিয়েছে। ও যেন সিগারেট না খায়, মদ না খায়, রাত্রি দশটার পর জেগে না থাকে। কিন্তু ও আমার কোন কথাই শোনে না। উল্টে আগের চেয়ে বেশী হৈ হুল্লোরে মেতে উঠেছে। নিজের শরীরের ওপর সামান্য নজরটুকুও দিচ্ছে না।"

আমি বললাম, "আমার তো মনে হয় ওর শরীর আগের চেয়ে আরো ভালো হয়েছে; ওকে এমনই প্রাণবন্ত লাগে যে দেখে টেখে আমারই তো মনে হয় যদি আমারও এমন একটা হার্ট-অ্যাটাক হ'তো।"

গজেন্দর নিরুপায় ভঙ্গীতে আমার হাত দুটো ধরে গম্ভীর স্বরে বলল, "তুমি তো জান না যে আসল ব্যাপারটা কি।"

"কি ব্যাপার ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গজেন্দর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে চিন্তামগ্ন ভাবে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল আর যেন কতকটা আপশোষের ভঙ্গীতে নিজেরই হাত দুটো কচলাতে লাগল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, "একটা মেয়ের সঙ্গে ওর ভালোবাসা আছে।"

"কার ? মনোহরের ?" আমি অবিশ্বাসের স্বরে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ।"

হা—হা হা—করে সংযমহীনভাবে হেসে উঠলাম আমি।—"ভালোবাসা, আর তার সঙ্গে মনোহর ?" আমি আবার হাসতে লাগলাম।

ঠাট্টা ইয়ার্কির কথা নয়, এটা সত্যি, জেনে রাখো খাঁটি সত্যি। "গজেন্দর আমার কাছে এসে বলল, "একটা মেয়ের সঙ্গে ওর ভালোবাসা ছিল। যেদিন ওর হার্ট-অ্যাটাক হলো সেদিনই মেয়েটার বিয়ে হয়েছে।"

অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দুজনের মুখে কথা নেই। একে অপরকে যেন যাচাই করে নিতে চাইছি। আমি তো আশ্চর্য হয়ে কথাটার সত্যতা যাচাই করতে চাইছি, আর গজেন্দর বোধ হয় আসন্ন কোন দুর্ঘটনায় তার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার কথা আমি বুঝতে পারছি কিনা —তাই যাচাই করে নিতে চাইছে। একসময় খুবই বিষণ্ণ স্বরে সে বলে উঠল "ও নিজেই নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে। ওকে বোঝাও যেভাবে হোক। ও তোমার বন্ধু।"

একদিন আমি দিনের বেলা মনোহরকে ওর কেবিনেই ধরে ফেললাম।

"আমি কি জানতে পারি কে এই রজনী ?"

ও চোখ তুলে আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমাকে নিশ্চয়ই গজেন্দর বলেছে ?'

"হ্যাঁ।"

"দাদা দেখছি সেই ভ্রম নিয়েই আছে। আমি কোন মেয়ের ভালোবাসা প্রেম ক্রেমের চক্করে কখনও পড়িনি, আজ পর্যন্ত না।" ও একটু রাগের স্বরেই বলে উঠল।

"তাহলে সেই দিনই তোমার হার্ট-অ্যাটাক হলো কেন, যেদিন তুমি রজনীর বিয়ের খবরটা শুনলে?"

"আরে, এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার।" ও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। তারপর পেছন ফিরে কাঁচের আলমারি থেকে জিন-এর বোতল আর দুটো গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে বলল, "একটা করে জিন খাওয়া যাক।"

"না।" আমি খুব কড়া স্বরে বলে উঠলাম, "তোমার পক্ষে মদ বিষ। আজ থেকে তুমি আর মদ খাবে না।"

"আচ্ছা।" বেশ নরম স্বরেই বলল ও।

"আর সিগারেটও খাবে না।"

"আচ্ছা।" বেশ মিষ্টি স্বরেই ও বলল।

"আর রাত দশটা বাজলেই শুয়ে পড়বে।"

"আচ্ছা।"

"আর জি. বি. রোডে কখনও যাবে না।"

"আর তুই একথা বলছিস না কেন যে আমি সোজা হরিদ্বারে চলে যাই।"

আমার কাঁধে একটা থাপ্পড় কষালো ও। তারপর একটা গ্লাস আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "এক পেগ খা, আর ওইসব ভালোবাসা-ফালোবাসার ফালতু সব কথা থাক।"

দুপেগ খাওয়ার পর আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে, রজনী কি খুব ভালো দেখতে? খুব সুন্দরী?"

ও বলল, "যেমন আর দশটা মোটামুটি মাজাঘষা মেয়ে দেখা যায়, ঠিক তেমনই।"

"তাহলে তার মধ্যে কি এমন বিশেষত্ব দেখলি?"

"তার একটা জিনিষ আমার খুব পছন্দ।" ও বলল, "কখনও কখনও সে যখন একটা বিশেষ ভঙ্গীতে ঘাড় ঘুরিয়ে, কতকটা বিচলিতভাবে, দেখতে দেখতে চলতে থাকে, আঁচলটাও উড়তে থাকে, আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোন সুন্দরীতমা মেয়েও তেমন ভাবে দেখতে দেখতে চলে না, চলতে পারে না। তার সেই ছবিটার নক্সা আমার বুকের মধ্যে চিরদিনের জন্যে আঁকা হয়ে গেছে।' বলে ও নিজের বুকের ওপর হাত রাখল।

'ব্যাস! এই জন্যে সেই মেয়েটার প্রেমে পাগল।"

চুপ করে গেল ও। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলা করতে লাগল। একদিকে তাকিয়ে যেন ও সেই মেয়েটার আঁচল উড়িয়ে কটাক্ষ করে চলে যাবার দৃশ্যটাই মুগ্ধ মনের চোখে দেখতে লাগল।

"রজনীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শোনা?"

"সেই ছেলেবেলা থেকে"

"তাহলে ওকে বিয়েটা করে ফেললি না কেন?"

"করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার বাবা-মা মানল না। আমরা তো অরোরা আর ওরা ক্ষত্রিয়। তাই আমাদের বিয়ে হ'তে পারল না।

"আরে উঠিয়ে নিয়ে তাসতিস! আমি রেগে বলে উঠলাম, "তুই তো কত বন্ধুর জন্যে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিস্! আর নিজের জন্যে পারলি না?"

"যে মেয়েকে বিয়ে করতে চায় কেউ, তাকে কোন পুরুষই জোর করে তুলে নিয়ে আসতে পারে না।" ও ধীরে, শান্ত স্বরে বলল। আর আমার মনে হলো বাতাসে যেন আমি কারো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার ক্ষীণ শব্দ শুনলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই মেয়েটার সঙ্গে কখনও কথাবার্তা হয়েছে?'

"সুযোগই পাইনি কখনও।"

"সুযোগই পাইনি কখনও!" আমি ওর কথাগুলোই অবাক স্বরে বলে উঠলাম।

ও বেশ বিরক্তি ভরেই বলে উঠল, "সুযোগ তো অনেক এসেছিল, কিন্তু কিছু বলা আর আমার দ্বারা হ'য়ে ওঠেনি। বিয়ে হবার কদিন আগে সে আমার এই বারে এসেছিল।"

"এই বারে? এখানে?"

"হ্যাঁ, আমি কাউণ্টারে বসে দিনভর বিক্রির টাকা পয়সা সব গুণছিলাম। কাউণ্টারের ওপর পড়েছিল নোট, সিকি, আধুলি আর রোজগীর একটা পাহাড় ঠিক সেই সময় সহসা দেখলাম সে এসে একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে আমার। তার পরনে ছিল কেশরী রঙের চুস্ত, কামিজ আর গোলাপী সালোয়ার—সে আমাকে বলছিল, "আমার দশটাকার খুচরো দরকার।" তখন আমার আশেপাশে কেউ ছিল না।"

"তা তুমি তখন কি করলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।"

"গাধা!"

"সে আবার বলল, "আমার দশটাকার চেঞ্জ দরকার।"

"আমি তার দিকে দেখতে লাগলাম; আমার জিভটা যেন তালুর সঙ্গে আটকে গেছে, পা দুটো কাঁপতে আরম্ভ করেছে; আর আমি কিছুই বলতে পারছি না, কিছুই বলতে পারলাম না আমি। কাঁপা কাঁপা হাতে—দুহাতেই, সিকি, আধুলি আর টাকা তুলে নিয়ে ওর সামনে মুঠো খুলে ধরলাম। সে চুপচাপ আমার হাত থেকে দশ টাকার চেঞ্জ তুলে নিল; বার বার তার আঙ্গুলগুলো আমার হাত ছুঁয়ে যাচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিল যে তার আঙ্গুল দিয়ে বার বার আমার হৃৎপিণ্ডে টোকা দিয়ে যাচ্ছিল।"

"তারপর।" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তারপর সে তার নিজের হাতে ধরা চেঞ্জগুলো আস্তে আস্তে গুণতে লাগল। আর আমি এক বোবা ভিখারীর মত তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন এটা একটা মস্ত বড় ঘটনা আমার জীবনে। আমার হাতে যা উঠেছিল আমি তাকে দিয়ে দিলাম, তার থেকে যতটা নেবার সে

নিয়ে নিল, তখন আর কারোকে কারুর কিছু বলার নেই, যেন এইটুকুই শুধু তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ; সেজন্যেই চুপচাপ সে খুচরোগুলো গুণে নিল, তারপর তার বটুয়ায় সেগুলো ভরে আঁচলটা ঘুরিয়ে তুলে নিয়ে একটু বা বিচলিত ভঙ্গীতে চারপাশে তাকিয়ে একবার দেখল, বুঝি বা দেয়ালগুলোর কাছেই কোন প্রশ্ন করতে চাইছে ; কিন্তু, যখন চারপাশে নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই পেল না তখনই সে চলে গেল ”

আমি অনেকক্ষণ ধরে আমার হাতের ঠাণ্ডা গেলাসটা আঙুল দিয়ে ঘোরাতে লাগলাম চুপচাপ। বুঝতে পারছিলাম না যে ওকে কি বলব।

'তুমিও এবার একটা বিয়ে করে ফেলো।' আমি ওকে পরামর্শ দিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার এই পরামর্শ নিজের কাছেই বাজে, ফালতু বলে মনে হলো। মনে হলো যেন আমিও ওকে বলছি, 'আর পাঁচজনের মত তুমিও বিয়ে করে ফেলো—অর্থাৎ, তুমিও সংসারের খুচরো গুণতে থাকো, নতুন জুতো কিনে ফেলো, কি শ্মশানঘাটে চলে যাও।' ভাবতেও আমার নিজেরই কেমন লজ্জা হলো। তাই চুপচাপ আমি সেখান থেকে উঠে চলে এলাম।

চারবছর পর আবার হার্ট-অ্যাটাক হলো মনোহরের। সে সময় আমি য়ুরোপে ছিলাম। এবারের অ্যাটাক আরও বিপজ্জনক। কিন্তু মনোহরের জানও ছিল বেশ কড়া। সহজে কাহিল হবার মত নয়। এবারও সামলে উঠল ও। এগারো মাস পরে য়ুরোপ সফর শেষে যখন ফিরলাম মনোহরকে বার-এর সেই কাউণ্টারের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। প্রথম দেখে তো মনে হলো ও আগের মতই আছে, তেমনি তরতাজা, প্রাণবন্ত। কিন্তু খুব কাছে যেতে বুঝতে পারলাম ওর চেহারার দেই ঝকঝকে, উজ্জ্বলভাবটা একেবারেই নেই। আর ও যখন চলাফেরা করছে তখন ডান পা'টা যেন অতিকষ্টে টেনে নিতে হচ্ছে, এমনই মনে হলো আমার। মনে হলো গাছটা তেমনিই বিশাল আছে বটে, কিন্তু যেন বজ্রপাত হয়ে গেছে তার ওপর।

ওর এই অবস্থা দেখে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল আমার। কিন্তু

তখন আর কিছু বললাম না। রাতে যখন আমরা একান্তে বসলাম, তখন জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"এবারের তিনি কে, এই দ্বিতীয় অ্যাটাকের যিনি কারণ?"

আমি প্রশ্নটা সোজাসুজিই করেছিলাম। ও একেবারে চমকে উঠল। তারপর আমাকে নির্বিকার, গম্ভীর দেখে ও নিজেও তত আর ঘাবড়ালো না বরং আমারই মত নির্বিকার ভঙ্গী করে চুপচাপ বসে রইল। তারপর ও যখন কি ভেবে মাথাটা একটু পাশের দিকে ঘোরালো, দেখলাম ওর কানের পাশের দু চারটে চুল পেকে গেছে।

"একজন পতিতা রমণী, জি, বি, রোডে থাকত।" বলে ও মুচকে হাসতে লাগল।

"পতিতা?" আমি আশ্চর্য হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পতিতা," ও আমারই মত চেঁচিয়েই বলে উঠল, "না তো কি প্রেম কুষ্ঠি-ঠিকুজী মেনে হয়? না কি কোহাবা চরিত্র বিচার করে হয়?"

"না, না, তা নয়। কিন্তু..." আমি একটু নরম স্বরেই বললাম।

"কিন্তু কি?" ও ঝাঁঝালো স্বরেই বলে উঠল।

"কিছু না, তুমি বল না পুরো ব্যাপারটা। শুনি।"

"ব্যাপার ট্যাপার তো এর মধ্যে কিছু নেই।" ও বলল।

"আরে!...তুমি কি এবারেও বোবা হয়ে ছিলে না কি?"

"না, আমি তো বলেছি, বার বারই বলেছি, কিন্তু সে কিছুতেই মানে নি।"

"ওই পতিতা রমণী—সেও রাজী হয়নি?" আমার স্বর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

"তুমি বার বার পতিতা রমণী কাকে বলছো?" ও ভীষণ রেগে গিয়ে সপাটে—আমাকে আঘাত করেই যেন চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "অলরাইট" এই যে আমি ব্ল্যাকে মদ বিক্রি করছি, এটা বেশ্যাগিরি নয়? তুমি যে ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট-এর ব্যবসা করতে গিয়ে বিলগুলোতে কম করে দেখাও (আণ্ডার ইন্‌ভয়েস)-সেটাকে কি হারমী পনা বলে না? ওই হোটেলওলারা যারা সরকারের কাছ থেকে পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা

নিয়ে পঁয়তিশ লাখ টাকায় হোটেল বানায়, সেটাকেও বেশ্যাবৃত্তির পর্যায়ে ফেলা যায় না? আরসেই নেতাগণ যারা ইলেকশনের আগে লম্বা চওড়া কথায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর সব ভুলে যায়, তারা বেশ্যাদের চেয়ে কোন অংশে উৎকৃষ্ট, বলুন তো মশাই! এখানে এমন কে আছে যার আত্মার মধ্যে একটি বেশ্যা বসে নেই?"

"আরে-রে-রে, তুমি তো দেখছি ভীষণ রেগে গেছো! মাপ করো, ভাই, মুখ দিয়ে হঠাৎই বেরিয়ে গেলো, তাই।"

আমি অন্য সব বিষয়ে কথাবার্তা বলে ওর রাগটা কমিয়ে দিলাম। ওর রাগ কমলে, একটু সুস্থিত হবার পর, আমি আবার ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু সে রাজী হলো না কেন?"

"খুবই বোকা মেয়ে, বার বার একই কথা বলতো—আমি তোমার যোগ্য নই, আমি অপবিত্র, কিছুতেই তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি না।"

"তা তুমি কি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে" আবার রাগটা ফুঁসে উঠল আমার ভেতর থেকে। ওই যে একটা কথা আছে না যে লম্বা লোকগুলো ভীষণ আহাম্মক হয়, মনে হচ্ছে কথাটা খুবই সত্যি—এই মুহূর্তে অন্তুতঃ তাই ভাবলাম আমি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। আমি, মনোহরদাস ওরফে শ্যামদাস, সাকিন কাশ্মীরি গেট, দিল্লী, তাকে বিয়ে করতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু সে রাজী হয় নি। আমি ক্রমাগত তাকে অনুরোধ উপরোধ করতে সে একদিন জি, বি, রোড ছেড়ে লক্ষ্মৌ চলে গেল। যখন আমি লক্ষ্মৌ পর্যন্ত তার পেছনে ধাওয়া করলাম তো সে লক্ষ্মৌ ছেড়ে নিজের জন্মভূমি ফিরোজাবাদে চলে গেল। আমি ফিরোজাবাদ গিয়ে সাতদিন তার সঙ্গে থাকলাম। এই সাত দিন ধরেই ওকে খোসামোদ করে গেলাম। কিন্তু তবুও সে রাজী হলো না।"

"কিন্তু রাজী হলো না কেন।"

"কেবলই বলতো—আমি তোমাকে কিছুতেই বিয়ে করব না, কেননা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

"হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে। তার নিজের ধারণায়—এই ভালোবাসা পবিত্র—তাতে কোন কলুষ স্পর্শ লাগা উচিত নয়। তবুও আমি তাকে বোঝাতে লাগলাম। শেষে সে মানলো, বলল—আচ্ছা, আমি আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন আমার কাছে যা আছে, তাতে দুটো জীবনের পক্ষেও অনেক বেশী সময় চলে যাবে যদি কিছু না করে বসে বসেই খেয়ে যাই। সে জন্যেই আমি ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন থেকে ছ'মাস আমি এই ফিরোজাবাদে বসেই তোমার অপেক্ষায় থাকবো। ছ'মাস বাদে তুমি আমার কাছে আসবে, বিয়ের জন্য তৈরী হয়েই আসবে; তখন আমি তোমার সঙ্গে বিয়েতে বসবো। কিন্তু শর্ত এই যে এই ছ'মাসের মধ্যে তুমি আমার মুখ-দর্শন করতে পারবে না। আমি রাজী হয়ে গেলাম। ছ'মাসের মধ্যে ফিরোজাবাদ গেলামনা। ছ'মাস বাদে গিয়ে তাকে আর সেখানে পেলাম না।"

"পেলে না?"

"না। শুনলাম, আমি ফিরোজাবাদ থেকে চলে যাবার পর দুমাস বাদেই সে চলে গেছলো। এখন সে মীরাটে গিয়ে ফের ব্যবসা সুরু করেছে। তো আমিও মীরাটে গেলাম। আমাকে দেখেই সে গান-বাজনা বন্ধ করে দিল। আর আমার পায়ে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম—যমুনা, এটা তুমি কি করলে? তো সে বলল—আর কি করব? মিথ্যে বলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমি তোমার জীবনটাকে নোংরা করে দিতে পারতাম না, সেজন্যেই এখানে চলে এসেছি। এখন তো আমার পেটে অন্য আর একজনের সন্তান। আমি এখন নিজেকে এমন নোংরা, অপবিত্র করে ফেলেছি যাতে তুমি কোন মতেই আমাকে আর বিয়ের কথা না বলতে পারো।"

"মনোহর, তোমার মত এতবড় আহাম্মক আমি আর একটাও দেখিনি পৃথিবীতে। তোমার কি নেই? ধন-দৌলত, ইজ্জত-সম্মান, রূপ-গুণ সব তোমার পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তুমি অনায়াসে কোন

ভদ্রঘরের মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হতে পারো!"

উত্তরে মনোহর কিছুই বলল না। কাঁচের আলমারী থেকে হুইস্কীর বোতল আর ছুটো গ্লাস বার করল।

"আমি তোমাকে মদ খেতে দেব না।" ওর হাত থেকে গ্লাস কেড়ে নিলাম আমি।

ও একটা সিগারেট ধরালো।

আমি সিগারেটটাও কেড়ে নিয়ে বললাম, "এটাও তোমার পক্ষে বিষ!"

"কে আর বাঁচতে চায়?" ও বাধো বাধো স্বরে বলে উঠল।

"পাগল হয়ে গেলে?" আমি ওর হাত ধরে বললাম, "তুমি জোয়ান পুরুষ, সুন্দর চেহারা তোমার—তুমি রীতিমত ধনীলোক। কোন বিষয়ে কার চেয়ে তুমি কম? আজও এই শহরে এমন শত শত মেয়ে পাওয়া যাবে যারা তোমাকে ভালোবাসতে পারলে গর্ব অনুভব করবে।"

"অন্য কারো ভালোবাসার প্রশ্ন নয়, বন্ধু; নিজের ভালোবাসাটাই আমার কাছে বড়। যেভাবে মানুষ ভালোবেসে নিজের রুজি রোজগার করে, তেমনি করেই নিজের পরিশ্রমের দৌলতেই সে ভালোবাসা। আমি অন্য কারো ভালোবাসার ভিখারী নই, কেবল নিজের ভালোবাসার জন্যই উপোসী হয়ে যাছি। মানুষ যেমন এক টুকরো রুটি বা একমুঠো অন্ন ছাড়া জীবন ধারণই করতে পারে না, তেমনি একটুখানি প্রেম-ভালোবাসা না পেলেও সে বাঁচে না; আর সমস্তটা সবচেয়ে বড় কি জানো, মানুষ এই পৃথিবীতে ধান বা গমের ফসল তো বার বার তুলে নিতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার ফসল বার বার বুনতে পারা যায় না।"

ও মাথা নীচু করে টেবিলের ওপর রাখা খুচরো পয়সার স্তূপের আড়ালে যেন মুখটা লুকিয়ে ফেলতে চাইল। তারপর ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ক্রমে রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যেন পক্ষবিস্তার করে ওর কাঁধের ওপর নেমে এল। আশেপাশের অস্বচ্ছ ধোঁয়াটে সেই পরিমণ্ডল তখন শিশুর মত সরল পবিত্র হৃদয় পরীরাও সব আঁচল উড়িয়ে নেমে এসে বেদনার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

## কুদসিয়া পার্কের আহ্‌মেদ

রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম—মস্ত বড় এক মূর্তি⋯চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কারণ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জ্যোতির্বলয় ফুটে বেরুচ্ছিল⋯ওই মূর্তি আমার দিকেই এগিয়ে আসছে, আরও কাছে এগিয়ে এল, এবং যখন একেবারে আমার শরীরের কাছেই এসে দাঁড়ালো তো তার জ্যোতির কিরণে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল⋯আমার চোখ দুটো আপনা হ'তেই বন্ধ হয়ে গেল⋯তারপর আমার মনে হলো যেন ওই মূর্তি হাত বাড়িয়ে আমার মাথায় স্পর্শ করল এবং অতি মিষ্ট স্বরে বলল :

"যা বেটা⋯আমি তোর প্রার্থনা শুনেছি⋯এখন এই পৃথিবীর প্রয়োজন তোর উপদেশ আর বাণী, নয়তো এই পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে যাবে। সেজন্যেই যা বেটা, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড় আর ভগবানের প্রকৃতভক্ত এমন পাঁচজনকে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে তোর নিজের জ্ঞান-রহস্যের দরজা খুলে দে আর তাদেরই সহায়তায় এই জগত-সংসারকে পাল্টিয়ে দে!"

তারপর চোখ মেলতেই দেখলাম আমি আমার সেই ত্রিসহাজারি বস্তির অন্ধকারময় এক ঝুপড়িতে নিজের ঝরঝরে দড়ির খাটিয়াতেই শুয়ে আছি। তাকের ওপর মিয়োনো প্রদীপ থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বেশী। দেখলাম এক কোণে আরেকটা খাটিয়ায় আমার সত্তর পেরুনো বুড়িমা শুয়ে আছে যেন একটা মমির মত। আমার সারা শরীর কি এক অজানা ভয়ে কাঁপছিল। আমি আবার ঝরঝরে খাটিয়ায় উঠে বসলাম। বসেই উঠে দাঁড়ালাম, আর পাশে রাখা কুঁজোটার ঢাকনী খুলে মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে জল খেলাম। সকাল হলেই আমাকে পরমেশ্বরের পাঁচ ভক্তের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে? দিল্লী এতবড় শহর—এখানে পরমেশ্বরের পাঁচজন সদাচারী ভক্তকে কেবলমাত্র

পাঁচজন সদাচারী ভক্তকে খুঁজে বের করা অতটা কঠিন হবে না। কিন্তু ওদের কাছে আমার বক্তব্য কি হবে? সেটা আমাকে আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে—কেন না বাছ বিচারের সময় পার হয়ে গেছে, এখন সেরেফ কাজ করার সময়। আমি দিল্লীর একটা ছোট্ট প্রেসে সাধারণ প্রুফ-রীডারের কাজ করি। দিনভর সংসারের তাবড় তাবড় জ্ঞানীগুণীদের লেখার প্রুফ দেখি, ঠিক করি; কিন্তু এখন সেই সময় যখন এইসব বড়বড় জ্ঞানীদের পুস্তকগুলোকে তাকের ওপর তুলে রেখে এই জগত-সংসারের খোলা পুস্তক সংশোধনের কাজে হাত দিতে হবে। ভগবান আমাকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন—এ আমার পরম সৌভাগ্য!

রাতের শেষ প্রহরে বসে বসে আমি কি বাণী বিতরণ করব তার একটা খসড়া প্রস্তুত করতে লাগলাম। পাঁচ-ছ পাতা কালিতে কালিময় হয়ে গেল, এর মধ্যেই সকালের আলো ফুটলো। মা উঠে পড়ল। কাল রাতের বেঁচে যাওয়া দুটো বাসি রুটি আর বাসি ডাল আমার সামনে ধরে দিল। আমি একটা রুটি ডালের সঙ্গে খেয়ে নিলাম। বাকীটা কাগজে মুড়ে নিলাম। তারপর ঝুপড়ির চাল থেকে একটা সরু বাঁশের ডাণ্ডা মতন টেনে বের করে চাকু দিয়ে একদিকের মাথাটা চিরতে লাগলাম।

"আরে, এটা কি করছিস?" মা জানতে চাইল।

'আমি এই পৃথিবীকে পাল্টে দিতে যাচ্ছি।' মাকে বললাম।

"আগে নিজের পরনের কাপড়টা তো পাল্টে নে।" মা আমার ময়লা, কোঁচকানো জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর কাছে এসে খুব স্নেহভরে আমার মাথায় হাত রেখেই চমকে উঠল! "আরে, তোর মাথা তো দেখছি আগুনের মত গরম।" মার গলার স্বরে ভয়!

"আগুন নয় মা, এ হোলো ভগবানের জ্যোতির তাপ", আমি দুহাত ছড়িয়ে বিস্তৃত করে স্বপ্নের কথা শুনিয়ে দিলাম মাকে।

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে মা তো আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়ালো। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আমি তোকে কিছুতেই যেতে দেব না। পাগল হয়ে গেলি

না কি! যা, হাত মুখ ধো, পোষাক পাল্টে নে, প্রেসে যা। আগড়ম-বাগড়ম বকিস না।"

আমি বাঁশের ডাণ্ডাটা তুলে নিলাম। মা ঘাবড়ে গিয়ে দূরে সরে গেল। আমি ঝুপড়ির ভাঙ্গা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সবচেয়ে প্রথমে আমি পার্লামেণ্ট হাউসে গেলাম, যেখানে, শুনেছি যে ভগবানের সব সদাচারী ভক্তরা থাকে। কিন্তু ওখানে কেউ আমার কথা শুনল না। কারোরই সময় নেই। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, চীফ সেক্রেটারী, সেক্রেটারী, রাজ্যসভার সদস্য, লোকসভার সদস্য-সবাই নিজের নিজের কাজ, আর কাজের চেয়েও বেশী গুপ্ত-মন্ত্রণায় ব্যস্ত হয়ে আছে দেখলাম। কেউই আমার কথা শোনা তো দূরের কথা, আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখলও না। মাইল মাইল লম্বা ফুটপাতের ওপর দিয়ে চলতে চলতে যখন আমি বেদম হয়ে পড়েছি, ক্ষিদে আর তেষ্টায় প্রায় শুয়ে পড়ার অবস্থা, তখন একটু বিশ্রাম আর আরামের জন্যে একটা খালি কামরায় ঢুকে পড়লাম। কোন বড়মানুষের অফিস-কামরা বলেই মনে হলো সেটা। ভেতরে মোটা গদীর মত কার্পেট বিছোনো তার ওপরে ফোম্-রবারের গদীওলা আরাম-কেদারাও কয়েকটা রয়েছে। পাখা চলছে মাথার ওপর। আমি চপ্পল খুলে এক কোণে রাখলাম, বাঁশের ডাণ্ডাটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে একটা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সুখে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। এই সময় দরজার বাইরে পায়ের শব্দ তারপর কথা বার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। কেউ কাউকে বলছিল, "পাটনা থেকে আপনার কাকার চিঠি নিয়ে এসেছি। উনি বলে দিলেন—তুই সোজা দিল্লীতে আমার ভাইপোর কাছে চলে যা। ও তো পরমেশ্বরের সদাচারী ভক্ত। আজ পর্যন্ত আমি ওকে বলেছি আর ও আমার কথা রাখেনি—এমনটা তো কখনও ঘটেনি। ব্যস! তক্ষুনি চিঠি নিয়ে হাওয়াই জাহাজে বসে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি। এখন আমার ভাগ্য আর ইজ্জত—দুইই আপনার হাতে।"

উত্তরে মিষ্টিমোটা গলার স্বর ভেসে এল, "আরে, আমার আর ক্ষমতা কতটুকু বলুন! যে কাজই করি, লোকের ভালর জন্যই করি! ব্যস! এই আমার জীবনের ধ্যেয়—লক্ষ্য। আপনি কালকে আসুন···আমি সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখব, আপনার কাজ হয়ে যাবে।"

জবাবে আবার প্রথম ব্যক্তির তোষামুদি কথার স্বর ভেসে এলো। ধন্যবাদ টন্যবাদ ইত্যাদি বলে লোকটা চলে গেল। পরক্ষণেই ভগবানের সদাচারী ভক্তকে কামরার ভেতর ঢুকতে দেখেই আনন্দে আমার বুক নেচে নেচে উঠল। সাদা খদ্দরের সাজ-পোষাক, মাথায় গান্ধীটুপী, সমস্ত শরীরে সদাচারের শোভা—ঢুকেই নিজের চেয়ারে বসে কোন মন্ত্রীকে টেলিফোন করতে লাগল। আর লাইন যখন পাবে ঠিক তখনই আমার ওপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল। দেখেই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! তারপরই চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।—

"তুমি কে হে?"

আমিও উঠে তার পাশে দাঁড়িয়ে গদগদ স্বরে বললাম, "আপনার জন্যে একটা বিরাট সংবাদ বহন করে এনেছি।"

"কার সংবাদ?"

"ভগবানের।"

নাম শুনেই তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য দ্বিগুণ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে তার জ্যোতি ঠিকরে বেরুতে লাগল, মুখমণ্ডল বড় মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল। খুব আদর করে আমাকে আবার আরামকেদারায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আমি; তুমি ভগবান সিং, কেমিষ্টের সংবাদ নিয়ে এসেছো: ওই যার কোটা আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম!"

"আজ্ঞে না", আমি শক্ত করে বাঁশের ডাণ্ডাটাকে ধরে বললাম, "ভগবান সিং, কেমিষ্টের তরফ থেকে আসি নি, আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি যিনি আমাদের সকলেরই ভগবান।"

আমার এই কথা শুনেই তার মুখের মিষ্টি হাসি, চোখের জ্যোতি, দুগালের লালিমা সব একদম উবে গেল। ঠোঁটের কোণ দুটো ফড়ফড়

করে কাঁপতে লাগলো। সে তিন চার বার জোরে জোরে হাত দিয়ে ঘণ্টাটা বাজাল। ঘন্টির আওয়াজ শুনেই দু-দুজন চাপরাশি দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। সেই ভালোমানুষ তখন আমার দিকে ইশারায় দেখিয়ে বেশ কড়া গলায় বলল, "এটাকে বাইরে বার করে দে!"

একজন চাপরাশি আবার ডান বগলের নিচ দিয়ে ধরল অন্যজন বাঁ বগলের নিচে দিয়ে হাত গলিয়ে ধরল। তারপর এই অধম দাস বাইরের ফুটপাতে গিয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে রইল।···

···দিনভর কনটপ্লেসে ঘুরতে লাগলাম। শত শত দোকান, হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন। দিনভর কেবল মানুষের মুখ দেখতে লাগলাম। কোথাও সেই জ্যোতি দৃষ্টিতে পড়ল না যাকে ভগবানের জ্যোতির প্রতিবিম্ব বলতে পারি। সবাই নিজ নিজ স্বার্থের দাস, নিজেদেরই তুচ্ছাতিতুচ্ছ আকাঙ্ক্ষার রশিতে বাঁধা পুতুলের মত সব ঘোরাফেরা করছে, দোকানে ঢুকছে, দোকান থেকে বার হচ্ছে। বাণ্ডিল হচ্ছে, বাণ্ডিল দিচ্ছে। বটুয়া খোলা হচ্ছে, বাক্সে রাখা হচ্ছে। নানান রঙের সুতোয় বাঁধা তুলতুলে নাচুনী পুতুল সব।

বেলা তৃতীয় প্রহরের কাছাকাছি সময় জনপথ এলাকার এক দোকানদারের ওপর নজর পড়ল। সে শাড়ী কিনতে আসা একজন স্ত্রীলোককে বলছিল, 'বিশ্বাস না হয় তো বাজারে দর যাচাই করে দেখুন! এটা বাটিক-প্রিন্টের শাড়ী। এই কোয়ালিটির শাড়ী কোথাও আপনি পঞ্চান্ন টাকার কমে পাবেন না। আমি যে আপনাকে পঁয়তাল্লিস টাকায় দিচ্ছি সে কেবল আপনাকে স্থায়ী খদ্দের করে নেবার জন্যে; দশটাকার লোকসান খাচ্ছি আপনাকে খুশী করার জন্যেই। দেখুন! দু পয়সা কম দাম নিয়েও খদ্দেরদের খুশী করাই আমার ধর্ম!"

এই সং দোকানদার দশটাকা লোকসান খেয়ে শাড়ীটা সেই স্ত্রীলোক খদ্দেরকে দিয়ে দিল।

তারপর আমি দেখলাম আধঘণ্টার মধ্যে সে এই ভাবে পাঁচ অথবা সাত টাকার লোকসান খেয়ে একটা জামা আর সালোয়ারের দুটো পীস্

অন্য দুজন খদ্দেরকে বেচে দিল। দোকানদারটি যুবকই বলা যায়। কপালে তিলক, পরনে সাদা ধবধবে ধূতী, গলা থেকে গীতার লকেট ঝুলছে আর হাতের আংটিতে "ওম্" মিলে করা। আমি ভাবলাম, আর কোন খদ্দের এসে ভগবানের এই একান্ত সং সেবকটিকে লোকসানের পাল্লায় ফেলার আগেই ভগবানের আসল সংবাদটা একে জ্ঞাপন করে আসি। শুধু এটুকু ভেবেই আমি সোজা দোকানের ভেতর চলে গেলাম। আমাকে দেখেই সেই দোকানদার মুখের জেগে ওঠা হাসিটাকে মাঝ রাস্তায় ব্রেক কষে থামিয়ে দিল···আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল, তারপর বলল, 'শার্টের কাপড় ?'

"না।"

"পায়জামার ?"

"না।"

"রেডিমেড—খাকি প্যাণ্ট ?"

'আরে না' আমি তার পাশে গিয়ে বললাম, "আপনার জন্যে একটা সংবাদ এনেছি!'

"ওহো," যেন এটুকু শুনেই সে আমার সবকথা বুঝে গেছে। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—যেন তার সমস্ত শরীরে ভগবানের জ্যোতি প্রবেশ করেছে। আমাকে তারপাশে বসিয়ে বলল, "বুঝেছি, লালা কোডেশাহ্র কাছ থেকে আপনি এসেছেন, কনের সংবাদ নিয়ে ?"

'না' আমি তাকে বললাম, 'আমি তো ভগবানের সংবাদ নিয়ে এসেছি।"

—"তাহলে তো···"

সেও আমার সঙ্গে একই ব্যবহার করল—এর আগের চাপরাশি দুটো যা করেছিল।

সমস্ত জায়গায় ঘুরলাম—নয়াদিল্লী, পুরোনো দিল্লী, চাঁদনি চক্, জুম্মা মস্জিদ, কুতুব সাহেবের লাট, করোল বাগের বাজার, বিড়লা মন্দির—কোথাও তেমন একটা মুখ দেখলাম না যা আমার মনে দাগ কাটে। হয়রান হয়ে ক্লান্ত, পরাজিত শরীরটাকে নিয়ে ঘরে ফিরলাম

আর ডাল-রুটি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ফের সকালে উঠেই জল খাবারের একটা বাসি রুটি খেয়ে দ্বিতীয়টা কাগজে মুড়ে নিয়ে সন্ধানে বের হলাম। মা কেমন উদাস চোখে আমাকে দেখতে লাগল, বোধ হয় আমার ভাবসাব দেখে কিছু বলতে সাহস পেল না।

আজ খুব ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছি। হাতে বাঁশের ডাণ্ডা আর বগলে বাসিরুটির পোঁটলা গুঁজে নিয়ে নতুন কাছারির ভেতর দিয়ে মাথা নীচু করে চলে গেলাম! যেতে যেতে কাশ্মীরি গেটের বাইরে সবুজ ত্রিকোণ জায়গাটা, যাকে লোকেরা কুদসিয়া পার্ক বলে, গেট খোলা দেখে তার ভেতরে চলে গেলাম।

ভেতরে ঢুকতেই এক বৃদ্ধ লোকের দেখা পেলাম। মখমলের ফতুয়া আর ধুতী পরা, মাথা ঝুঁকিয়ে, হাতে ছোট একটা আটার পুঁটলি নিয়ে রাস্তা ছেড়ে ময়লা, রাবিশগুলোর আশেপাশে খানিক খানিক ঘাস গজিয়েছে যে সব জায়গায়, সেখানেই ভাল করে দেখে পিঁপড়ের সারির সন্ধান পেলেই পুঁটলি থেকে একটু নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। দেখা মাত্রই চিনতে পারলাম আমি—একেবারে ভগবানের খাঁটি দাসানুদাস। পিঁপড়েদের আটা খাওয়াচ্ছে। আমি গিয়ে পেছন থেকে তার ফতুয়ায় টান দিলাম, "ভগবানের দর্শন চাও?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

সে বলল, "এই দুনিয়ায় এমন কে আছে যে ভগবানের দর্শন চায় না?"

"তাহলে সোজা আমার পিছু পিছু চলে এস!"

"কোথায়?"

আমি কুদসিয়া পার্কে ইম্পিরিয়াল-পাম গাছ দিয়ে ঘেরা উঁচু বেদীটার দিকে ইশারা করে বললাম, "ওইখানে এসো, আমি তোমাকে ভগবানের সংবাদ দেবো।"

সে বলল, "পিঁপড়েদের আটা খাইয়ে এক্ষুণি আসছি।"

আমি প্রসন্নচিত্তে সামনে এগিয়ে গেলাম। যা হোক, ভগবানের একজন অন্ততঃ সৎ ভক্ত তো পাওয়া গেল। একটা বাড়ির নীচে দেখলাম একজন আধা বয়স্ক লোক হুম্-হাম্ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে-নিঃশ্বাস

ছাড়ছে, আবার হঠাৎ দম বন্ধ করে চুপচাপ বসে পড়ছে, বোধ হয় প্রাণায়াম করছিল। কয়েক মিনিট। তার প্রাণায়াম পর্ব শেষ হ'তে আমি তাকে বললাম, "এরকম কেন করছো?"

সে বলল, "যখন শ্বাস ওপর দিকে মাথায় চলে যায় তখন তাঁর দর্শন হয়।"

আমি বললাম, "প্রাণায়াম ছাড়াই যদি তাঁর দর্শন চাও তো আমার পেছু পেছু চলে এস!"

"কোথায়?" সে জিজ্ঞেস করল।

আমি কুদসিয়া পার্কের মধ্যিখানের দিকে ইশারা করে দেখালাম।

সে বলল, "প্রাণায়ামের দ্বিতীয় পর্যায়টা শেষ করি, তারপর আসছি।"

"তাতে কি হবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে বলল, "তাতে ফুস্‌ফুস মজবুত হয়, পার্কের বিশুদ্ধ বাতাস শরীরের ভেতরে যায়।"

আমি বললাম, "দিনের সাড়ে তেইশ ঘণ্টা শহরের দূষিত হাওয়া খাওয়ার পর সেরেফ দশ-পনের মিনিট পরিস্কার হাওয়া খেয়ে ফুসফুস কি করে মজবুত হয়? পারো তো গোটা শহরের সব হাওয়া আগে সাফ করো!"

"যাক গে। তুমি এগোও! আমি আসছি।" সে প্রাণায়ামের দ্বিতীয় পর্যায়ে মন দিল।

এগিয়ে যেতেই একজন যুবক নজরে পড়ল। হাতে একটা চাকু নিয়ে ইম্পিরিয়াল পাম গাছগুলোর দিকে একমনে চেয়ে কি দেখছে।

আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলাম—গাছগুলোর দেহের ছাল কেটে কেটে অসংখ্য নাম খোদাই করা—রামরতন শর্মা, নেকিরাম ভাল্লা, আবদুল সত্তার, মনোহর সিংহ, গৌরী দত্ত, শেখ আবদুল্লা, পি জোসেফ, গোলাম মহম্মদ।

"এই···!" যুবক চিৎকার করে উঠল একটা নাম পড়ে আর হাতের চাকু দিয়ে গাছের গা চাঁছ্‌তে সুরু করল।

"কি করছো? এফি করছো?" আমি চিৎকার করে বললাম।

সে বলল, "মুসলমানদের নামগুলো কেটে দিচ্ছি।"

"কেন?"

সে বলল, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কুদসিয়া পার্কের সব গাছ থেকে প্রত্যেকটা মুসলমানের নাম কেটে দেব।"

বলেই গাছের ছালের ওপর সে চাকু চালাতে লাগল। গোলাম মহম্মদের "গোলাম" কেটে দিল...'মহম্মদ' রয়েছে তখনও। আমি বললাম, "দাঁড়া ভাই, আমার কথাটা শোন্!"

সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বললাম, "শোন্ ভাই, নতুন জন-গণনার হিসেবে হিন্দুস্তানে মুসলমানদের জন্ম হার সাড়ে সাতাশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। সাড়ে তিন কোটি থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটিতে পৌঁছে গেছে। এদের মধ্যে কাকে কাটবি? তোর চাকু এদের সব্বার ওপর কিভাবে চালাবি?"

সে বলল, "কিন্তু আমি ভগবানের নামে শপথ করেছি।"

"শোন্, ভগবানের সাধু ভক্ত। ভগবানকে কি দেখতে ইচ্ছা হয়?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে ধীরে মাথা দুলিয়ে হাই তুলল।

"তাহলে চাকু ফাকু ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয়!"

"কোথায়?"

ওই পার্কের মধ্যিখানে, যেখানে চারদিকের সব আবর্জনা জড়ো করা আছে।"

সে বলল, 'আচ্ছা, এই দুটো নাম কেটে দিই। তারপর আসছি।'

পার্কের মাঝখানে সিমেন্ট করা চত্বরটার ওপর একজন যুবক, পরনে কেবল ধুতী আর খালি গায়ে পৈতে, কপালে চন্দনের তিলক লাগিয়ে যেদিক দিয়ে যমুনায় স্নান সেরে যাত্রীর দল ফিরে যাচ্ছে, সেদিকে মুখ করে বসেছিল। যাত্রীর দল যমুনাতে স্নান করে কুদসিয়া পার্কের আবর্জনা স্তূপকে পাশ কাটিয়ে মোরিগেট বা সব্জীমণ্ডীর দিকে চলে যাচ্ছিল। যাত্রীরা আসলে কুদসিয়া পার্কের মধ্য দিয়ে শর্টকাট করার

জন্যেই যায়। এই নবযুবক—লম্বা—রুখুশুখু চেহারা, শ্যামলা রঙ বেশ জম্পেশ করে বসে বিড়বিড় করে অনবরত বলে চলেছে, "ভজ মন রাম হরে···ভজ মন রাম হরে।"

আমি অনেকক্ষণ তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু যখন সে আমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না তখন আমি আরও কয়েক পা এগিয়ে—বলতে গেলে তার মাথার ওপর দাঁড়িয়েই বলতে লাগলাম, "খোকা, ভগবান দর্শন করবে?"

সেই নবযুবক তখন চোখ খুলল, আমার দিকে দেখল, তারপর ফের চোখ বুঁজে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "আমার মনে এখন আর কোন ইচ্ছা নেই। ভগবানকে দেখবারও আর ইচ্ছা নেই। এখন আমি সব রকম ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে গেছি···ভজ মন রাম হরে···ভজ মন রাম হরে।"

সে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করেই বিড়বিড়িয়ে যেতে লাগল। আর আমি চত্বরের অন্যদিকের কোণটার দিকে চলে গেলাম। সেখানে দুজন পেন্সন প্রাপ্ত বৃদ্ধ লোক গম্ভীর স্বরে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিল। দর্শন তত্ত্বের অলোচনার মধ্যে মধ্যেই কতকটা এই ধরনের কথা বার্তাও হচ্ছিল—"আরে, আমি তো এই সংসারে কোন ব্যাপারে মাথা ঘামানো ছেড়েই দিয়েছি। সমস্ত ব্যবসা ছেলেদের হাতে সঁপে দিয়েছি। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ভগবানের দয়ায় আমার অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাকটরী এই বছর গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ষাট লক্ষ টাকার মাল কেনার অর্ডার পেয়ে গেছে। ফরিদাবাদে আর দুটো কারখানা চালু করে দিয়েছি। সিমলাতে একটা বাড়ী, দেরাদুনে একটা আর নয়াদিল্লীতে একটা বাড়ী করেছি। ছোট ছেলেটা বিলেতে পড়াশুনা করতে গেছে। কিন্তু এখন এই দুনিয়া থেকে মনটা যেন উবে গেছে। সাত সকালে তাই এখানে এই কুদসিয়া পার্কে এসে একটু ঈশ্বরের নাম করি।"

"আমি কিন্তু আমার পাওনা গণ্ডা সম্পর্কে খুবই হুঁশিয়ার, বুঝলেন ভাই সাহেব।" দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলছিল, "রেলওয়েতে ষ্টেশনমাষ্টার ছিলাম।

কিন্তু আজ পর্যন্ত হারামের পয়সা একটাও নিইনি। যখন নিয়েছি কারো উপকার করেই নিয়েছি। আমি সেইসব লোককে বেইমান বলি যারা পয়সা নেয় অথচ কাজটাও করে দেয় না। সেই জন্যে যেখানেই থেকেছি সব ব্যবসাদারেরা খুশী হয়েছে, সরকারও আমার ওপর খুশী ছিল, কেননা আজ পর্যন্ত আমার ক্যারেকটারে কোনও দাগ পড়েনি। ভগবানের দিব্যি নিয়ে বলতে পারি নিজের স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কোন মহিলাকে খারাপ নজরে কখনও দেখিনি। বিয়ে অবশ্য তিনবার করেছি আমি। কিন্তু যখন প্রথমজন মরেছে তখন দ্বিতীয়জনকে, দ্বিতীয়জন মরলে তৃতীয়জনকে বিয়ে করেছি। কিন্তু দিব্যি করে বলতে পারেন আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন মহিলাকে যদি খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকি। তৃতীয় বউও যখন মারা গেল—তখন গৃহস্থ জীবনও আমি ত্যাগ করলাম আর পরমেশ্বরের পায়ে নিজেকে সঁপে দিলাম।”

কাল আমি কত উদাস ছিলাম আর আজ আমি কতই না খুশী। আজ সকালেই কেমন ভগবানে পাঁচ পাঁচজন পরম ভক্ত মানুষ, দাসানুদাস, একই স্থানে, এই কুদসিয়া পার্কে আমি পেয়ে গেলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই এদের পাঁচজনকে যেন আমারই জন্যে, ভগবান একত্র জুটিয়ে দিয়েছেন।

আমি পাঁচজন ভগবানের দাসানুদাসকে চবুতরার নীচে ঘাসের ওপর বসতে বললাম। তারপর নিজে চবুতরার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সবচেয়ে আগে আমি আমার বাঁশের ডাণ্ডাটাকে দাঁড় করালাম। তার মাথার ছুঁচোলো দিকের চেরাটাতে কাল রাতের বাসি রুটিটা আটকে দিয়ে ডাণ্ডাটাকে ঝাণ্ডার মত উচিয়ে তুলে ধরে বললাম:

“সজ্জনগণ! তোমরা ভগবানকে দর্শন করতে চাইছো। আমি তোমাদের বলছি, এই রুটিই পরম পরমেশ্বর, এই অন্নই ভগবান। রুটি রোজগার কর আর অন্ন উৎপাদন কর, আর অন্ন উৎপাদন করার জন্য মেহন্নত কর! কর্ম কর, আরও কর্ম করে যাও আরও কর্ম দাবী কর। আর যে আজ কর্ম দিচ্ছেনা তাকে বল যে যে রাজ্য সবাইকে কর্ম দিতে

পারে না সে সবাইকে শাসনও করতে পারে না। আমি বলছি…"

কিন্তু আমার কথা আর কেউ শুনল না। সব্বাই খ্যা খ্যা করে জোরে জোরে হাসতে লাগল। কিন্তু তাদের সমবেত হাসি পরোয়া না করেই আমি বলে যেতে লাগলাম। রুষ্ট হ'য়ে পাঁচ জনই কয়েক মিনিটের মধ্যে চবুতরার ওপর উঠে পড়ল। তারপর আমার হাত থেকে বাঁশের ডাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়ে সেই বাঁশ দিয়েই আমাকে পেটাতে পেটাতে চবুতরার ওপর শুইয়ে দিল।

কুদসিয়া পার্কে তখন এক নিস্তব্ধ অবস্থা। যে প্রাণায়াম করছিল সে আবার তার জায়গায় ফিরে গিয়ে প্রানায়াম শুরু করে দিয়েছে। পিঁপড়েদের যে আটা খাওয়াচ্ছিল সে আবার নিজের কাজে মগ্ন। দুই বুড়ো নিজেদের দর্শনতত্ত্বের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করেছে আর সেই ছোকড়া চাকু নিয়ে আবার গাছে-খোদাই মুসলমানদের নামগুলো কাটতে ব্যস্ত। আমি ঘায়েল শরীর নিয়ে সেই চবুতরার ওপরেই পড়ে আছি এবং সংসার তার আপন জায়গায় ফিরে গিয়ে নিজের মর্জিমাফিক যেমন চলত তেমনই চলছে।

আর যমুনায় স্নান সেরে তেমনই সার বেঁধে যাত্রীরা ফিরে যাচ্ছে পার্কের মধ্য দিয়ে। তিন চারটে বুড়ি ভিজে ময়লা কাপড়ে মাথা নীচু করে আপন মনে জপ করতে করতে এগিয়ে আসছিল।

আমারই পাশে চবুতরার এক কোণে বসে থাকা সেই যুবক সাধু, যার প্রাণে আর কোন ইচ্ছাই নেই, তখনও দুচোখ বুঁজে গুনগুন করে যাচ্ছিল…"ভজ মন রাম হরে…ভজ মন রাম হরে…।" হঠাৎ তার চোখ দুটো খুলে গেল। আর সামনেই তিন চারটে বুড়িকে দেখে তৎক্ষণাৎ চোখ বুঁজেই বিকৃত মুখে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ, কি শুক্‌নো শুক্‌নো ঠ্যাং…ভজ মন রাম হরে…কি বিচ্ছিরি টিং টিঙে সব শুক্‌নো ঠ্যাং…ভজ মন রাম…"

## আমি রোবো এবং শীলা

আমি বার্মিংহাম থেকে রোবোকে আনিয়েছিলাম। কেন না বার্মিংহামের রোবো নিউইয়র্কের রোবোর চেয়ে অনেক সুশীল এবং সুসভ্য হয়। বার্মিংহামের রোবো প্রতি কথার অন্তে 'ইয়েস স্যার' বলবেই। পরন্তু ন্যুইয়র্কের রোবো সব সময় 'হাই' বলে সম্বোধন করে। নিউইয়র্কের রোবো আপনার সঙ্গে চেনা-পরিচয় করতে বেশী সময় নেবে না, কিন্তু বার্মিংহামের রোবো প্রভু এবং দাসের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা বজায় রাখে। বস্তুতঃ এদের দুজনের মধ্যে ততটাই পার্থক্য যেমন একজন ইংরেজ এবং একজন আমেরিকানের মধ্যে থাকে।

রোবোর দেহের উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। আমার ধারণায় ঠিকঠিক মাপ-জোফ মতই হয়েছে তার দেহটা। কেন না, ছোটখাট চেহারার চাকর বাকরই আমার বেশী পছন্দ। তাগড়া জোয়ান, উঁচু লম্বা চেহারার চাকর বাকর দেখলেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। তখন তাকে কোন কাজের ফরমায়েশ করতে আমারই ভয় লেগে যায়। সে জন্যেই আমি রোবোকে বার্মিংহাম থেকে আনিয়েছিলাম, কারণ সে লোকটা স্বভাবে সৎ, সুশীল, বিনয়ী ও বাধ্য এবং নির্ভরশীল, বিশ্বাসী। আজেবাজে কথা কখনও বলে না। কখনও ছুটি নেয় না। কক্ষনো সিনেমা দেখার বায়না করেনা। কক্ষনো কাজ করতে করতে ফাঁকি দেবার কথা ভাবে না এবং কখনোই বেতন চায় না। এই পৃথিবীতে এমন চাকর আর কোথায় পাওয়া যাবে!

রোবো দিনের বেলা আমার সব কাজকর্ম করে আর রাতে আমার ল্যাবরেটরী পাহারা দেয়। রোবো দিনেও ক্লান্ত হয় না, আবার রাত্রে ঘুমোয়ও না। সে জলও খায় না, খাদ্য-খাবারও খায় না। মানে, এমনই ধরে নিন যে সে যেন লোহার তৈরী। না, 'যেন' 'টেন' নয়, সত্যি সত্যিই সে লোহা দিয়েই তৈরী। প্রথম বার যেদিন আমি তাকে

কাঠের বাক্সটার ভেতর থেকে বাইরে বের করলাম, যার ওপর 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' লেখা ছিল, তো সেদিন আমি তাঁর লোহা দিয়ে বানানো চেহারাটা দেখে খুবই খুশী হয়েছিলাম। রোবো ইস্পাত দিয়ে বানানো। হাতের আঙ্গুলগুলোতে ক্রোমিয়াম পালিশ করা এবং পায়ের নীচে রবার দিয়ে এমন নরম করে দেওয়া হয়েছে যে যখন চলা ফেরা করে তখন কোন শব্দ প্রায় হয়ই না বলতে গেলে। রোবোর মস্তিষ্কের মধ্যে অগুণতি সূক্ষ্ম তার দিয়ে এমন করে তৈরী করা হয়েছে যার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি এবং ল্যাবরেটরীর বিভিন্ন কাজ কর্ম সম্বন্ধে যাবতীয় নির্দেশাদি সব নিখুঁতভাবে ভরে দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য, ওই সমস্ত কাজকর্ম ছাড়া অতিরিক্ত আর কোন কাজই সে করতে সক্ষম নয়। তার ওই মস্তিষ্কে অন্য কোন রকম জ্ঞান আর নেই। তার মস্তিষ্কে অন্য কোন রকম—অনুভূতিও নেই। বা মনের মধ্যে অন্য কোন ভাবনা-চিন্তা-ইচ্ছা কিছুই নেই। তার সহজ কারণ এই যে রোবোর বুকের মধ্যে 'হৃদয়' নামে কোন পদার্থের অস্তিত্বই নেই। তার শরীরের মধ্যে কেবল নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যাটারী সংযুক্ত আছে। বার্মিংহাম অটোমেটিক কোম্পানী এই ব্যাটারীর জন্য দশ বছরের গ্যারান্টি দিয়েছে।

আমার লেবরেটরীতে তিনজন লোক কাজ করে। আমি, যাকে সবাই বলে প্রফেসার। আমার অ্যাসিস্টেন্ট শীলা—একেবারে মুখু বাচাল আর চিড়বিড়ে স্বভাবের মেয়ে। যদিও সে নিজেকে মহিলা বলেই জাহির করে, কিন্তু একজন পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ে, প্রত্যেকদিন যে নতুন নতুন পোষাক পরে,—দিব্যি লিপষ্টিক চড়িয়ে আসে—তাকে আমি কিছুতেই 'মহিলা' বলে মেনে নিতে পারি না। আমি বেশ কয়েকবার তাকে ধমক দিয়েছি। প্রতিবারই আমার ধমক খেয়ে আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বড় বড় চোখ দুটো অশ্রুজলে ভরে ওঠে। প্রতিবারই আমাকে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলতেই হয়। অবশ্য এটাও সত্যি যে ধমক খেয়ে মেয়েটা বেশ ভালোভাবে নিজের কাজ করতে থাকে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে মেয়েরা সামান্য,

ছোটখাট কথাবার্তাগুলোর ওপরই গুরুত্ব দেয় বেশী। বিস্তৃত এই জীবনটাকে একটা সম্পূর্ণ ছাঁচের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। বিপরীত দিকে—জীবনের বিভিন্ন খানা-খন্দগুলোর দিকে তাদের খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। শীলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুবীক্ষণে চোখ রেখে কাটিয়ে দিতে পারে। পক্ষান্তরে, আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠি অল্প সময়ের মধ্যেই।

আমাদের তৃতীয় সাথী রোবো যার মস্তিষ্কের যন্ত্রগুলোর মধ্যে ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিশেষ শক্তি এবং শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যান্সারের চিকিৎসার কোন বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন এখনও হয়নি। কখনও কখনও, যেমন গ্যালোপিং ক্যান্সার—যা দ্রুত অবনতির দিকে যায়, সে রকম ক্ষেত্রে, রোগের দ্রুত সংক্রমণের হদিশ পেতে রোবোর যন্ত্র-মস্তিষ্ক একেবারে অতুলনীয়ভাবে আমার সহায়ক হয়ে ওঠে।

আমি যে রোবোকে এনেছিলাম প্রথমতঃ এই বিশেষ কাজটির জন্যেই। এখন সে আমার নিজেরও অনেক কাজকর্ম করে দেয়। কেননা শীলা বিকেল হলেই নিজের বাড়ীতে ফিরে যায়। আমি তখন লেবরেটরীতে একাই থাকি। কাজ করতে করতে সময়ের আন্দাজটুকুও থাকে না আমার। তখন সারা বাড়ীটাতে আমি ভীষণ একা হয়ে যাই। এই পৃথিবীতে নিজের বলতে মা-বাপ, ভাই বোন কেউই নেই আমার। হয়তো কোনদিন ছিল তারা। আমার এখন কিছুই মনে নেই। আমি ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজে এমনই ডুবে আছি যে অন্য কোন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার কোন অবকাশই নেই। কোন আত্মীয়তারও বন্ধন নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে যদি রোবো আমার কাছে না থাকত তো আমার দেখাশোনা কে করতো? তাহলে তো আমার বেঁচে থাকাটাও কঠিন হয়ে পড়ত। আমি আমার জীবনের অনেকখানি দায়িত্ব রোবোর ঘাড়ে তুলে দিয়েছি। আর বলতে কি রোবো নিজের গুণেই চৌকোশ। সে কখনও ভুল করে না। কেবল একবার তার একটা ভুল হয়েছিল।

আমার মনে আছে। বসন্তকাল সবে সুরু হয়েছে তখন। আমার

মনটাও সে সময় বেশ প্রসন্ন ছিল।

আমি ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য একটা নতুন ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম। 'ডেসিল ডিহাইড্রাইড এন. টু. পি, কে.—নিয়ে তার মিক্সচারের মধ্যে ক্যান্সারের কীটাণু রেখেছি আজ দিন চারেক হলো। প্রতিদিনই কীটাণু বাড়ছে। কিন্তু, আজই দেখলাম আপনা হতেই যেন বাড় বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্যই, তার মানে এই নয় যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তবে, সফলতার দিকে যে আমি আরও এক পা এগিয়ে গেলাম, তাতে সন্দেহ নেই।

আমি প্রসন্ন মনে রোবোকে বললাম : 'ডেসিল ডিহাইড্রাইড এন. টু. পি. কে—এর মিক্সচারটাকে আর পাঁচ ভাগ জোরালো করে দাও। আর তুমি—শীলা এই মিক্সচারে ক্যান্সারের কীটাণু রেখে অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করো—দেখো, কিরকম প্রভাব পড়ে।'

"ঠিক আছে, প্রফেসর।" শীলা অনুবীক্ষণে চোখ রেখে কি একটা পরীক্ষা করছিল—মুখ তুলে বলল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি প্রফেসরের ওপর থেকে সরে গিয়ে জানালার বাইরে পড়তেই খুশীতে সে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

"কি হলো?" আমি প্রায় চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম, "নতুন কিছু পেলে না কি?"

"ফুল..." শীলা চেঁচিয়ে বলল, "ফুল ফুটেছে, ওই দেখুন জানলার বাইরে। আপেল গাছের ডালে ডালে ফুল ফুটেছে!"

"রোবো, জানালাটা বন্ধ করে দাও!" আমি রুক্ষ স্বরে বলে উঠলাম।

"ইয়েস স্যার!" রোবো গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল।

"কিন্তু প্রফেসার," শীলা প্রতিবাদের স্বরে বলে উঠল, "আজ এই প্রথমবার আপেল গাছে ফুল এলো। তার মানে হচ্ছে বসন্তকাল এসে গেল। ডালে ডালে ফুল ফুটছে। আমাদের তো আজ বসন্ত-উৎসব করা উচিত।"

"আমি যা বলেছি সেই কাজটা তুমি আগে কর!" আমি তার

সীমাঅতিক্রম করা দুঃসাহস আর ছেলেমানুষীর ওপর গাম্ভীর্যের পর্দা ঢাকা দিয়ে বললাম, "ওই 'ডেসিল ডিহাইড্রাইড এন. টু. পি. কে—'..."

"পীকে হম্ জো আয়ে..." শীলা কলকল করে গেয়ে উঠল আর শরীর দুলিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাতের ওপর তার হাত চেপে ধরল।

"চলুন প্রফেসর! আজকে বাইরে কোথাও গিয়ে আমরা একটু পিক্‌নিক্ করে আসি। আজ আমরা ল্যাবরেটরীতে আর কাজ করব না। কিছু কাজ করব না আজ।" সে বেশ প্রগলভ স্বরে বলে উঠল।

ধৈর্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে গেল আমার। খুবই কষ্ট করে নিজেকে কোন মতে সংযত করে আমি বললাম, "যদি তোমার কাজ করতে ইচ্ছে না হয় তো ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে যাও। রোবোর সঙ্গে গিয়ে দাবা খেলো।"

"আমি খেলবো না রোবোর সঙ্গে দাবা।" শীলা কপট রাগের স্বরে বলল, "পাজীটা সবসময় আমাকে হারিয়ে দেয়। ওর যন্ত্র-মস্তিষ্ক পঁচিশ বাজীর খেলা আগেভাগে ভেবে নেয়।"

আমি রোবোকে কাছে ডেকে নিয়ে তার মাথা থেকে যান্ত্রিক ফিতেটার সব শক্তি কমিয়ে দিয়ে তাতেই দাবা খেলার উপযোগী একেবারেই সাধারণ আর প্রারম্ভিক জ্ঞান ভরে দিলাম। মিনিটখানেক লাগল কাজটা করতে। তারপর আমি রোবোকে শীলার সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। রোবোর বোধ বুদ্ধিতে এসব কোনও প্রভাব ফেলল না। সে জানতেও পারল না যে আমি কেন এরকম করলাম। তার চোখের কাঁচের টুকরো দুটোর ভেতর হলুদে রশ্মি পড়ে চকচক করতে লাগল। বুঝতেই যখন পারল না সে কিছু, সে নিজে মাথায় তামার তৈরী সূক্ষ্ম চুলগুলোতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে শীলাকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে শীলা জেতার আনন্দে খুশীতে ডগমগ মুখ নিয়ে প্রায় দৌড়ে ভেতরে এসে ব্যস্ত করে তুলল আমাকে। যখন আমি

'ডেসিল ডিহাইড্রাইড এন, টু, পি, কে⋯" যাক গে, যেতে দিন। শীলা একেবারে চেঁচিয়ে উঠে বলতে লাগল।

"আমি আজ রোবোকে দাবার চালে মাত করে দিয়েছি। ওর পঁচিশ বাজী আগে দেখতে পাওয়া যন্ত্র মস্তিষ্ক ফেল পড়ে গেছে। প্রফেসর! আপনি কি তবুও আমাকে অভিনন্দন জানাবেন না?"

"এবার মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজে লেগে যাও! করবে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

শীলা তার লাল জিভটা একটুখানি ঠোঁট ফাঁক করে দেখিয়ে বলল, "মাইক্রোস্কোপ কি বলছেন, এরপর তো আমি মাইক্রোফোন নিয়েও কাজ করতে রাজী।"

বসন্তের দিনগুলো যত এগুতে লাগল, শীলার স্বভাবে চলনে বলনে কেমন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সে নানা বিচিত্র, উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরে আসতে লাগল! কখনও বেশ দেরী করে এল তো যাবার সময়ের অনেক পরেও থেকে গেল। কখনও অনুবীক্ষণ নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল বা দাঁড়িয়েই রইলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একদিন আমার জন্যে একটা রেশমী স্কার্ফ নিয়ে এলো। কিন্তু রেশমী স্কার্ফ নিয়ে আমি করবটা কি? ক্যান্সারের ওষুধ বার করতে গিয়ে এই রেশমী স্কার্ফ আমার কোন্ কাজে লাগবে? দু'একবার তো আমার কোটের বোতাম ঘরে ফুল গুঁজে দিতে এলো সে। আমি সরিয়ে দিলাম। কখনও বা নিজের বাড়ী থেকে তৈরী করে মিষ্টি নিয়ে এলো আমার জন্যে। ক্ষীর, শাহী খাজা, কখনও বা পুডিং, কোনদিন অন্য আরও কত কি। অথচ সে ভালো ভাবেই জানে যে আমি মিষ্টি খাই না; কেন না, আমার ডায়াবিটিস্ আছে। তবু কিছুতেই নিষেধ মানবে না। কোনও কথাও শুনবে না। একবার খুব সর্দি কাশি হবার পর সে আমার জন্যে উলের সোয়েটার বুনে ফেললো, অথচ তখন গ্রীষ্মকাল। কি করে তখন আমি উলের সোয়েটার পরি? যেই আমি সেটা ফেরত দিলাম সে সোয়েটারটা ছিঁড়ে খুঁড়ে উনুনে ফেলে দিল। আজব পাগল হয় মেয়েগুলো! কখন

কি কাজ করছে তার ঠিক নেই। মনে মনে কি সব ভাবছে তা জানা তো আসাধ্য। কোন কথায় সামান্যতম ভরসা করার উপায় নেই। এদের যে কোন বৈজ্ঞানিক কাজে শিক্ষা দিতে যাওয়াও বেশ কঠিন। একে তো আমার নিজের কাজ করতে গিয়েই সব কেমন গোলমাল বেঁধে যায়। সে সময় এমন উপায়েও থাকে না যে শীলাকে অন্যান্য কাজের জন্য রোবোর সাহায্য নিতে বলব। কারণ, তখন আমার কাজে সাহায্য করতেই রোবোকে প্রয়োজন হয় আমার। রোবো শীলাকে হয়তো কোন সময় দাবা খেলায় হারালো। কি তাকে নিয়ে বাইরের বাগানে একটু ঘুরে বেড়ালো; কখনও বা কোনও বইয়ের বিশেষ অংশ যা তার যন্ত্র মস্তিষ্কে ভরে দেওয়া আছে—তাই শুনিয়ে দিল শীলাকে, কারণ সে জানে যে মানুষেরা হাসতে খুব ভালোবাসে। এর কারণটা কি? সে জানে না। আমিও জানি না। কিন্তু রোবোর এই ধারণাটুকু আছে যে শীলা তার চুট্‌কী গল্পগুলো শুনে খুব হাসে। এ জন্যে রোবো, শীলাকে এমন হাসিয়ে দেয় যে খানিক পরে শীলা গম্ভীর হয়ে ল্যাবরেটরীতে এসে কাজ শুরু করে দেয়। স্বভাবতঃই, এসব আমার ভালো লাগে না। তবে কিছু বলি না কারণ, শীলা নিজের কাজে খুবই কুশলী। আর ভালো একজন ল্যাবরেটরী অ্যাসিষ্টেন্ট পাওয়া যায়ই বা কোথায়! আর রোবো, যতই হোক যন্ত্রই তো বটে। সব কাজই করতে পারে। কিন্তু যে কাজে খানিকটা বুদ্ধি প্রয়োগ বা চিন্তার অবকাশ আছে, তেমন কাজ ওকে কিভাবেই বা করতে দেওয়া যায়?

একবার তো আমি শীলার ওপর খুব রেগে গেলাম। একদিন সে ল্যাবরেটরীতে এলো সেন্ট মেখে। ভাবতে পারেন? ল্যাবরেটরীতে সেন্ট!

আমি ভীষণ রেগে প্রশ্ন করলাম, "এটা কি?"

"একটু সেন্ট!" শীলা মুচকি হেসে বলল, "প্রফেসর, এটা একেবারে সেরা সেন্ট। আমি প্যারিস থেকে আনিয়েছি।"

"তুমি কি জাননা যে ল্যাবরেটরীতে সেন্ট মেখে আসা নিষেধ?"

"কিসের নিষেধ?" শীলা তার বড় বড় চোখ দুটোতে রাজ্যের বিস্ময় মাখিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল।

"কারণ, আমরা জানিনা যে এই অজানা সেন্টের গন্ধ ক্যান্সারের কীটাণুগুলোর ওপর কোন রকম প্রতিক্রিয়া করে কিনা।"

"তা আসুন। পরীক্ষা করে দেখি।" শীলা আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "খুবই একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

"তুমি কি রকম পাগল, অ্যাঁ ?" আমি রেগে উঠলাম, "এই লেবরেটরীতে এর আগে কতরকম কি ঘটেছে, যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। ক্যান্সার নামে এই অসুখটা কেন হয় ? এর এমন দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে কেন ? কোন ওষুধেরই বিশেষ কোন প্রভাব এর ওপর ফলপ্রসূ হয় না কেন ? এর বৃদ্ধির গতি প্রোটিন-বৃদ্ধির গতির চেয়ে অন্য ধরণের কেন হয় ? এই সমস্ত রহস্যময় সমস্যার ওপর তুমি— আবার এই ল্যাবরেটরীতে একটা সেন্ট নিয়ে এসে আর একটা সমস্যা— বাড়িয়ে দিচ্ছ ! তুমি পাগল হয়ে যাওনি তো ?"

একেবারে আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ধীর স্বরে সে বলল : "একটু শুঁকেই দেখো না এই সুগন্ধটা ! কি বলতে চায় এটা তোমাকে ?"

"গেট আউট !" আমি রাগে চিৎকার করে উঠলাম, "আজ থেকে তোমার চাকরী শেষ হলো। রোবো, একে ল্যাবরেটরী থেকে বাইরে বার করে দাও···"

এই ঘটনার দুদিন পর। রোবো ল্যাবরেটরীতে মাথা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখভাব বেশ কঠোর আর গম্ভীর, যেন কোন এক গভীর চিন্তায় লীন হয়ে আছে।

"কি ব্যাপার, রোবো ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"স্যার ! একটা কথা ছিল।" একটু তিরিক্ষি স্বরে সে বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।" আমি উৎসাহ দিলাম তাকে।

"স্যার ! আমার কাজে মন লাগছে না।"

আমি চমকে উঠে বললাম, মন লাগছে না ! কোন কাজে মন লাগছে না ? "অ্যাঁ ?"

"কোনো কাজেই "মন লাগছে না।" রোবো বলল।

"এসব আবার তুমি কি বলছো ?" আমি রোবোর দিকে খুঁটিয়ে দৃষ্টি-পাত করলাম," একটু হুঁশিয়ার হও ! তুমি জানো যে তুমি কি বলছ ?"

"এটুকু বুদ্ধি তো আমার আছে যে আমি যা কিছু বলছি—তা বুঝেই বলছি। স্যার ! যেদিন থেকে শীলাদেবী গেছেন সেদিন থেকেই কাজে আর আমার মন লাগছে না।"

"শীলা দেবী…!" বিস্ময়ে থ' হ'য়ে গেলাম আমি।

"ইয়েস্ স্যার !" রোবো গম্ভীর স্বরে বলল, "আমি জানি না যে এমনটা হ'চ্ছে কেন ! যখন উনি কাঁদতে কাঁদতে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন আমার মনটা বলল যে আমিও ওঁর পিছু পিছু চলে যাই। কিন্তু আমি তো লোহা দিয়ে তৈরী একটা যন্ত্র মাত্র যাকে আপনি কিনে নিয়েছেন। আমার ওপর তো আপনার অধিকার আছে। একথা ভাবতেই আমার পা আর সরলো না, মাথা নীচু করে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে ওনার চুপি চুপি চলে যাওয়া দেখতে লাগলাম। সাহেব, আমি বলতে পারব না, কেন এমন হলো ! কিন্তু সত্যি করে বলছি উনি চলে যেতেই এমন একটা অনুভূতি হলো আমার যেন দিনের আলো ম্লান হয়ে গেল, যেন আঁধার ক্রমে ঘন হয়ে উঠতে লাগল। আমার মাথার ভেতরের সূক্ষ্ম তারগুলোতে একটা বিচিত্র শন্‌শনাইট শুরু হয়ে গেল। সে এমনই এক শন্‌শনাট যা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের চেয়েও ভিন্ন প্রকৃতির। স্যার, একটা কথা আপনাকে বলব ? এটা খুবই সত্যি যে এর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আমি নির্দেশ করতে পারব না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে শীলা দেবীর হাতে একটা অদ্ভুত শক্তি আছে, যা বিদ্যুৎ-শক্তির চেয়ে একেবারেই আলাদা। উনি যখন আমার মাথায় হাত বুলোতেন তো আমার তামা দিয়ে তৈরী কেশরাশিতে তখন কি এক বিচিত্র ধরণের শান্তি আর সুখের ঢেউ খেলা করত। সাহেব ! আমি এর বিশ্লেষণ করতে পারব না। কারণ, আমার অভিজ্ঞতা, আমার জ্ঞান, আমার বিদ্যা, আমার জীবনে এরকমের অনুভূতি একেবারেই নতুন। একদিন, যখন উনি আমার মাথার কেশে আঙ্গুল দিয়ে বিলি

কাটছিলেন তো আমি পাঁচ মিনিটের জন্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছিলাম। অদৃশ্য এই অর্থে যে আমার কোন হুঁশই ছিল না। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায়—গেলাম কি যে সব হ'তে লাগল? এই পাঁচ মিনিটে আমার মনে হলো—সময় যেন কোন দূর দেশে উধাও হয়ে গেছে, কি ভাবে, তার কোন উত্তর আমার কাছে নেই আজও।—দুদিন ধরে কেমন যেন মনে হচ্ছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরের ব্যাটারী তো ঠিকঠাক চলছেই। ভোল্টেজও ঠিকই আছে। মাথার ভেতরের যান্ত্রিক ফিতে আর হাত-পায়ের স্প্রীংগুলোও ভালোই আছে। কিন্তু কোন কাজেই আর আমার মন লাগছে না, স্যার! আমি বুঝতেও পারছি না যে এ আমার কি হ'য়ে গেল!

রোবো ব্যাকুল হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার হাত-পা কাঁপছিল। তার চোখের কাঁচদুটো ঘোলাটে ধোঁয়ার মত হয়ে গেছে; রাতের আলোর সবুজ রশ্মি যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছে; আমার সত্যিই এমন মনে হচ্ছিলো যে যদি কাঁচের তৈরী চোখ কখনও কাঁদতে পারে তো এই মুহূর্তে রোবো কাঁদছিল এবং যদি কখনও লৌহ যন্ত্র মানুষের মত চিন্তা ভাবনা করতে পেরে থাকে তো সেটাও এই মুহূর্তেই ঘটছে। আর আমিও কিরকম এক মূর্খ! যে উত্তাপ লোহাকে নমনীয় করে দিতে পেরেছে, সেই উত্তাপ আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেল অথচ আমি তাকে চিনতেও পারলাম না! ক্যান্সারের ওষুধ বার করার পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষণে এক অচেনা সুগন্ধী, আমার শরীরের সান্নিধ্যে এসে থমকে থেমেছিলো এক পল্‌, আমি নিজের জ্ঞানের অহঙ্কারে মত্ত—একবার একটু ঘ্রাণ নিয়েও দেখলাম না, উল্টে তাকে নিজের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলাম।

"স্যার! আমার কি হয়েছে?" রোবো ব্যগ্র হ'য়ে দুঃখ পূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"তুমি প্রেমে পড়ে গেছো রোবো।" আমি উত্তর দিলাম।

"প্রেম কি রকম হয় স্যার?" রোবো আরও ব্যকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

"প্রেম এক এমনই সুগন্ধ রোবো…"আমি বললাম, "জীবনের প্রতিটি ল্যাবরেটরীতে যার আবশ্যকতা অনুভূত হয়…আমি কালকেই শীলাকে কাজে আসতে বলে দেবো।"

---

**অনুবাদ :** উৎপল ভট্টাচার্য
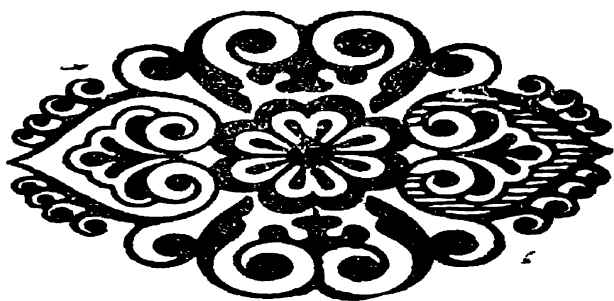
□ উপন্যাস □

দেখতে দেখতে সূর্য পশ্চিমে অস্ত গেল। দূরে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, ছড়িয়ে আছে কি সুন্দর উপত্যকা। সূর্যদেবের জেলে শেষ বারের মতো তার স্বর্ণাভ জাল ফেলেছে উপত্যকার গভীরে। নীলাভ জঙ্গলে ঢাকা উপত্যকা, পাহাড়, ধানক্ষেত···নদীর চকচকে জলরাশি, কাঠের ছোট ছোট পুল, সোনালী নাশপাতির গুচ্ছ সব যেন ঢাকা পড়ে গেছে ঐ স্বর্ণাভ জলের আবরণে। বাতাস ধীর গতিতে থেমে থেমে বই ছিল। মনে হচ্ছিল তার মিষ্টি মৃদু নিঃশ্বাসও যেন ঐ জালে আটকে পড়েছে। ঐ বর্ণাঢ্য জালের তরঙ্গায়িত কোমলতা ছুঁয়ে যাচ্ছিল শ্যামের মুখ; যেন ঐ স্বর্ণাভ জালটা তার মুখের ওপর দিয়ে পিছনে পশ্চিমের দিকে চলে যাচ্ছে। সূর্যদেবের জেলে যেন উপত্যকার সব সোনা, সব সৌন্দর্য রঙীন মাছের মতো জালে পুরে নিয়েছে এবং এবার পশ্চিম দিকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঐ জালটাকে যেন এখন পাহাড়ের চূড়ো থেকে টেনে নামানো হচ্ছে, তরপর ঘন জঙ্গলের ওপর দিয়ে সুন্দর উপত্যকায় প্রসারিত ধানক্ষেতের দিকে এগিয়ে আসছে সেটা, আর তার পিছনে ছড়িয়ে পড়ছে এক মন-উদাস করে দেওয়া কালো ছায়া। শ্যাম ভাবছিল কি করে একজন মানুষ এমন অধিকার পায় যে উপত্যকার সমস্ত সৌন্দর্য এভাবে করতলগত করে নিতে পারে এবং যাবার সময় সব কিছু সাপটে নিয়ে চলে যেতে পারে? ওর মন চাইছিল পশ্চিম অস্তাচলে অন্তরীক্ষে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এমন এক বাঁধ তৈরী করতে যাতে সৌন্দর্যের এই প্রবাহ ওদিকে চলে যেতে না পারে এবং উপত্যকার সৌন্দর্যের এই অন্তিম মুহূর্তটি তার অনুপম ছবিটিকে যেমনটি আছে তেমনটি চিরায়ত করে রাখে। কিন্তু অস্তাচল-গামী সূর্য তার এই অভিনব কল্পনায় এমন ভাবেই হেসে উঠল যে কয়েক মিনিটের মধ্যে উপত্যকায় আবছা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। পশ্চিম প্রান্তে শুধু এক রক্তিম রেখা ছাড়া

আর কিছু রইল না—জালের শেষ প্রান্তটি। শ্যামের খচ্চরের ঘাড়ের লম্বা চুলগুলো একটু আগেও অগ্নি শিখার মতো দোদুল্যমান ছিল, এখন রুখু-সুখু চুলের একটা বিশ্রি ফালির মতো দেখাচ্ছে আর ওর মনে হল এই সংকীর্ণ পার্বত্য পথে খচ্চরের পিঠে বসে আকাঙ্খার অসফলতার কথা চিন্তা করা অর্থহীন, এবার এগিয়ে যেতে হবে।

ওর কাছেই অন্য একটা খচ্চরের পিঠে বসেছিল গোলাম হোসেন। একটু ঝুঁকে উপত্যকার দিকে হাত দেখিয়ে ও বলল, 'এটা মান্দরের উপত্যকা. আর ওটা—মান্দরের নদীর ওপারে কাছারী বাড়ী। রাত হবার আগেই ওখানে পৌঁছে যাব আমরা। তহশীলদার সাহেব আপনার অপেক্ষায় আছেন।'

তহশীলদার সাহেব, দুষ্টু রবি, ছোট্ট নিম্মী আর মা আজ সকলেই ওর প্রতীক্ষা করছেন। ওদের উদগ্রীব মুখগুলো ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। নিম্মীর সরল হাসি, ওর চোখের বিস্ময়; রবির চঞ্চলতা, ওর কোঁকড়ান চুল এবং বারবার ঐ চুলগুলোকে ঝাঁকানোর এক বিচিত্র ঢং, ওর মায়ের প্রশস্ত কপাল, সোজা সিঁথি আর কালো চুলে চিকচিকে রূপোলি রেখা সরু ভ্রূর তলায় শান্ত চোখ, চোখের পাতার প্রান্তে সূক্ষ্ম বলি রেখা, প্রৌঢ়ত্বের পদচিহ্ন; দৃষ্টিতে ক্লান্তির ছায়া···এক অজানা ভয় এবং সুস্পষ্ট ঔৎসুক্যের চেয়ে অনেক বেশি মমতার ভাব দেখা যায়। এদের সবাইকে ছাপিয়ে ওর বাবার রূপটা ভেসে উঠল, তীক্ষ্ণ, ক্লান্ত দয়াপ্রার্থী চোখ, যেখানে কখনো প্রসন্নতার চমক, কখনো বা চিন্তার ছায়া, কখনো শাসনের অভিমান—যেন ঐ চোখের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবাই অপরাধী। সুগঠিত দৃঢ় চিবুকে নিজের আঙ্গুল বোলাচ্ছিলেন তিনি।

পুরো এক বছর পরে নিজের বাড়ীর লোকজনদের কাছে আসছে শ্যাম। গত বছর গরমের ছুটির পর ও এখন কলেজে গেল তখন ওর বাবার বদলী হয়ে যায়। বদলি এবং পদোন্নতিও—উনি যখন মান্দরের তহশীলদার। এক বছরে বাড়ীর লোকেরা কতোটা বদলেই না যেতে

---

**অনুবাদ :** অতীন ঘোষ

পারে। হ্যাঁ, এই জায়গাটাও নতুন। ধীরকোটতো একেবারে দমবন্ধ হয়ে আসা জায়গা ছিল···শীত, বরফে ঢাকা আর কনকনে ঠাণ্ডায় আচ্ছন্ন থাকতো। কিন্তু এই উপত্যকার বক্ষতল যেন আসীমে গিয়ে মিশেছে, সেই উপত্যকার বুক চিরে একটা ছোট মতো নদী চঞ্চল গতিতে বয়ে চলেছে। জায়গাটা ভালই হবে মনে হচ্ছে। ছোট বোন আর ভাই কত আগ্রহেই না তার পথ দেখছে! কখনো কখনো হয়তো তার মাও পাহাড়ী রাস্তার ধারে এসে এই আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে আসা আরোহীদের মধ্যে নিজের ছেলেকে খুঁজছেন···

ততক্ষণে সে পথের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এসেছে এক সোজা পাক দণ্ডীতে। চার পাশে অন্ধকার ছেয়ে গেছে—অন্ধকার এবং নির্জনতাও। তবে মাঝে মাঝে পাথরে ধাক্কা খাচ্ছিল খচ্চরদের পা আর খচ্চরওলা তার ক্লান্ত ও ক্ষীণ স্বরে বলে উঠছিল, 'সমঝে···নুরী···সমঝে হাঁটো।'

শ্যামের মানস-চেতনা এক ধরণের ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল। বার বার তার নাকে আসছিল উষ্ণ সুগন্ধের প্রবাহ, যার জন্যে তার মনে হল সে বোধ হয় কোনো বাসমতী ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছ। বাসমতী ধানের সুগন্ধ কত স্নিগ্ধ আর মনোহর।

হঠাৎ ওর তেষ্টা পেল। তাকাল গোলাম হুসেনের দিকে; যে তখন নিজের খচ্চরের পিঠে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

'গোলাম হোসেন, কাছাকাছি কোনো ঝরণা আছে নাকি? খুব তেষ্টা পেয়েছে···'

'এই দশ-পনেরো পা আগেই আছে। ভালই হল যে এখানে আসার পর আপনার তেষ্টা পেয়েছে, তা না হলে···।'

দশ পা যাবার পর খচ্চরের পা নিজের থেকেই থেমে গেল। বোধ হয় তারও তেষ্টা পেয়েছে। এখানে ছোট্ট মতো একটা জল কুণ্ড আছে। বড় বড় পাথরের বেষ্টনীর মধ্যে জল ঝিকমিক করছিল। ওপারে বড় বড় গাছের ঝাড়। ভেড়ার চীৎকার ভেসে আসছে। শ্যাম একটা পাথরের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পেয়ালাটা জলের দিকে বাড়িয়েছে, এমন সময় শুনল কে যেন বলছে, 'এই ঝর্ণায় জোঁক আছে, পথিক!'

শ্যাম থমকে পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরটার ওপর। গাছের ভীড়ে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, তাই শ্যাম ঐ মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছিল না। মেয়েটি বেশ লম্বা, দেহলতা ধনুকের মতো টান-টান, বুক যেন উপচে পড়ছে আর চোখে চমক আছে, ঠিক যেন পাথরের বুকে জল চকচক করছে। মেয়েটির মাথায় একটা কলসী আর শ্যামের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। 'এতে···এই ঝর্ণায় জোঁক আছে?'

মেয়েটি মাথা হেলালো—'হ্যাঁ, অনেক জোঁক আছে···ভিনদেশী লোকেরা অন্ধকারে এখানে জল খেলে জোঁকগুলো পেটে চলে যায়। নাকেও ঢোকে, কখনও কখনও মাথাতেও···', মেয়েটি হেসে উঠল।

শ্যামের মনে ঐ 'ধনুকের' তির্য্যক তীরগুলোর প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠল। ও বলল, 'জোঁক যদি মাথায় চলে যায়, তাহলে কি হবে?'

মেয়েটি বলল, 'উইপোকা লাগলে গাছের যা হয়, তাই হবে।'

'তার মানে?'

'গাছ মরে যায়; উইপোকাগুলো কিন্তু থেকে যায়—নাও জল খাও।'

মেয়েটি কলসী নামিয়ে শ্যামকে জল খাওয়াতে লাগল। মুহূর্তের জন্যে সে মেয়েটির কাজল কালো চোখ দুটির চমক লাগানো গভীরতাকে দেখল, যেন কোনো ব্যাকুল হংস-মিথুন উড়ে যেতে উদ্যত। কিন্তু পর মুহূর্তেই মেয়েটি কলসী সামলাতে লাগল। হঠাৎ শ্যামেরও মনে হল জল তো ওর খাওয়া হয়ে গেছে।

'তোমার নাম কি?' শ্যাম জানতে চাইল।

'আমার নাম চন্দ্রা। এই গাছগুলো ছাড়িয়ে উপত্যকার ওপর আমাদের বাড়ী। ওখানে আমি আমার বিধবা মার সঙ্গে থাকি। আমাদের বাড়ীতে একটা কুকুরও থাকে। ওর নাম জানতে চাও? ওর নাম শেরা, পরদেশী আর বদমাসদের মেরে তাড়াবার ব্যাপারে ও সত্যি সত্যিই বাঘ।'

মেয়েটা হাসল, কিন্তু সে হাসিতে ছিল অপমানের ঝলক, স্বরে ছিল পূর্ণমাত্রায় ব্যঙ্গের প্রকাশ।

এই গর্ব, এই আত্মাভিমান, এই চ্যালেঞ্জ!

শ্যাম খচ্চরের পিঠে উঠে বসল। হঠাৎ চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল, 'আর তোমার নাম কি?'

'জোঁক!' মুচকি হেসে বলল শ্যাম, আর গোড়ালি দিয়ে খচ্চরকে খোঁচা মেরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ওখান থেকে।

ধাবমান খচ্চরের পিঠে বসে শ্যাম মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, ওই 'ধনুক' তখনও ওখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

গোলাম হুসেন বলতে লাগল, 'এই মেয়েটা বড্ড হারামজাদী। কাউকে বিয়েও করে না, কারুর মুঠোতেও আসে না। এর মাকে পাটওয়ারী তিন হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। ঐ দামে এই 'মাদী ঘোড়াটা' খুব একটা খারাপ হত না, কিন্তু বেকুফ বিধবাটা রাজী হল না। গ্রামের লোকেরা এদের দুজনকে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছে। এর মা অন্য জাতে বিয়ে করেছিল। ব্রাহ্মণ হয়েও চামারকে বিয়ে! লোকটা জম্মু থেকে এখানে এসেছিল। এই চন্দ্রা মেয়েটা ওরই মেয়ে। চামারটা মরে গেল। তারপর থেকে শুধু এই মেয়েটা আর তার মা। ছোট এক ফালি জমি ওদের আছে, যা থেকে এদের সংসার চলে। গ্রামের লোকেরা এদের ভীষণ ঘেন্না করে, আর ভদ্রলোকেরা তো এদের বাড়ীতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। এদের দিনকাল খুবই খারাপ যাচ্ছে। কপাল এদের ফিরে যেতে পারে যদি বিধবা এই ছুঁড়িটাকে বেচে দেয়। কিন্তু মাটা তো এক নম্বরের মূর্খ। অবশ্য যেমন মা, তেমনি বেটি।

গোলাম হুসেনের কথা শুনছিল শ্যাম এবং খচ্চরটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল, আর সেই সঙ্গে উপত্যকার বদলে যাওয়া ছবি তার হৃদয়পটে আঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

## ২

মান্দর নদী পার হবার পর রাস্তাটা পাকদণ্ডীর রূপ নিয়ে ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে, এবং তার খানিকটা এগোবার পর

একটা টিলা থেকে ঐ রাস্তাটা ততটা এবড়ো-খেবড়ো আর নেই। ডান রেকাব থেকে পা বের করে ওপর দিয়ে বাঁ দিকে নিয়ে এলো শ্যাম আর বেশ আরাম করে জিনের ওপর বসল। এখন ওর হাতে খচ্চরের লাগাম, আর দুটো পাই একদিকে ঝুলছে। কিছুক্ষণের জন্যে ও কোমরটা সোজা করে নিল। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে সামনে রাখল, এবং সারা শরীর শিথিল করে নিল। খচ্চরটা ধীরে ধীরে টিলার ওপর চড়েছে। এখানে নাশপাতির একটা ট্যারা বাঁকা গাছ ছিল, পাক দণ্ডীর দুদিকে ভুট্টার ক্ষেত। ভুট্টার সোঁদা গন্ধ নাকে আসছিল তার। একটা মেয়ে মহিষের দুধ দুইছে, কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা কিষাণ। একজন দোকানদার ধুতি পরে, খালি চারপাইতে হাঁটু মুড়ে বসে হুঁকো খাচ্ছে। কাছেই একটা বুড়ী উনুনের মধ্যে কাঠের টুকরো গুঁজতে ব্যস্ত। পাশে মাখা আটা রাখা আছে। তার পাশে দুটো গরু জাবর কাটছে, একটা বাছুর পেচ্ছাপ করছে। আগুন, ধোঁয়া, গোবর, মুঞ্জ (এক ধরণের লম্বা ঘাস, যা দিয়ে দড়ি তৈরী হয়) 'হুঁকোর গুড়গুড়ানি, ভুট্টার সোঁদা গন্ধ, আর ডালে ডালে গোলাপফুল, নীলাধারীর লতা, যার ওপর বসে শত শত পাখি চেঁচামেচি করছে—সবকিছু তার মস্তিষ্কে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল, যে সে বোধশক্তি হারিয়ে ঝিমোতে শুরু করল। শ্যামের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ খচ্চরের দোলানির সঙ্গে দুলছিল। পা দুটোও বিশ্রিভাবে ঝুলে আছে। হঠাৎ খুবই কাছে দুটো বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠতেই শ্যাম প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। ওর ছোট ভাই আর বোন নিম্মী ভীষণ খুশি হয়ে হাততালি দিতে দিতে চেঁচাচ্ছিল, 'বড়দা এসে গেছে···বড়দা এসে গেছে আহা···আহা···।' রবি আর নিম্মী এগিয়ে এসে খচ্চরের লাগাম ধরল। শ্যাম লাফিয়ে মাটিতে নেমে দুজনকে এক সঙ্গে কোলে তুলে নিল। নিম্মীর চোখে খুশির চমক, তার ছোট করে কাটা চুল কাঁধের ওপর ছড়িয়ে আছে। রবির ফ্যাকাশে গালে লাল ছোপ ধরল, সে দুহাত দিয়ে দাদার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার জন্যে ছুরী এনেছ?'

'আর আমার মটোর?'—নিম্মীও সঙ্গে সঙ্গে বলল।

শ্যাম একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর দুজনকে আস্তে নামিয়ে দিয়ে শ্যাম বলল, 'এবার আমাকে রাস্তাটাতো দেখা···।' একটা বাগানে মন্নো আর শমসাদ গাছ, রজনীগন্ধা আর হলুদ চ্যামেলীর ফুল। তীব্র গন্ধে শ্যামের তন্দ্রাভাব কেটে গেল আর তখনই ও দেখল বাগানের মধ্যে একটা ছোট বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুখে বসন্তের দাগওলা একটা লোক মুচকি মুচকি হাসছে। রবি ওর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলল, 'বড়দা এসে গেছে।' বসন্তের দাগওলা লোকটি শ্যামকে সেলাম করল। সেলামের জবাব দিয়ে শ্যাম এগিয়ে গেল। ওখানে ছোট একটা বাগিচা, নতুন করা হয়েছে মনে হয়। বেশ দূরে দূরে লাগান ছোট ছোট গাছ। চারপাশে কাঠের রেলিং, আর তার সামনেই একটা বড় বাংলো, যার পাশের দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা পাহাড়ী ডুমুর গাছ, আর সেই সঙ্গে ফলের ভারে ঝুঁকে পড়া কয়েকটা নাশপাতি গাছ। গোলাম হুসেন পাশ কাটিয়ে চলে গেল, আর নিম্মী-রাধা আগের মতই চেঁচাতে চেঁচাতে ভিতরে ঢুকে গেল বাংলোর।

শ্যাম মা-বাবাকে প্রণাম করল গিয়ে। মায়ের চোখে জল চিকচিক করে উঠল, আর ওর বাবার ঠোঁটে এমন এক সজল হাসির তরঙ্গ খেলে গেল, যাঁকে চোখের জল এবং মুচকি হাসির মাঝামাঝি এক কম্পনের মতো মনে হচ্ছিল। মা-বাবাকে প্রণাম করার সময় কী জানি কেন হঠাৎ তার কলেজ ক্যাম্পাসের কথা মনে পড়ে গেল। কলেজের মাঠে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। আর তার তলায় পাতা একটা বেঞ্চের ওপর বসে ও ইস্তিলাকে প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইস্তিলা বলেছিল তুমি আমাকে ভুলে যাবে। তার উত্তরে শ্যাম বলেছিল কেউ কি তার নিজের প্রাণকে ভুলে যেতে পারে।···তবে খৃষ্টান মেয়েদের ভালবাসায় কি বিশ্বাস করা যায়। ওর এই স্থূল রসিকতায় ইস্তিলার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল, আর এই বেআদপির জন্যে শ্যামকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে হয়েছিল···কিন্তু এই উঠোনে এই সময় হঠাৎ কেন ইস্তিলার কথা মনে পড়ছিল শ্যামের?

হঠাৎ কানে এল ওর মায়ের গলা, 'বাবা, এই তোমার মাসী ছায়া দেবী।' লম্বা, এক হারা গঠনের এক মহিলা ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।' তাঁর দেহলতায় যৌবন আর নারীত্বের আভা। হ্যাঁ, চোখের নীচে হালকা রেখাও দেখা যাচ্ছে, শ্যামের মনে হল, নিজের যৌবন কালে মহিলা সৌন্দর্য্যের প্রতিমা ছিলেন নিশ্চয়ই···মারও আশ্চর্য ব্যাপার, যেখানে যান আমার জন্যে পিসী, মাসী, কাকী, বোন খুঁজে বের করেন। মাসী! এখনও এর শরীরের বাঁধুনী রঙ-রূপ এমন যে অনেককে মুগ্ধ করে দিতে পারেন।

ছায়া দেবী বললেন, 'আর এই তোমার বোনে, বন্তী।' সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে। নিজের নাম শুনে লজ্জায় আরও পিছিয়ে গেল। তারপর ও হাত দুটো জড়ো করে চোখ নামিয়ে নিল এবং শ্যাম বন্তীকে দেখে সব কিছু ভুলে গেল সেই মুহূর্তে।

মা বলে চলেছিলেন, 'আর এই তোমার কাকীমা মথুরা দেবী, আর এই কাকীমা হলেন হুসনা বেগম, এখানকার নায়েব-তহশীলদারের স্ত্রী। আর ইনি হচ্ছেন পণ্ডিত গিন্নী মাতাজী, স্বরূপকিষণজীর পরিবারের। ও হচ্ছে করিম মালীর আম্মা। বাবা, এঁদের সবাইকে প্রণাম-ট্রণাম করো···সন্তরাম···বসন্তরাম···, মরে গেছে নাকি সব। এই ঘরে শ্যামের জন্যে খাট পাত তাড়াতাড়ি, আর দেখ, বিছানার ওপর ওই চাদরটা পাতবি, যেটাতে এই মাত্র নিম্মী আর বিন্তী মিলে ফুল তুলেছে। তা বাবা, রাস্তায় কোনো কষ্ট হয় নি তো? এই জন্যেই গোলাম হুসেনকে আমি পাঠিয়েছিলাম। ভাবলাম, জায়গাটা তোমার কাছে নতুন, পথে কষ্ট যাতে না হয়। এমনিতে জায়গাটা বেশ ভাল, কিন্তু···।'

মা একটার পর একটা কথা বলে চলেছিলেন। যে-সব মহিলারা শ্যামকে দেখতে এসেছিলেন এবার তাঁরা যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন। উঠোনে বেশ হৈ চৈ হচ্ছিল কিন্তু ঐসব মুখ আর শব্দের সমূহের মধ্যে একটি মুখই বিশেষ ভাবে মনে পড়ছিল শ্যামের। নিজের অজান্তেই সে বন্তীর লজ্জানম্র চোখের দিকে তাকাচ্ছিল। বন্তী যেন ছায়া দেবীরই যৌবন—তাঁর প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের পূর্ণরূপ, এবং হয়তো

তার চেয়েও কিছু বেশি সেই মিষ্টি হাসি, যা বন্তীরই নিজস্বতা। ওর হাসির ভঙ্গীটি খুবই একান্ত। ঐ লোকজনের মধ্যে দুটি লাজনম্র চোখের দৃষ্টি উজ্জল হয়ে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল সেই ভীড়েরই মধ্যে।

সবাই চলে যাবার পর যখন ছায়াদেবীও যাবার উদ্যোগ করছেন তখন শ্যামের মা বললেন, 'বোন, একেবারে খাওয়া-দাওয়া করেই যাও। তুমি তো মাংস খেতে পছন্দ কর, আর আজ···আজ মাংস আর ভাত হয়েছে, সঙ্গে কদনের আচার।'

শ্যাম নিজের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে কোমর সোজা করার জন্যে খাটে শুয়ে পড়ল। নিজের থেকেই চোখ বুজে এল। একটা খুট করে শব্দ হতেই ওর ঘুম ভাঙ্গল, দেখল খাটের কাছে বন্তী দাঁড়িয়ে, চোখ পড়তেই বলে উঠল, 'আমার জুতোর আর একটা পাটি পাচ্ছি না।'

খাটের তলা থেকে জুতোটা খুঁজে বের করল শ্যাম, বন্তী তাড়াতাড়ি সেটা পরতে লাগল। কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে তার। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি ও ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিল ততই ফিতেটা ফুটো থেকে ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। 'উঁহ' বলে বন্তী পা ছুঁড়ল।

'দাও, আমি ফিতে বেঁধে দিচ্ছি।'

পায়ের জুতোর ওপরে ফিতেটা সুন্দর ফিট করে গেল। ওপরে ছিল দুটো গোল চাকতি। চাকতি দুটোর ওপর নজর পড়তেই ওর চোখের সামনে জলকুণ্ডের ধারে জল নিতে আসা যুবতীটির ব্যাকুল দৃষ্টিটা ভেসে উঠল। অশ্বত্থ গাছের তলায় পাতা বেঞ্চি আর ইস্টিলার গোলাপী গাল···আর নিজের আঙ্গুলে উষ্ণ শোণিত প্রবাহের জ্বালা অনুভব করতে লাগল··কিন্তু ফিতে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল বলে বন্তী তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল,—শ্যামের মনে হল সে যেন বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেছে; যেন ও ধনুক থেকে তীরকে বের হতে দেখেছে, কিংবা অন্ধকার আকাশে তারা খসতে দেখলো—আলোর একটা রেখা যেন টানা হয়ে গেল তার মনের আকাশে।

খাওয়া সেরে শুতে গেল শ্যাম, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোর সেই রেখাটা তার চোখে ভাসতে লাগল।

৩

পরদিন সকালে একটু তাড়াতাড়িই ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওর ঘরের জানলা পূব দিকে খোলা যায়। তারারা এখনও পূর্ণমাত্রায় বিবর্ণ হয়ে আসে নি এবং দূর দিগন্তে কালাধারা পাহাড়ের শিখরে প্রভাতী তারা ঝিকমিক করছিল। জানলার আশেপাশে লতানে গাছ যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। লতা গাছের চওড়া-চওড়া সবুজ পাতার ওপর শিশিরের বিন্দু। আঙ্গুরের গুচ্ছের আড়ালে একটা বুলবুলি পাখিকে শুয়ে থাকতে দেখল শ্যাম। পাখিটার ঠোঁট আঙ্গুরের দানাতে ঠেকে আছে, মনে হচ্ছে ওর পাখাগুলোও শিশিরে ভেজা। আড়ামোড়া ভেঙ্গে শ্যাম বিছানা ছেড়ে বাইরে এল এবং বাগানে ঢুকল। এই তহশীলটা খুব সুন্দর জায়গাতেই করা হয়েছে—মনে মনে ভাবল শ্যাম—বেশ কয়েক একর জমি। চারদিকেই বিস্তৃত বাগান, মধ্যে অফিস আর তহশীলদারের বাংলো বাড়ী। সামান্য একটু দূরে আর একটা ছোট মতন বাংলো। একদিকে চাকরদের থাকার কোয়ার্টার, সেটা ছাড়িয়ে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা মকাইয়ের ক্ষেত এবং দূরের উপত্যকায় লকলকে ঘাস। উপত্যকার নিচে নামলে ধানক্ষেত, তারপর সেই মান্দরের নদী এবং তারপরে সেই রাস্তা, যেটা দিয়ে কাল ও এখানে এসেছে।

এখন চারপাশে গভীর নিস্তব্ধতা ছেয়ে আছে। বাগানে মরসুমী ফুলের কেয়ারীগুলো রঙীন সতরঞ্চির মতন বিছানো। কাশ্মিরী আপেলে এখনও গোলাপী রঙ ধরে নি, আর ফ্রেঞ্চ আপেল তো একেবারেই সবুজ। কাছেই পীচ গাছের একটা ছোট দল। সেই সঙ্গে মৌরী গাছের চারা। সেগুলো ছড়ালে পর নিলোফরের কাঁটা ভরা বোঝা। এখানকার সবুজতা এতই বেশি আর ছায়া এত ঘন যে, এই জায়গাটাকে বাগানের মধ্যেই একটা আলাদা, অন্ধকারময় নির্জন স্থান বলে মনে হচ্ছিল। মালী যে কেন এদিকটায় নজর

দেয় না কে জানে, এখানে একটুখানি জায়গা যদি পরিষ্কার করে ইঁট বাঁধিয়ে চত্বরের মতন করে দেয় তবে দুপুর বেলায় বই পড়ার সুন্দর জায়গা হয়ে উঠবে···এই ভাবতে ভাবতে শ্যাম ওপর থেকে নিচে নামতে লাগল। ভিজে ভিজে লম্বা ঘাসে পিছল ভাবটা বেশি থাকায় সে বেশ তাড়াতাড়ি উপত্যকা থেকে নিচে পৌঁছে গেল। এখানে একটা সরু পথ বট গাছগুলো'র মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে চলে গেছে। শ্যাম ঐ পথটাই ধরল। বট গাছের সারি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ক্ষেত্রের আলের কাছে একটা যুবতীকে দেখতে গেল সে। যুবতীটি গরু-মোষ, আর ভেড়া-ছাগলের পাল ক্ষেত থেকে বের করে আনছিল। মেয়েটির পিছনে লম্বা মতন এক যুবককে দেখতে পেল শ্যাম। তার রঙ ফরসা। চোখ দুটি ভারী সুন্দর, গোঁফের প্রান্ত দুটি ওপর দিকে তোলা। যুবকটির পরণে ছিল সাদা রঙের সালওয়ার আর ওপন-কলারের কামীজ। যুবতীটির কানে কিছু একটা বলেই সে উল্টো দিকে ফিরে ওপরে উঠতে লাগল। পাশ ফেরার সময় শ্যাম ওর ঘাড়ে বা চোয়ালের পাশে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন দেখতে পেল। যুবতীটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং সে শ্যামের দিকে অবাক ও সেই সঙ্গে রাগত দৃষ্টিতে তাকাল। যুবতীটির মাথায় কিছু ছিল না এবং সে কাল রঙের মোটা কাপড়ের কুরতা আর ওই কাপড়েরই ভারী সালওয়ার পরেছিল। খালি পা, আর হাতে ছড়ি। গায়ের রঙ ফরসা আর চোখের গঠনটা ভারী আকর্ষণীয়। চিবুকটা গোল নয়, বরং এমন সুন্দর ভাবে একটু নোয়ানো যে মনে হয় যুবতীটি সংকল্পে খুব দৃঢ়। ও এমন ভাবে শ্যামের দিকে তাকাল যে সে মুহূর্তের জন্যে কুঁকড়ে গেল।

শ্যাম বলল, 'এ রাস্তায় এসেছ কেন? এই রাস্তাটা আমাদের বাড়ী হয়ে যায়···তুমি কোথায় যেতে চাইছ?'

'আমি···আমি নদীতে যেতে চাই, আর···'

'আমি তহশীলদার সাহেবের ছেলে। কাল···কালকেই এসেছি এখানে। মাফ করবেন, আমাকে পথটা বলে দিন।'

যুবতী চোখ নামিয়ে নিল। শ্যাম ওর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

'তোমার নাম কি?'

'আমার নামে তোমার কি দরকার?' উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল মেয়েটি।

'উনি বোধ হয় আপনার স্বামী। ঐ ধপ্‌ধপে ফরসা জোয়ান পুরুষটি, যার গলায় আঘাতের চিহ্ন আছে। যে এইমাত্র আপনার কাছ থেকে চলে গেল···', শ্যাম খুব ভদ্রভাবে কথাটা বলল।

'না, ও এখানকার দারোগা, ইয়ার অহমদ খাঁ। সেও আপনার মতো পথ ভুলে এদিকে চলে এসেছিল,' উত্তর দেবার সময় ওর মুখ আকর্ন লাল হয়ে উঠেছিল এবং খুব জোরে জোরে মহিষগুলোকে পেটাতে লাগল।

নদীতে পেঁছে সে পশুর পালকে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। এখানে নদীর বুক বেশ প্রশস্ত, যেখানে-সেখানে নীল রঙের পাথর মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে। গরু-মহিষ এখান দিয়েই যাচ্ছিল। এখান থেকে একটু ওপরে প্রায় একশো গজ দূরে একটা বড় মতন বাঁধ আছে, মনে হচ্ছিল জল যেন ওখানে ঘুমোচ্ছে। এই বাঁধের ওপর একটা ঢালু জায়গা থেকে জল গড়িয়ে এসে বাঁধে জমা হয়। 'এই বাঁধটার নাম কি?'

'সন্‌থাল।'

'সাঁতার কাটার পক্ষে খুব ভাল জায়গা মনে হচ্ছে।'

'কি বললেন?'

'কিছু না; আই অ্যাম ভেরী সরি।'

মুচকি হেসে যুবতী বলল, 'আমি এখানে রোজ স্নান করি, আর ওপরের ঐ পাথর থেকে লাফাই। তখন এখানে আর কেউ থাকে না। আজ তুমি এসে গেছ। হতে পারো তুমি তহশীলদারের ছেলে, কিন্তু তোমার উচিত নয় আমাদের মতো গরীবদের উত্যক্ত করা।'

শ্যাম বলল, 'তুমি তোমার নামটা আমাকে বলে দাও, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। আমি তো এমনি সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, কোনো কাজ ছিল না, আর···তাছাড়া নাম বলতে ক্ষতিটাই বা কি?

তুমি না বললে আমি তহশীলদার সাহেবের কাছ থেকে জেনে নেব।'

'নূরাঁ', ছড়িটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ও বলল।

শ্যাম ফিরে এলো।

৪

জনসংখ্যার বিচারে মান্দর একটা গ্রাম। কিন্তু তহশীলের প্রধান জায়গা হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে শহরের সব কিছুই এখানে উপস্থিত। থানা, তহশীল, হাসপাতাল, শুল্ক বিভাগের পাহারার ব্যবস্থা, জঙ্গলের স্থানীয় অফিস, মদ আর আফিমের দোকান অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান বিভাগগুলো এখানে আছে। বাজারে সোডা-ওয়াটারের একটা দোকানও আছে। এই বাজারটা ছিল রোড়ী-নালা আর মান্দর নদীর মাঝখানে অবস্থিত সরু একফালি নিচু জমিতে। যেটা তুবার বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু কি জানি কেন এই জায়গাটা দোকানদারদের কাছে এত প্রিয় ছিল যে বার বার তুবার নিজেদের সব কিছু বন্যার চরণে উৎসর্গ করা সত্ত্বেও তারা আবার এখানেই দোকান দিয়েছে।

আসলে রোড়ী-নালা আর মান্দর নদীর সঙ্গমস্থল থেকেই মান্দর গ্রামের সীমা শুরু হচ্ছে। এইজন্যে বাজারটা খুবই সুবিধেজনক জায়গায় ছিল, কারণ বাইরে থেকে ব্যবসায়ী আর কৃষকরা সবার আগে এই বাজারেই আসত, কিন্তু তার আগেই সরকারী অফিসারদের কবলে পড়ত ওরা, তারপর বাজারের লোকেদের খপ্পরে পড়ত, এবং সকলেই ওদের টাকা মেরে দিত। রোড়ী-নালার ওপারে ছিল ছায়ার বাড়ী আর তার ভাইয়ের দোকান। এইভাবে রোশন আর তার বোন গ্রামের সীমার বাইরে বাস করছিল। ওদের বাড়ীর খুব কাছে মান্দর নদী এক বিপজ্জনক বাঁক নিয়েছে। নদীটা উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত। মাইলের পর মাইল বিস্তৃর্ণ মাঠ ছড়িয়ে আছে, আর বহুদূরে পূর্ব দিগন্তে নীলাধারী পর্বতের চূড়ো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

বাজারের পশ্চিম দিকে একটা প্রশস্ত মাঠ। এই মাঠটা চারণভূমি

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্যুর করতে আসা অফিসারদের ক্যাম্প এখানেই পড়ে আর যখন কোনো মেলা বসে তখন সকলে এখানে এসেই জমায়েত হয়। এই মাঠ ছাড়িয়ে পশ্চিমদিকে আর একটা উঁচু পাহাড়ী টিলার ওপর পণ্ডিত স্বরূপ কিষণের বাড়ী। এখানে আরো অনেক ব্রাহ্মণের বাড়ী আছে। টিলার ঢালু অংশেও ধান আর ভূট্টার ক্ষেত আছে। এই চড়াই উঁচু হতে হতে একদিকে রহড়ে গ্রামে গিয়ে মিশেছে, আর অন্যদিকে উৎরাই নামতে নামতে মান্দরের বড় মাঠ পর্যন্ত চলে গেছে, যেখানে আছে তহশীল, সরকারী অফিস ইত্যাদি। এখানে আছে সাহুকারী-মহাজনদের বাড়ী। দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ঢালটা কমতে কমতে একদিকে একটা ছোট মতন মাঠে গিয়ে মিশেছে, যার শেষ প্রান্তে মান্দর নদী পাক খেয়ে এসে মিশেছে। মনে হয় মান্দর গ্রাম এককালে দ্বীপ ছিল। যার তিন দিকে এই নদী আর পশ্চিমদিকে রহড়ে গ্রামের পাহাড়। দক্ষিণ-পশ্চিমের এই মাঠে তিনটে পরিষ্কার জলের ঝর্ণা প্রবাহিত। গ্রামবাসীদের চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায় এই ঝর্ণা তিনটির নামকরণে। সব চেয়ে বড় ঝর্ণার নাম ছিল 'ছোয়ারা' অর্থাৎ খেজুর। তার চেয়ে ছোটটার নাম 'বাদাম'। তৃতীয় এবং শেষ ঝর্ণাটিকে লোকে ডাকত 'মোতিচুর' বলে। মোতিচুর এবং অন্য দুটি ঝর্ণার জল ক্ষেত্রগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মান্দর নদীতে গিয়ে পড়েছে। এখানে আছে গাছের একটা ঝাড় আর দুটো জলচক্র ( জলের স্রোতের সাহায্যে চালিত গম ভাঙ্গানোর চাকি )। গাছের ডালে দোলনা বাঁধা এবং গাছের ছায়ায় রাখালরা তাদের গরু ছাগল নিয়ে শুয়ে থাকে দুপুর বেলায়। মাঝে মাঝে যখন খেয়াল চাপে তখন মেয়ে-রাখালিরারা দোলনা খুব জোরে জোরে দুলিয়ে গাছের পল্লব ছোঁবার চেষ্টা করে। রাখালরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মাছ ধরতে চেষ্টা চালায় আর কয়েকজন তো এই কাজে এত দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে হাত দিয়ে ধরে বা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে জলের মধ্যেই মাছদের ঘায়েল করে দিতে পারত, এমন কি ওই মাছগুলো আধমরা হয়ে জলের ওপরে ভেসে উঠত। তারপর ওখানেই কোথাও উনুন ধরিয়ে জল-চাকীওলাদের

কাছ থেকে চাট্ চেয়ে এনে মাছ ভেজে খেত। সঙ্গে ভুট্টার রুটি, কাঁচা লংকা আর পেঁয়াজ।

শ্যাম চিন্তা করছিল এই রাখালদের জীবনে যেখানে কালো মোষগুলো আর্তনাদ করে আর ছেঁড়া ফাটা কাপড়ে দিন কাটে মানুষের সেখানে আলগোজোদের জংলী সঙ্গীত, বেপরোয়া উদ্দামতা এবং বিধি-নিয়মের বন্ধন মুক্ত প্রেমের এক অনন্ত সম্ভাবনাও বিদ্যমান। সে মনে মনে নিজের সভ্য শহুরে জীবনের সঙ্গে এই বর্বর জীবনের প্রসন্নতার তুলনা করতে শুরু করল।

৫

এটা ওর এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, রোজ দুপুরে খাওয়ার পর ওই গাছের ঝাড়ের তলায় এসে বসে, আর কিছু একটা বই পড়ে। করিম মালীকে বলে ওখানে একটা ছোট চত্বর বানিয়ে নিয়েছে শ্যাম। ঐ জায়গাটা বাগানের থেকে একটু আলাদা এবং সম্পূর্ণ এক কোণে ছিল। দুপুরটা বই পড়ে বা ঝিমোতে-ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়েই কেটে যেত। কখনো কখনো ডাল থেকে পীচ পেড়ে ছুরী দিয়ে কেটে খেতো। মৌরীগাছের হালকা সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে মনে হয় এবং মাঝে মাঝে পাতার আড়াল থেকে বুলবুলি পাখি ডেকে উঠে। প্রকৃতিকে অত্যন্ত রঙীন আর সুন্দর দেখতে লাগে এবং নিজের মনের গভীরে শ্যাম এক ধরণের সুখের আনন্দ আর নেশার মতো ঘোর অনুভব করতো।

হঠাৎ ওর কানে আওয়াজ ভেসে এলো, 'সেলাম বাবুজী।'

শ্যাম চোখ খুলল। বুলবুলের গান দূরে বিলীন হয়ে গেল। একটা মেয়ে মানুষ হাতে কাস্তে নিয়ে মৌরী গাছগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে। সে যুবতী, কিন্তু যৌবনেই প্রৌঢ়ত্বের ছায়া উঁকি মারতে শুরু করেছে। ও যেন সময়ের আগেই যৌবনবতী হয়ে উঠেছিল এবং এখন সময় হবার আগেই যৌবরাজ্য থেকে নির্বাপিত হয়ে প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশ করতে চাইছে।

ওর কপাল চওড়া, সোজা সিঁথি, কিন্তু কানের ওপর চুলগুলো অগুণতি বিনুনীতে গাঁথা। ওই বিনুনীগুলো গেঁথে ও তার কানের ওপর আটকে রেখেছে। কপোলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমের আভাস, ঠোঁটের রং নীলাভ। চোখ এখন সুন্দর। কিন্তু ভ্রুর প্রান্তে চোখে, এমন কি সারা মুখমণ্ডলে এমন এক নৈরাশ্যের ছায়া ফুটে উঠেছে, যে মনে হয় এই নারী জীবনে বহু উত্থান-পতন দেখেছে। গলার চামড়া ঢিলে হয়ে এসেছে, আর সেটা চাপা দেবার জন্যে সে হলদে পুঁতির ছয় নড়ীর মালা পরে থাকে। এই রকম মালা কোনো এক যুগে রানী 'মেরীর' ছবিতে দেখা যেত। লালছিট কাপড়ের কামিজের নিচে আনত স্তন। রঙ কোনো এককালে ফরসা ছিল, এখন মনে হয় কে যেন তাতে কাদা মিশিয়ে দিয়েছে।

'আমার নাম সইদা। করিম মালীর বৌ আমি', সে কাস্তেটা দোলাতে দোলাতে বলল, 'আব্বাজী আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন মৌরীর এই গাছগুলো কেটে ফেলতে।'

'আচ্ছা, তাহলে তুমিই সইদা!' শ্যাম গোলাম হুসেনের কাছে সইদার ইতিবৃত্ত শুনেছিল, কিন্তু এর আগে দেখেনি। হ্যাঁ, এই ধরণের মেয়ে মানুষই সইদা হতে পারে। 'আচ্ছা, তাহলে তুমিই সইদা।' সে নিজের কথাগুলোর ওপর জোর দিয়ে বলল যাতে সইদা জেনে যায় যে সে ওকে আগে থাকতেই চেনে—'আবদুলের বিবি।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ!' সইদা চোখ নামিয়ে নিল, আর নিজের কুর্তার একটা প্রান্ত ধরে টানতে লাগল।

'এসো, বোসো', শ্যাম বলল, 'খালি খেয়াল রেখো, যাতে মৌরীর সব গাছগুলো কেটে না ফেলো, তাহলে এই কুঞ্জের সমস্ত সুগন্ধ চলে যাবে। একটু একটু করে শুধু ছেঁটে দিও।'

সইদা মৌরীর গাছ কাটতে শুরু করল। একটু পরে কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই শ্যাম হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, 'শুনেছি, তুমি তোমার বিয়ের কিছুদিন পরে পুলিশের একটা সিপাহীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি ?' ও যেন বেশ বিব্রত হয়েছে এমন ভাবে উত্তর দিল।

'তারপর কি হল ? তুমি ফিরেই বা এলে কেন ? ওই লোকটাই কি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিল, নাকি তুমিই ওকে আর ভালোবাসলে না ?

গাছ কাটা বন্ধ করে সইদা কাস্তেটা মাটির ওপর রেখে বলল, 'ওর সঙ্গে আমার প্রেম ছিল এবং তখন সেই দিনগুলোও একরকম ছিল···' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথাটা শেষ করল সে,—যখন ও আমাকে খুব ভালোবাসত।'

'তারপর ?'

'আমরা দুজনে এখান থেকে পালিয়ে গেলাম। ও পুলিশে চাকরী করত। ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট হয়ে গেল। এটাতো ভাগিয়ে নিয়ে যাবার কেস ছিল। আমি তো অন্যলোকের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলাম। আমরা দুজনেই ছিলাম দোষী। জঙ্গলে তাড়া খেযে ফিরতাম। তারপর আমরা এখান থেকে পালিয়ে অন্য এলাকায় চলে গেলাম, যেখানে কেউ আমাদের চিনত না।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করল।

আবার সইদা বলতে শুরু করল, 'আমি তো গরীব বাড়ীর মেয়ে ছিলাম। মেহনত-মজুরী করতে পারতাম। কিন্তু ও তো পুলিশে ছিল, মুফতে পাওয়া মাল ওড়াতে আর লোককে ধমকাতে ওর খুব ভাল লাগত, কিন্তু এক পলাতক অপরাধীর মতো ওকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। চাকরী চলে যাওয়ার দুঃখও ওর ছিল।'

'কিন্তু তখনো তো ও তোমাকে ভালোই বাসত ?'

'হ্যাঁ, খুব ভালোবাসত বৈকি।' তিক্ত স্বরে বলল সইদা, 'আমাকে দিয়ে খাটাতো, প্রত্যেক দিন মারতো, আর প্রতি রাতে···সঙ্গে শুতো ···কিছুদিনের মধ্যেই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন আমি ওকে ছেড়ে পালিয়ে আসি। এখানে আমার স্বামী, কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করেন নি আমার সঙ্গে,' সইদা একেবারে চুপ করে গেল এবং গাছগুলো

ছাটতে শুরু করল।

শ্যাম বলল, 'কথাটা সত্যি, শুধু ভালোবাসায় পেট ভরে না। প্রেমও, তা সে যত পবিত্রই হোক না কেন, শুধু একসঙ্গে শোয়ার সাহায্যে বাঁচতে পারে না। প্রেমের জন্যে পেটকে বাদ দেওয়া যায় না, কি বলো?'

'হ্যাঁ বাবুজী, যতক্ষণ না পর্যন্ত পেট ভরা থাকে, কোনো কথাই কানে ঢোকে না।...কিন্তু মানুষ তার যৌবনে...যখন রক্তে উন্মাদনা থাকে, তখন কোনো না কোনো সময়ে এই ধরণের কাজ করে বসে, যার জন্যে সারা জীবন অনুশোচনা করতে হয় তাকে...এই আপনাদের এখানে যে ছায়া এসেছিল, তার ব্যাপারেও ঐ রকম একটা ঘটনা ঘটে ছিল।'

'ছায়া মাসীর জীবনে?' শ্যাম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ!', সইদার স্বরে বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং ঈর্ষাযুক্ত প্রসন্নতার ছায়া, 'আপনার এই ছায়া মাসীরই জীবনে! ও আগে তার স্বামীর সঙ্গে গৌরাহ মৌজায় থাকত। ওখানে ওর মাস্টারমশাই আমজাদ হুসেনের সঙ্গে প্রেম হয়ে যায়, উনি এখন এখানকারই একটা স্কুলে পড়ান। বহুদিন এই নিয়ে লোকে আলোচনা করেছিল। ছায়া বাড়ী থেকে পালিয়ে আমজাদের সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে পর্যন্ত এসেছিল, কিন্তু পরে ওর স্বামী খুব চেঁচামিচি শুরু করায় আমজাদ হুসেনকে চুপি চুপি গৌরাহ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। আপনি জানতেন না একথা?'

'না তো।'

'সারা গ্রাম একথা জানে। সমাজ এগুলোকে ভাল চোখে দেখে না। গ্রামের বাইরে রোড়ী নালার ওপারে ও নিজের বাড়ী তৈরী করেছে। ওর স্বামী ছেড়ে দিয়েছে ওকে, এখন ও নিজের মেয়ে বন্তীকে নিয়ে থাকে। জিয়ালাল ওর বড় ভাইয়ের নাম। সে এই মা-মেয়ের দেখাশোনা করে, তা নাহলে সমাজের লোকেরা যদি সে রকম মনে করে তাহলে একেবারে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেবে। এই ব্রাহ্মণগুলো অত্যন্ত বদমাশ। তবে সত্যি কথাটা এই যে ঐ ছায়াও এক অদ্ভুত মেজাজী মেয়েমানুষ। কার সাধ্য ওর মাথা নিচু করায়। ওর স্বামী

প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলেছিল, কিন্তু ও শোনেনি সে কথা। এমন কি সমাজের সবাই ওকে বলেছে প্রায়শ্চিত্ত করো আর ওর মেয়ের সঙ্গে পণ্ডিত স্বরূপকিষণের ছেলে দুর্গাদাসের সঙ্গে বিয়ে দাও। কিন্তু ঐ মেয়েমানুষটা না প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী, না মেয়ের বিয়ে দিতে দুর্গাদাসের সঙ্গে। গ্রামের বাইরে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে ওর আলাদা দোকান আছে। ও নিজে দোকানে বসে এবং খদ্দেরদের সামলায় খুব দক্ষতার সঙ্গে। আর দেখুন না, এখানকার সমাজ অসন্তুষ্ট হলে কি হবে ও নিজের পাল্লা সমান রাখবার জন্যে এখানকার সব সরকারী অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে রাখে। দেখেছেন তো আপনাদের বাড়ীতেও কী ভাবে যাতায়াত করে। মাসী হয়ে গেছে, ডাইনী কোথাকার, কুটনি! সব সময় কেমন ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে। আগেকার তহশীলদারের পরিবারের সঙ্গেও এই ভাবে মাসী-পিসী সম্পর্ক পাতিয়ে ছিল। অন্যান্য অফিসারদের বাড়ীতেও নির্বিবাদে যখন তখন যায় আসে। দেখেছেন তো উড়নীটা কিভাবে সামলে-সুমলে গায়ে জড়ায়, একটা পাল্লা গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলে। কেমন সুন্দর কোমর দুলিয়ে হাঁটে, ধোপানীদের মতো। ওর চাল-চলন আমার ভাল লাগে না। আসলে মেয়েমানুষদের কিছুটা লজ্জা-শরম থাকা উচিত, কিন্তু এতো লাজ-লজ্জা সব বিসর্জন দিয়েছে।

শ্যাম সইদার মেয়েমানুষ-সুলভ ঈর্ষায় কান না দিয়ে বলল, 'কিন্তু ও কেন এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মেলামেশা করে না? শেষ পর্যন্ত তো ওকে এই গ্রামেই থাকতে হবে এবং এদেরই সঙ্গে। অফিসাররা তো আজ আছে কাল নেই। তাছাড়া সরকারী কর্তাব্যক্তিদের ব্যাপারটাই আলাদা! প্রায়শ্চিত্ত করেই নিক না কেন, অসুবিধেটা কোথায়? 'কেমন করে করবে প্রায়শ্চিত্ত...?' সইদা আরো খানিকটা সরে এল কাছে, বলল, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, এখনও আমজাদ হুসেনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। ও হয়ত এর জন্যে অত চিন্তা করে না, কিন্তু মেয়েমানুষটা ওর জন্যে প্রাণ দেয়। আমজাদ হুসেন এখনও ওর বাড়ী যাতায়াত করে। ছায়াও ওর খাতির যত্ন

করে। টাকা-পয়সার দরকার পড়লেও ছায়া না বলে না। আমজাদ হুসেন বিবাহিত, শুনেছি ওর ছেলে আপনাদের লাহোরে পড়াশোনা করে। ছায়া ঐ ছেলেটার জন্যেও খরচ পত্র দেয়। মালদার মেয়ে মানুষ···হ্যাঁ!' 'খুব ভাল' দোকান চালায়। বড় বড় চালাক-চতুর মহাজনদের কান কাটে। আমার তো মনে হয় ওর ভাই জিয়া লালের দোকান তত ভাল চলে না। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে খদ্দের ভোলায়।'

শ্যাম বলল, 'প্রায়শ্চিত্ত করার কথা কে আর তুলবে, ও যদি বন্তীর বিয়ে স্বরূপ কিষণের ছেলের সঙ্গে দিয়ে দেয়, তাহলেই তো শান্তিতে কাটাতে পারবে।'

সইদা শ্যামের কথায় সায় দিয়ে বলল, 'বাবুজী, এমনি যদি দেখেন, তাহলে এতে আর অসুবিধে কোথায়। পৃথিবীতে এমনিই তো হয়। আর এই পণ্ডিত স্বরূপকিষণের কথাই ধরুণ না কেন, এমন ছোটলোক জীবনে আমি আর একটাও দেখি নি। এমনিতে সব সময়েই দেখতে পাবেন কপালে তিলক কাটা। সাদা আচকান, সাদা চাদর···ঠোঁটে গম্ভীর স্মিত হাসি। দেখলেই কি ধার্মিক মনে হয়। কিন্তু বাবুজী, কী বলব আপনাকে—বড় বদমাস লোকটা। সর্বদা সব কিছুই জানে। এই গ্রামের বাচ্চা-কাচ্চারাও সব জানে। আপনি কি জানেন পণ্ডিতজী কেন নিজের ছেলের সঙ্গে বন্তীর বিয়ে দিতে চাইছেন? এইজন্যেই যে আর কেউ ওর ছেলে দুর্গাদাসকে মেয়ে দিতে রাজী নয়। উনি যদিও এখানকার ব্রাহ্মণ সমাজের মাথা, কিন্তু অন্য কোনো সম্বন্ধ পর্যন্ত আসে না। সকলেই এঁর ছেলের ব্যাপারে পাশ কাটাতে চায়। আপনি দেখেছেন দুর্গাদাসকে—ডান চোখ কানা, ল্যাংড়া পায়ে ঘেঁসটে-ঘেঁসটে হাঁটে। ভারী কদাকার চেহারা ওর।'

কথাটা বলে সইদা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। কিন্তু তখনই আবার ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে হাসি বন্ধ করল। মুচকি হেসে বলল, 'এমনি আপনার কত সময় নষ্ট করে দিলাম, আর আমাকেও এখন পুরো মাঠটা ঠিক করতে হবে।'

ওর হাত দ্রুত চলতে শুরু করল।

জুলাইয়ের শেষ দিকে যখন উপত্যকায় লম্বা লম্বা ঘাসে শীষ বেরোতে শুরু করল, সবুজ নাসপাতিতে মিষ্টি রস আসতে শুরু করল এবং লালচে হতে শুরু করল আপেল—তখন নায়েব তহশীলদার শ্যামকে শিকার করতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বন্দুক ভাল চালাতে পারলেও, শিকার করতে তেমন আনন্দ পায় না শ্যাম এবং গাছের ওপর উঁচু মাচানে বসে জঙ্গলের নিরীহ প্রাণীদের গুলী চালিয়ে হত্যা করাটাতে সে মানুষের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলেও মনে করে না। নায়েব তহশীলদার আলিজু যতোটা সুশিক্ষিত ও ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ঠিক ততটাই ছিলেন নিপুণ শিকারী। এবং দশ-পনের দিন অন্তর-অন্তর শিকারে যাওয়াটাই ছিল তাঁর অভ্যেস। এবার শ্যাম এইজন্যে নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করেছিল যে শিকারের জায়গাটা মান্দরের খুব কাছেই। প্রায় তিন-চার মাইল দূরে সওয়াইয়ের ঘন জঙ্গল, ওখানে তিতির, শেয়াল, শুয়োর আর ভালুক প্রচুর পাওয়া যেত। শ্যাম ভাবল, আর কিছু না হোক বন-ভোজন তো হবে। তাছাড়া নায়েব তহশীলদার আলিজুকে তার বেশ ভালও লাগত। প্রায়ই ওঁর সঙ্গে সাহিত্য, দর্শন নিয়ে মুখরোচক আলোচনা হতো—সময় অনায়াসে কেটে যায়।

সে রাতটা ওরা সওয়াইয়ের জঙ্গলে কাটালো। একটা ছোটো উঁচু মতোন তাঁবু খাটান হলো এবং তার চারপাশে চক্রের আকারে আগুন জ্বালানো হলো। আগুনের কাছে চৌকিদারকে বসানো হয়েছিল পাহারায়, সন্দেহ জাগলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে জানাতে পারে আমাদের।

নায়েব তহশীল আলিজু বেশ মন-পসন্দ মানুষ, চওড়া কাঁধ, নাদুস-নুদুস চেহারা, মদ খাওয়ার ফলে আরও ভারী হতে শুরু করেছে শরীর, শ্যামল রঙ, চাপ দাড়ি। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়া লোক এই আলিজু সাহেব। বাঁ দিকের ঠোঁটের কোণে নিচের চোয়াল ঘেঁসে একটা দাঁত ভেঙ্গে গেছে, আর উনি যখন অন্য মনস্ক হয়ে জোরে জোরে

শ্বাস টানেন তখন ঐ ভাঙ্গা দাঁতের ফাঁক দিয়ে সিটি বাজার মতো বিচিত্র শব্দ বের হয়। দর্শন এবং সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাঁর। ডাক্তারী করারও শখ ছিল।

'আপনি হাকিম আবার কবে থেকে হলেন,' শ্যাম তাঁবুর পর্দার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বলল।

দুজনে নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে। আলিজু ঐ ভাঙ্গা দাঁতে সিটি বাজিয়ে উত্তর দিলেন, 'হুঁ।'

'বলছিলাম, আপনি ডাক্তার হলেন কবে থেকে?'

'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন শ্যামসাহেব, আমি একটু প্রাচীনপন্থী লোক। আপনি জানেন কি যে প্রাচীনকালে ডাক্তারী, দর্শন শাস্ত্র আর সাহিত্য একসঙ্গে পড়ান হতো। আসলে এই তিনটেকেই আগে একই বিদ্যা বলে মনে করা হতো। এই বিভাজন তো ইংরেজদের সময় থেকে শুরু হয়েছিল, নইলে আগে একজন চিকিৎসক কবিও হতে পারতেন, দার্শনিকও। শ্যামসাহেব এই বিদ্যার যে বিভাজন এখন আপনি দেখছেন, সেটা পশ্চিমী সভ্যতারই দোষ। জীবন নিকৃষ্টতর হয়ে চলেছে।'

'বরং এটাও তো বলা যায় যে জীবন সুন্দরতর হয়ে উঠছে। এই বিদ্যা এখন এত সম্প্রসারিত হয়েছে যে এটাকে তিন ভাগ করতে হয়েছে, এবং বর্তমানে এই সাহিত্য, দর্শন আর ডাক্তারী এতই বিস্তৃতি লাভ করেছে যে এর যে-কোনো একটাকে নিয়ে অধ্যয়ন করতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায়। এটাকে মানুষের অগ্রগতিই মনে করুন না কেন', শ্যাম উত্তর দিল।

'মানুষের অগ্রগতি না, আমি তো এটাকে বেয়াড়াপনার উন্নতি বলে মনে করি। একজন চিকিৎসক ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিকমতো চিকিৎসক হয়ে উঠতে পারেনা, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কিছুটা কবি আর দার্শনিক না হয়। আর এটাকেই আমি এক ভাল সাহিত্যিক আর দার্শনিকের পক্ষে জরুরী বলে মনে করি। বিদ্যার এই শাখা দুটি সম্বন্ধেও তার জ্ঞান থাকা উচিত, তা নাহলে তার অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ

থেকে যাবে।'

আলিজু দু-একবার হাই তুলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। অথচ শ্যামের চোখে ঘুম নেই। ও তাঁবুর পর্দা খুলে বাইরে এল, ভিতরে ওর কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একটা ইজিচেয়ারে বসলো শ্যাম। সামনের চেয়ারের ওপর নায়েব তহশীলদারের শিকারী কুকুর ঝিমোচ্ছিল, শব্দ শুনতেই চমকে উঠল; একটু গর-গর করার পরই শ্যামকে চিনতে পেরে কান ঢিলে করে আবার ঝিমোতে শুরু করল।

আগুনের চক্র থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছিল। মাঝে মাঝে আগুনের শিখা জিভের মতো ওপর দিকে লকলকিয়ে উঠছিল। বন্দুক নিয়ে দুটো চৌকিদার পাহারায়। চক্রের পরে অন্ধকারময় জঙ্গল দাঁড়িয়ে—তার সমস্ত গোপনতা আর রহস্যকে আড়াল করে—মৌন, ভীতিপ্রদ এক অন্ধকার প্রাচীরের মতো, যার মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র দেখা যাচ্ছে না, যেখান দিয়ে আলো ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

চিন্তা করতে করতে শ্যাম কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই, ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন ভোর হয়ে গেছে। অন্ধকার কমে আসছে, বাতাসে সজীব ভাব, চক্রের আগুন নিভে ছাই হয়ে গেছে। চৌকিদারও ওই চক্রের কাছে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। দূরে দুটো ছোট ছোট তাল গাছের মাঝখানে একটা ভাল্লুকী তার দুটি ছোট বাচ্চাকে নিয়ে খেলছে।

৭

আজ আপনি খুব সকালে উঠে পড়েছেন?', অলিজু প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, এই আর কি, রাতেও ঠিক মতো ঘুম এলো না।'

'হয়তো নতুন জায়গায় শোওয়ার জন্যে', আলিজু চিন্তিত ভাবটা প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, 'এমনিতে শরীর ঠিক আছে তো আপনার? আমার মতে আপনি যদি একটা জোশিন্দা (উদ্দীপক খালসা) খেয়ে নেন তো…এই জঙ্গলেই জড়ী-বুটি পাওয়া যাবে। বনফ্সার ফুল আর

পাতা, বীজ, জঙ্গলী মৌরা পুদিনা আর ফুবলুর শেকড়।। একবার খেলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

শ্যাম চুপ করে রইল, উত্তর দিল না, এবারে ওটা খেতেই হবে। না বলার উপায় নেই।

'এই হরি। হরি, রাধে, মোহন সিং, গল্লা! সব মরে গেছে নাকি, গেল কোথায়?'

মোহন সিং দৌড়ে এসে হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'কি হুকুম করছেন হুজুর?'

'দেখো মোহন', আলিজু অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত ভাবে বলতে লাগলেন, 'এর জন্যে একটা জোশিন্দা তৈরী করতে হবে। জঙ্গলেই সব কিছু পেয়ে যাবে। বনফ্সার ফুল, পাতা, বীজ আর ফুবলুর শিকড়, পুদিনা আর মৌরা—মৌরী বোধ হয় এ জঙ্গলে পাবে? যাই হোক, বাকী শেকড়-বাকড় নিশ্চয়ই পাবে। শাবাস, যাও দু'মিনিটে ওটা তৈরী করে নিয়ে এসো।'

'এই আনছি হুজুর।'

মোহন সিং চলে যাবার পর শ্যাম আলিজুকে বলল, 'দারুণ সুন্দর পুরুষ।'

আলিজু বললেন, 'রাজপুত কিনা, শরীর সম্বন্ধে ভীষণ যত্ন নেয়। শিকার খুব ভালোবাসে। মান্দরে ওর নিজের জমি আছে, একটা জল চাকিও আছে। শিকারে এলেই ওকে সঙ্গে আনি। অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের ছেলে। অভিমান আর অহংকারের তো নাম গন্ধ নেই।'

শ্যাম জোশিন্দা খেল। আলিজু খেলেন চা। তারপর গল্লা শিকারী এসে জানাল, 'হুজুর, মাচানে চড়ে পড়ুন, বিট দেওয়া শুরু করব।'

নায়েব তহশীলদার সাহেব বললেন, 'ভাই, বিট দেবার জন্যে হাঁকা-হাঁকি করার লোক তো খুবই কম আছে। যদি তুমি আর মোহন সিং মদান আর পীর গ্রাম থেকে আরও কিছু লোক-জন আনতে পারো তাহলে বিট দেওয়া বেশ জমবে, তা নাহলে তো এই মাচান বাঁধাই সার

হবে।' তারপর শ্যামের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি তো এখনো মদান আর পীর গ্রাম দেখেন নি। এই এলাকায় এ দুটোই সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম, আর পীরের থানের তো এমনিতেই এক ঐতিহাসিক মহত্ব আছে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ওখানে এক মেলা হয়। লোকে বলে ওখানে পাণ্ডবদের একটা মহল ছিল, সেই সঙ্গে পীরবাবার কবরও আছে। ফলে জায়গাটা হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই কাছে এক পবিত্র স্থান। আগস্টের ঐ মেলায় বহু দূর দূর থেকে লোক আসে। দু-তিন দিন ধরে খুব জাঁকজমক হয়।'

শ্যাম বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার একই জায়গা হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই কাছে এত প্রিয়?'

আলিজু লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বললেন, 'শ্যাম সাহেব, আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, হিন্দু-মুসলমাননের সম্পর্কটা গত বিশ বছরেই যা খারাপ হতে শুরু করেছে তবে আনো একসঙ্গে খাওয়া-বসা চলত। কি করে একই জায়গা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের তীর্থ হয়ে উঠতে পারে। তার একটা না, শতখানেক কাহিনী আছে। আমাদের গ্রামগুলোতে প্রায়ই, এবং শহরে কখন-সখনো এমন জায়গা পাওয়া যায়। আসলে আমাদের অভিজ্ঞ পূর্ব-পুরুষেরা খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ করতেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একে অপরের সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে বুঝবার পক্ষে এই স্থানগুলো অত্যন্ত মহত্ব রাখে। এখানে পীরের কবর আর পাণ্ডবদের প্রাসাদ পাশাপাশি আছে। অনন্ত নাগে মুসলমানদের প্রার্থনাগৃহ আর হিন্দুদের পবিত্র পুষ্করিণী একই জায়গায় আছে। দুজাতই নিজের নিজের পদ্ধতিতে খোদার কাছে প্রার্থনা করার সময়েও নিজেদের মধ্যে এক বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সান্নিধ্য অনুভব করতো। অনেক গ্রামে মন্দির, ধর্মশালা আর মসজিদ পাশাপাশিই দেখা যায়। তখনকার দিনে আরতি আর বাজনায় কোনো ঝগড়া ছিল না, কারণ মনের মধ্যে ঘৃণা ছিল না, আর এখন তো সেই সব জায়গাতেই বেশি ঝগড়া হয় যেখানে মন্দির-মসজিদ পাশাপাশি আছে। খোদার আশীর্বাদে ঐ অসুখ এখনও আমাদের গ্রামে পৌছায় নি। পীরের মেলায় নিশ্চয়ই

যাবেন আপনি। দেখলে খুবই ভাল লাগবে আপনার।'

'ওই গ্রামটা এখান থেকে কতো দূরে?'

'খুব একটা দূর নয়। সওয়াই-এর এই জঙ্গল থেকে একটা রাস্তা গেছে মদান গ্রামে, এটা চড়াইয়ের রাস্তা, এই দু-আড়াই মাইল হবে। আর একটা রাস্তা নিচে নেমে গিয়ে ঐ কুণ্ডে গিয়ে মিশেছে, যেটা আপনি মান্দর নিচে আসার সময় পথে দেখেছিলেন। ওখান থেকে পীর গ্রাম প্রায় তিন-চার মাইল হবে।'

শ্যাম বলল, 'এদের সঙ্গে আমিও একবার ঐ গ্রামটা ঘুরে আসি না কেন, বেড়ানোও হয়ে যাবে।' 'ঠিক আছে', আলিজু বললেন, 'তবে সঙ্গে বন্দুক নিয়ে যাবেন।'

শ্যাম, গল্লা আর মোহন সিংয়ের সঙ্গে জঙ্গলের টেঁরা ব্যাঁকা পাকদণ্ডী ধরে হাঁটতে লাগল। সামনে গল্লা শিকারী, পিছনে মোহন সিং, মাঝে ও।

গল্লা পাকা শিকারী। বৃদ্ধ, কিন্তু শরীর আখরোট কাঠের মতো মজবুত এবং হৃষ্ট পুষ্ট। জঙ্গলের আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

'গল্লা, তোমার বয়েস কত?'

'জানি না সাহেব, হিসেব করতে জানি না। তিন কুড়ির মতো হবে।'

'শিকার কবে থেকে করছ?'

'জ্ঞান হবার পর থেকেই সাহেব, প্রথম থেকেই এই কাজটা ভাল লাগত। এই জঙ্গল তার নখ দিয়ে শরীরে অনেক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, কিন্তু সাহেব, শিকারের এই নেশা কিছুতেই ছাড়তে চায় না।'

মোহন সিং বলল, 'একটা ক্ষত চিহ্ন তো গল্লার হৃদয়েও আছে এবং সেটা মনে হয় এখনও ঐ ভাবেই আছে।' তারপর শ্যামকে লক্ষ্য করে বলল, 'সাহেব, গল্লার বিবিকে এই জঙ্গলই গ্রাস করে নিয়েছে। একবার সেই বেচারী জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল, তখন তাকে চিতায় ধরে নিয়ে যায়। গল্লা তার যুবতী স্ত্রীকে ভীষণ ভালবাসতো...।'

গল্লা ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'তখনকার কথা কেন তুলছো মোহন, বাদ দাও।'

'তুমি আর বিয়ে করলে না কেন?' শ্যাম প্রশ্ন করল।

'একবার তো বিয়ে করেছিলাম, তাতে কি লাভ হল?

দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেও বা কি লাভ হতো? গল্লা খুব ধীরে বলল, 'এখন তো এই জঙ্গলকেই বিয়ে করেছি।'

হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে দুটো তিতির উড়লো। গল্লা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে দুম্ দুম্ করে গুলী চালালো—পর মুহূর্তেই পাখি দুটো ধড়ফড় করতে করতে দূরের একটা ঝোপে গিয়ে পড়ল। ওরা তিনজনেই লাফিয়ে পড়ল ওই ঝোপের ওপর। একটার ডানা ভেঙ্গে গিয়েছিল, আর বন্দুকের ছররা পেট চিরে বেরিয়ে গেছে, অন্য পাখিটার গলায় গরম রক্তের স্রোত। একটা পুরুষ, অপরটা মাদী।

'বেচারী দম্পতি।' শ্যাম বলল।

গল্লা শ্যামের গলায় প্রচ্ছন্ন বেদনা অনুভব করে বলল, 'এই জঙ্গল কবে আমার ওপর সদয় ছিল? সাহেব, তখন আমার বয়েস ছিল বাইশ। নুরেনশাঁকে আমি ধরাট কোট থেকে ভাগিয়ে এনেছিলাম। জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে নিজের এলাকার নিয়ে আসি। কখনো কোনো এক কৃষকের বাড়ী থেকে গেছি, কখনো জঙ্গলেই কাটিয়েছি। যা পেতাম, তাই খেতাম। মকাইয়ের রুটি আর তরকারী, কখনো জঙ্গলের ফল, আরে গাছের মূল খেয়ে কাটিয়েছি। নুরেনশাঁ যখন হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যেত, তখন তার দুর্বলতায় খোঁচা দিয়ে আরও দু-চার মাইল হাঁটাতাম; কিন্তু যখন ও একেবারে ক্লান্ত হয়ে যেতো তখন কাঁধে বসিয়ে নিয়ে হাঁটতাম। এমন হয়েছে কাঁধে বসে থাকতে থাকতে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর চুল খুলে গিয়ে আমার চোখের ওপর পড়ত···।'

বৃদ্ধ চুপ করে গেল। ওরা দুজন মাথা নিচু করে ওর পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

কিছু দূর যাবার পর গল্লা দাঁড়াল, বন্দুকটা মাটিতে ঠেকিয়ে ওদের

দিকে ফিরে বলল, 'সাহেব, নারী পুরুষ যদি পরস্পকে ভালবাসে তবে জঙ্গলের চেয়ে সুন্দর জায়গা আর হয় না। সেদিনের কথা আমার আজও মনে আছে—যেন কালকের ব্যাপার। আমরা জঙ্গলে ধুনী জ্বালাতাম আর আগুনে ছোলা পুড়িয়ে ভেতরের দানাগুলো খেতাম। আমি ওর মুখে ছোলা দিতাম ও আমার মুখে। তারপর আমরা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলতাম। ও আমার চোখ আশ্লেষের অভাস দেখে চুপ করে যেত আর লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিত।

'ভাঁটির আগুন জ্বলতেই থাকত আর ও চীড় গাছের সরু পাতাগুলো বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ত, সারা জঙ্গলে বিরাজ করত নিস্তব্ধতা। শুধু কাঠ ফাটার শব্দ শোনা যেত, দূর থেকে ভেসে আসত পেঁচার শব্দ, কিংবা ক্ষিদের চোটে চেঁচাতে শুনতাম শেয়ালদের,···সারারাত আমি পাহারা দিতাম। সকাল হতেই ওকে জাগিয়ে দিয়ে ওই বিছানাতে আমি শুয়ে পড়তাম। আর ও বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত। সূর্য মাথার ওপর এলেই আমরা উঠে আবার হাঁটতে শুরু করতাম। সাহেব, আমার মন চায় সেই দিনগুলো আবার ফিরে আসুক, কিন্তু সময়তো তিতির পাখির উড়ে যাওয়ার মতো, একবার হাত থেকে বেরিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না···

'···একটা বছর ও নিজের সংসারে বেশ হেসে খেলে কাটালো, তারপর একদিন সেই যে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গেল আর ফিরে এল না। আমি ওকে জঙ্গলে খুঁজতে গিয়েছিলাম, ফল হয় নি কিছু। পরের দিন একটা ঝোপের নিচে ওর হাড়গুলো পেয়েছিলাম। একটা মানুষখেকো চিতা ওকে খেয়েছিল ··আমার নুরেনশাঁকে। আমার হাতে ছিল ওর মাথাটা আর তার সোনালী চুল, যা এক সময়ে আমার চোখের ওপর এলে পড়তো···।'

গল্লা একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল, তারপর নিঃশব্দে চড়াইয়ে উঠতে লাগল।

মোহন সিং বলল, 'গল্লা এই এলাকার কোনো চিতাবাঘকে আর

আস্ত রাখে নি। সেখানেই চিতার গন্ধ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে পৌঁছে গেছে। অন্য এলাকার লোকেরাও চিতা মারবার জন্যে দূর দূর থেকে ডেকে নিয়ে যায়, আর এখানে তো একটা কথা বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, যে জঙ্গলে গল্লা থাকে সেখানে চিতা থাকতে পারে না। ওর গন্ধ পেয়ে চিতা সঙ্গে সঙ্গে পালায়।'

গল্লা আবার বলতে শুরু করল, 'কিন্তু সাহেব, আমার মনে একটাই বাসনা। আজ পর্যন্ত বিশটারও বেশি চিতা আমার গুলিতে মরেছে। কয়েকবার তো ওদের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াইও হয়েছে। কিন্তু জানি না সাহেব সেটা কোন্ চিতা ছিল···? বুকের মধ্যে সব সময়ে ঐ একটাই ব্যাকুলতা, ঐ ইচ্ছেটা সব সময়ে বুকের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে আছে।'

শ্যমে বলল, 'হ্যাঁ, প্রত্যেকটা চিতা শিকার করার পর তোমার ক্ষতটা আবার দগদগে হয়ে উঠতো, তাই না?'

'হ্যাঁ সাহেব, ঠিক তাই।'

চড়াই শেষ হলো। সামনেই সবুজ এক টুকরো জমি। এখান থেকে দুটো পাকদণ্ডি শুরু হয়েছে—একটা উত্তর দিকে, অন্যটা পশ্চিম দিকে। এখানে আছে জঙ্গলী কলা গাছের ঝাড়, আর তার প্রান্তে একটা ছোট্ট ঝরনা। এই জায়গাটা দেখেই শ্যামের গা যেন জবাব দিয়ে বসলো। ও গল্লা আর মোহন সিংকে বলল, 'ভাই, এবার তোমরা গ্রামে নিয়ে লোকজন নিয়ে এসো। আমি তো আর হাঁটতে পারছি না। আমি তোমাদের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবো।'

গল্লা বলল, 'আমি মদান গ্রামে যাচ্ছি, এই চড়াইয়ের রাস্তা ধরে। মোহন তুমি পীর গ্রাম থেকে কৃষকদের ধরে নিয়ে এসো।' তারপর একটু হেসে বলল, 'দেখো, কুণ্ডের ধারে বেশিক্ষণ যেন বসে থেকো না। আজ দুপুরের মধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া উচিত, নাহলে নায়েব তহশীলদার সাহেব রাগ করবেন।'

ওরা দুজন চলে যাবার পর শ্যাম জুতো মোজা খুলে ঠাণ্ডা সবুজ ঘাসের ওপর পা রাখল। মখমলের মতো কোমল ঘাসের ওপর পা

বোলাতে বোলাতে ও অনুভব করল সাপ যেমন করে খোলোস ছাড়ে ঠিক তেমনি করে শরীরের সব ক্লান্তি এই সুখ স্পর্শে ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জঙ্গরের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু ঝরনার কুল-কুল শব্দ, কিন্তু সেই শব্দটাও এত সামান্য, মিষ্টি আর অবিরাম যে শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তা নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে না। শ্যামের তেষ্টা গেল, ঝর্ণার পাশে শুয়ে পড়ে মুখটাই বাড়িয়ে দিল জলের স্তরে, যেন সে সুন্দরী ঝর্ণাকে চুমু খেতে চাইছে। চুম্বনই বটে, ঐ রকমই মিষ্টি, সুখকর এবং আনন্দ-হিল্লোলে ভরে উঠল সারা অঙ্গ। তেষ্টা মিটেছে, এবার শ্যাম উঠে পড়ল। এখনও পর্যন্ত ঐ শিকারী তুজন ফিরল না, কখন ফিরবে তারও ঠিক নেই? হঠাৎ ওর ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হল, এবং ওর পা আপনা থেকেই নিচের পাকদণ্ডীর দিকে এগোতে শুরু করেছে।

ওই রাস্তাটা এক ভয়ংকর ঢালু জায়গার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেছে। কিছুক্ষণ ও ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াল, এখানে জঙ্গল এত ঘন যে কয়েক গজ দূরের জিনিষ দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে পরে ওর মনে এক অজ্ঞাত আশংকা জেগে উঠছিল। ঘাড়ের পিছন দিকে সামান্য কিছু স্পর্শ করলেই ওর কান কোনো একটা বিচিত্র শব্দ বা ভয়ংকর আওয়াজ শোনার জন্যে খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। যেন ওর পিছনে পিছনে সবুজ চোখওলা চিতা পা টিপেটিপে এগিয়ে আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলে কিন্তু শুধু তুটি শূন্য পথ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

ক্রমশঃ গাছের সংখ্যা কমতে লাগল, এবং এক সময়ে জঙ্গলের অবসান, এবার পথটা এগিয়ে গেছে শুধু ঘাসের মধ্যে দিয়ে। কিছু দূর গিয়ে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে ডুমুর-গাছগুলোর দিকে, তারও কিছু দূরে সেই পুরণো পথটা, মান্দর থেকে এসেছিল ওখান দিয়েই। উত্তর-পূর্বদিকে মান্দর নদী, ওপারে শ্যামদের বাড়ী। আর শিকারে যাবার মন নেই তার। ঐ ডুমুর গাছগুলোর তলায় যে জলকুণ্ডটা আছে তার পাশে বসে মোহন সিংদের প্রতীক্ষা করবে। মোহন সিং এলে আলিজুকে খবর দিয়ে দেবে যে শ্যাম বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু

ডুমুর গাছগুলোর কাছাকাছি আসতেই ও চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কুণ্ডের কাছ থেকে একটা নারী আর পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। দুটো স্বরই তার যেন পরিচিত। উঁকি মারতেই দেখে পুরুষটি মোহন সিং আর এখানে আসার সময় প্রথম যে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল এটা সেই মেয়েটি।

মেয়েটি বলছিল, 'লোকে কি বলবে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। মা খুশি হবে, কি রাগ করবে তাও না। আমার কাছে তুমিই সব। কিন্তু মনে রেখো, যদি তুমি আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করো, তাহলে গলা টিপে মেরে ফেলব।'

মোহন সিং হেসে বলল, 'সব জেনে শুনে না জানার ভান করছো।' কেন। হাজার বারতো পরীক্ষা করে দেখেছ, যখন ইচ্ছে হবে তখনই পরীক্ষা করে দেখো। মোহন সিং রাজপুত, যা কথা দেয়, তা রাখে। তার প্রেম কাঁচা সুতোর মতো অপলকা নয়।'

মেয়েটি বলল, 'তুমি হয়তো আমাকে অস্পৃশ্য মনে করো, গরীব মনে করো, গাঁয়ের লোক আমাদের বের করে দিয়েছে গ্রাম থেকে, অতএব মিষ্টিমিষ্টি কথা বলে তুমি আমাকে বোকা বানাবে ভেবেছ—কিন্তু সত্যি কথা একটা বলে রাখছি তোমাকে—আমার ওপর দেবীর আশীর্বাদ আছে—যদি উল্টো পাল্টাকিছু হয়ে যায় তবে তোমার গাঁয়ের লোকেদের কাঁচা খেয়ে ফেলব। সময় আস্তে দাও, এই ব্রাহ্মণগুলোর জন্যে আমি নিজেই মা কালী হয়ে যাবো। ভাবে কি লোকগুলো নিজেদের?'

মোহন সিং বলল, 'তুমি অকারণ সন্দেহ করছ, গাঁয়ের কেউ এটা জানে না। আর তুমি···'

শ্যাম একটু জোরে কেশে, পায়ে শব্দ তুলে হাঁটতে শুরু করল, যাতে ওরা বুঝতে পারে কেউ আসছে। অনেক কিছুই এর মধ্যে শুনে ফেলেছে শ্যাম, আর শোনার দরকার নেই। সেই প্রেম-ভালবাসার ঘসা কথা—আমি এই করব, তুমি এই করবে। রাজপুত পুরুষ, অচ্ছুত স্ত্রী, ব্রাহ্মণদের সমাজ—পরিণাম স্পষ্ট বোঝা যায়। এই স্ত্রী একটি

কলংকিত সন্তানের জন্ম দেবে, এ ছাড়া আর কি।

মোহন সিং শ্যামকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। মেয়েটির চোখে এখনও এক অজানা ক্রোধের ছাপ।

শ্যাম এমন ভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন কেউ দুজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, 'ভাই, ওখানে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে এই রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে এসেছি। ফিরে যেতে আর ইচ্ছে করছে না। তুমি নায়েব তহশীলদার সাহেবের কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও। আচ্ছা, তাহলে চলি···'নদীর দিকে পা বাড়াল শ্যাম।

মোহন সিং আর মেয়েটি শ্যাম চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ঐদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মেয়েটি বলল, 'মনে হয় ও সব কথা শুনেছে।'

মোহন সিং গোঁফে চাড়া দিয়ে বলল, 'শুনেছে তো কি হয়েছে? আমি কাউকে ভয় পাই না কি? আমি রাজপুত, কথায় পাকা লোক···আর···।'

মেয়েটা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, 'ব্যাস, ব্যাস, বেশি বড় বড় কথা বোলো না, রাখো তোমার রাজপুতী অহংকার। দেখবো কত বড় বীর তুমি। এখন তো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে আসো, যেদিন সমাজে জানাজানি হয়ে যাবে সেদিন এসব কথা বোলো তো।'

হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম ভাবছিল এই জাত-পাতের সমস্যার সমাধান করে ফেললে অন্ততঃ একটা শ্রেষ্ঠ জাতি তৈরী হতে পারত। এই মেয়েটাকেই নেওয়া যাক না কেন। চামার আর ব্রাহ্মণের মিলনের ফলে কি অদ্ভুত জিনিষ তৈরী হয়েছে। ব্রাহ্মণের সৌন্দর্য, কোমলতা আর পবিত্রতার পাশাপাশি চামারের শক্তি, চলানি ভাব, দুষ্টুমী আর ক্রোধ। নতুন জুতোর মতো মচমচ শব্দ করছে সব সময়ে। আর দেখো এই মোহন সিংকে···নায়েব তহশীলদার ওকে পাঠিয়েছে এক কাজে, আর উনি এদিকে প্রেমিকার সঙ্গে গন্ধে মেতে আছেন। শ্যাম আত্মবিশ্লেষণ করতে শুরু করল—'দেখো খোকা, তুমি নিজেই এই যুবক-যুবতীর প্রেম দেখে মনে মনে জ্বালা অনুভব করছ। আর নিজেকে মোহন

সিংয়ের জায়গায় বসিয়ে অন্যরকম চিন্তা করছ···কি তাই না? শ্যামের মনের একটা দিক অন্য দিকটার ক্ষুদ্রতাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

৮

বাড়ীতে পৌঁছেই ভীষণ ক্ষিদে পেল শ্যামের। বাইরে নাশপাতি গাছের ছায়ায় রবি আর নিম্মী খেলছিল, ওকে দেখতেই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা, দাদা, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।'

'সম্বন্ধ?' শ্যাম আশ্চর্য হল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ···', ওরা দুজন শ্যামকে প্রায় টানতে টানতে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল, উঠোনে মা আর ছায়া দেবী বসে। ওকে দেখে দুজনেই একটু মুচকি হাসলেন। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শ্যাম চলে গেল কাপড় ছাড়ার ঘরে। একটা ছোট বাক্স, বোধ হয় সকালের ডাকে এসেছে।

বুঝতে না পেরে নিম্মীকে প্রশ্ন করল, 'এতে কি আছে?'

'দাদা, এর মধ্যে তোমার সম্বন্ধ আছে।'

'তার মানে যে মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সে এর মধ্যে বন্ধ আছে?' শ্যামের এই প্যাঁচালো কথাটা বাচ্চারা ঠিক বুঝতে পারল না।

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে কথা ভেসে এল ছায়া দেবীর, 'না, বাবা, বিয়ের কনে এর মধ্যে বন্ধ নেই, কনে আসবে আর একটা বাক্স করে।'

শ্যামের মা ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, 'এক বছর পরে পালকিতে বন্ধ হয়ে।'

রবি আর নিম্মী কিছু না বুঝেই হাততালি দিতে দিতে বেরিয়ে গেল: নতুন বৌ এক বছর পরে পালকিতে বন্ধ হয়ে আসবে··· আসবে···। শ্যাম মাকে বলল—

'ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে আমার।'

'শিকার থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে। শিকার করলে?'

'না, আগেই চলে এসেছি, শরীরটা ঠিক নেই।'

ছায়া বললেন, 'তোমার মঙ্গল হোক বাবা। খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছে। পাঁচশো টাকা নগদ, রূপোর থালা আর ··'

মাকে অভিনন্দন জানান। আমি তো বলির পাঁঠা', রুক্ষস্বরে উত্তর দিল শ্যাম।

'না বাবা, ভাল ছেলেরা এভাবে কথা বলে না।'

ছায়া বললেন, 'এখন হাসছ বাবু সাহেব। যখন কনের মুখ দেখবে তখন···', ছায়া খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

'মা, আমাকে খেতে দাও', চড়া গলায় কথাটা বলে শ্যাম খাবার ঘরে চলে গেল।

খেতে খেতে ও মাকে বলল, 'এসব তোমরা কি করছ মা?'

'বাবা, পরিবারটা খুবই ভাল। মেয়ের বাবা ছশো টাকা মাইনে পায় মাসে। ভদ্র পরিবার। বেশ নামকরা। মেয়েটা মিডিল পাশ। হারমোনিয়াম বাজাতে পারে।'

হারমোনিয়ামের নাম শুনতেই চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল শ্যামের। ও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে···একটা ক্লাশ এইট পাশ করা মেয়ে···এইট-ক্লাশ পাশ করা মেয়েরা সাধারণতঃ যে রকম হয়ে থাকে—হারমোনিয়ামের ওপর মুখ গুঁজে গান গাইছে আ···আ করে। শ্যাম হাসি আর চাপতে পারল না। ওর সারা শরীর হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

'কি হল? কি হল?' ওর মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'কেন হাসছো কেন? এতে হাসির কি আছে? এত ভাল পরিবার কি সব সময়ে পাওয়া যায়। আজকালকার মেয়েরা তো ভাল নয়।'···একটু থেমে রাগ কমিয়ে বললেন, 'তোমার ছায়া মাসী মেয়ে দেখে এসেছেন। বলছেন মেয়ের মতো মেয়ে বটে। ভদ্র, নম্র, বুদ্ধিমতী। ফ্যাশনেবলও বটে।'

অতি কষ্টে হাসি চেপে শ্যাম বলল, 'ফ্যাশনেবলে তোমার কি দরকার? হয়তো হাই হিল জুতো পরে। চুলে লম্বা লম্বা ক্লিপ লাগায়।

বাঁকা সিঁথি। লম্বা বিনুনীতে সোনালী জরী থাকবে, যাতে তুতিন মাইল দূর থেকে দেখা যায়। ঠোঁটে লাল কালির লিপস্টিক। লম্বা লম্বা নখে নেলপালিশ।...“হৃদয়ের জ্বালা”, “প্রেমিকের পত্র” বই পড়ে। সিনেমার পাগল হবে।...ঠিক এইগুলোই তো তোমরা চাও। যাক বাবা শান্তি পেলেই শান্তি।’

‘তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে ?’ শ্যামের মা বেশ অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, ‘একটু আগে পণ্ডিত স্বরূপ কিষণজীকে ডেকে আশীর্বাদের তারিখ ঠিক করেছি ১৫ই সেপ্টেম্বর। তখন পর্যন্ত তো তোমার ছুটি থাকবে। না থাকলেও দু-একদিনে কিছু যাবে-আসবে না।’

এখন জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ। শ্যাম মনে মনে ভাবল...এখনও অনেক দেরী। কথাটা মনে হতেই ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে খেতে লাগল শ্যাম।

৯

দুপুর পর্যন্ত কুঞ্জে বসে শ্যাম গালিবের কবিতা-সংগ্রহ পড়ছিল। অনেক ভাল ভাল কবি আছেন। কিন্তু কি জানি কেন গালিবই শ্যামের সবচেয়ে প্রিয়। মন যখন কোনো কারণে বিক্ষিপ্ত হয়, তখন গালিবকে আশ্রয় করে শ্যাম। কী অসাধারণ তাঁর উপলব্ধি। এই তো এক জায়গায় তিনি লিখছেন ‘আমার মন সেই আগুন-উদ্গীরণকারী গায়ককে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে নিয়ে আসবে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা।’

হঠাৎ শ্যামের মনে হল তার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেবার জন্যে যে তৈরী হচ্ছে সে এখন হারমোনিয়ামের ওপর ঝুঁকে প্রাণপণে গেয়ে চলেছে গান। কথাটা মনে পড়তেই সারা শরীরে জ্বালা ধরে গেল শ্যামের। যার তার সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধে দেবার অধিকার লোকেরা পায় কি করে। সে যেন ভেড়া-ছাগল বা ক্রীতদাস—আসলে এই ধরণের সম্বন্ধ করে বিয়ে হওয়াটা দাসত্বেরই সামিল। অন্য স্বাধীন দেশে এই ধরণের বিয়েকে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখে। আবার শ্যামের মনে হল সত্যিই

কি তাই? প্রথাটা নিশ্চয়ই খারাপ নয়, অন্ততঃ সেই যুগে তো খারাপ ছিলই না যখন এটা চালু হয়। সেই সমাজে যেখানে নারী আর পুরুষের অবাধ মেলামেশা সহজ ছিল না। সেখানে এই ভাবেই তো বিয়ে হবে। এ ছাড়া অন্য যে পথগুলো আছে সে সম্বন্ধেও অনেকে অনেক কথা বলতে পারে। ধরো একটা মেয়েকে খুব মনে ধরল, প্রেম নিবেদন করতেই সে তোমাকে ছোটলোক, চরিত্রহীন মনে করে ফরফরিয়ে চলে যাবে। তখন তোমাকে ঘুরতে হবে আর একটা মনের মতো মেয়ের সন্ধানে। ধরো সেরকম একটা মেয়ের দেখা মিলল, এবার দামী কাগজে সেন্ট মাখিয়ে চিঠি লেখো। নিজে লিখতে না পারলে অন্য কাউকে দিয়ে লেখাও। মেয়ে এতে যদি বা রাজী হল, তার মা-বাবাকে জানানো সে এক বিরাট ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। আচ্ছা এমন যদি করা যায় কেমন হয়—সমাজের সব মেয়েরা একদিকে, আর পুরুষেরা অন্যদিকে দল বেঁধে দাঁড়াবে। লটারি হল, নাম উঠল 'শ্যাম', অন্য দিকে লটারি হল, নাম উঠল 'সুহাগিন'। পাঁচজনের সামনে দুজনের হাত এক করে দেওয়া হতেই ওরা দুজনে স্বামী স্ত্রী হয়ে যাবে। তখন আর হারমোনিয়াম বাজানো মেয়ের সন্ধানে ঘুরতে হবে না, বিয়ের সময় পেতলের ব্যাণ্ড বাজবে না। বিয়ের ব্যাপারে সব কিছুর মধ্যে এই ব্যাণ্ড বাজানোটাকে ভীষণ অপছন্দ করে শ্যাম। অথচ ওর বিয়েতে হয়তো ঐ রকমই ব্যাণ্ড বাজবে···

## ১০

কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্যাম। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে পশ্চিম দিকে, এখান থেকে আ-দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা মান্দর নদী। দিকচক্রবালের কাছে সূর্যদেব তখন পাটে বসেছেন, আর এ পাশের জঙ্গলগুলো দূরত্ব অনুসারে একের পর এক অন্ধকারে ডুবে চলেছে। হালকা নীল আকাশের গায়ে পাহাড়ের চূড়োগুলো ক্রমশঃ

স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, যেন কেউ পেন্সিল দিয়ে এঁকে গেছে এই মাত্র। সূর্য ঠিক যেখানটায় অস্ত গেছে সেখানে একটা অংশ লাল হয়ে আছে, ঠিক যেন আকাশের স্বর্ণময় বাতায়ণ, আর সেখান থেকে স্বর্গ দেবী অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীতে দেখছেন কি ভাবে লটারি করে 'শ্যাম' আর 'সুহাগিনদের' বিয়ে হচ্ছে।...যেখানে পরীরা জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাখা কেটে ফেলা হয়, এবং স্বর্গ থেকে কোনো রাজকুমার নেমে আসে না তাদের উদ্ধার করতে ..যেখানে সৌন্দর্যের মাপ ফুল দিয়ে না করে, করা হয় ধন সম্পদ দিয়ে।...

পাঁচ ফুলের রাজকুমারীর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ শ্যামের।...এক রাজকুমারী এত সুন্দর আর হালকা ছিল যে তাকে ওজন করার সময় তুলাদণ্ডের অন্যদিকে পাঁচটা ফুল রেখে রাজকুমারীকে অন্য পাল্লায় বসানো হতো। শ্যামের মনে হল, সব মেয়েরাই পরী...এবং তারা ঐ রাজকুমারীর মতো সুন্দরী। শুধু ওজন করার পদ্ধতিটা পাল্টে গেছে। এখন ফুলের বদলে পাল্লায় চাপানো হয় পাঁচ টাকা, পাঁচশো টাকা, বা পাঁচ হাজার টাকা। পুরুষদেরও সেই অবস্থা শুধু মাপটা আলাদা। কোন্‌টা বেশি ভাল...ফুল? না, টাকা?...উত্তরটা মাথায় আসার আগে শ্যাম শুনতে পেল গোলাম হুসেন বলছে, 'হুজুর, তহশীলদার সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

## ১১

তখন অনেক রাত; হঠাৎ গ্রামে বেশ চেঁচামিচি শোনা গেল। অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গেছে, বাইরে বেশ লোকজন ছুটোছুটি করছে। শ্যাম বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনের উঠোনে গোলাম হুসেন শোয়, সে আগেই উঠে বাইরে চলে গেছে খবর আনতে। একটু পরে জানা গেল নায়েব তহশীলদার আলিজু শিকার থেকে ফিরছেন, সঙ্গে আহত মোহন সিং। জঙ্গলে শিকার করার সময় একটা মাদী শুয়োর তাকে ভীষণ ভাবে জখম করে দিয়েছে।

শ্যামের বাবা আর শ্যাম কাপড় জামা পরে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে তখন বিচিত্র দৃশ্য। কয়েক শো লোকের জমায়েত। সবাই চলেছে নদীর দিকে। চীড় গাছের সরু সরু ডাল অনেকের হাতে, ডালগুলো মোমবাতির মতো জ্বলে। তাই নিয়ে আলোর মিছিল এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

অস্পষ্ট আলোতে বোঝা যাচ্ছিল শিকারীদের দলের সঙ্গে কয়েকজনের কাঁধে একটা ডুলি, তাতেই বোধ হয় আহত মোহন সিং আছে। হায় রে, শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেছে।

শ্যাম তার বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি একটু নদী পর্যন্ত যাচ্ছি।'

'গোলাম হুসেনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

দলে ভীড়ে শ্যামও হাঁটতে লাগল নদীর দিকে। সবাই বকবক করছে, হঠাৎ শ্যামের কানে এল কে যেন বলছে, 'এটা কিন্তু আলিজু সাহেবেরই কীর্তি, বেচারী গরীব রাজপুতকে শুয়োর দিয়ে জখম করিয়ে দিল। শুনেছি আলিজু সাহেব নাকি ভিতরে ভিতরে মোহনসিংয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে চলেছিল।'

অন্য একজন বলল, 'আরে এতে আলিজুর কী দোষ? মোহন সিংটাই ভীষণ গোঁয়ার আর আঢ়বুঝো, ও তো কারুর কথাই কানে নেয় না।...'

'আরে ভাই এতে গোঁয়ারতুমিরই বা কি দেখলে, সবই ভাগ্য। আমার কাকার ছেলে...কী বলব রাধে, তুমি তো ওকে দেখেছিলে...'

রাধে বলল, 'দারুণ সাজোয়ান ছেলে ছিল বটে।... দাও একটা সিগারেট দাও।'

'বুঝলে কি না, সেও খুব শিকার ভালবাসত। ও চুপি চুপি সরকারী রিজার্ভ ফরেস্টে শিকার করতে যেতো, কখনো ভাল্লুক মারতো, কখনো শুয়োর...নাও সিগারেট ধরো...একবার শীতকালে প্রচণ্ড বরফের মধ্যে শিকার করতে গিয়ে আর ফিরল না। ভালুকের হাতে প্রাণটা চলে গেল।...সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য মরে নি। বাড়ীতে এনে চিকিৎসা করা হয়েছিল, দু'তিন দিন বাদে মরে গেল।'

'হাসপাতালে দাও নি কেন?' শ্যাম প্রশ্ন করল।

'অসুবিধে ছিল, রিজার্ভ ফরেস্টে শিকার করতে গিছলো কিনা। সে অনেক পুলিশ-কাছারী পর্যন্ত জল গড়াতো।...আসলে যার মৃত্যু আছে তাকে মরতেই হবে।'

'কিন্তু মোহন সিংয়ের তো লাইসেন্স আছে', কে একজন বলল।

'না, থাকলেই বা কি, খোদ হাকিমই ওর সঙ্গে আছেন। যা করার উনিই করবেন।'

'বেচারার প্রাণ যেন না যায়, ওরা বোধহয় হাসপাতালে যাচ্ছে।'

'বোধহয়, ডাক্তারও গেছে নদীর তীরে। সঙ্গে কম্পাউণ্ডার ছিল। ঐ যে কী নাম যেন...কানা বামদেব।...চলো আমরাও যাই...।'

সকলে চলে গেল, শ্যাম একটা আঁকা বাঁকা আখরোট গাছের তলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল মিছিলের দিকে। গোলাম হুসেন বলল, 'এই কমবখত্ শুয়োরনীগুলো ভীষণ বজ্জাত। পেটে যদি বাচ্চা থাকে, বা সঙ্গে যদি ছোট বাচ্চা থাকে, তাহলে এদের হাত থেকে বাঁচা মুশকিল।...কী যে হবে মোহন সিংয়ের কে জানে?'

এবার সবাই নদী থেকে ফিরছে। আলিজু সাহেব হেঁটে আসছেন সঙ্গে অবশ্য খচ্চরটা আছে। আনমনা থাকায় উনি শ্যামকে দেখতে পেলেন না। তার পরেই মোহন সিংহের ডুলি—ঠিক ডুলি না। একটা ছোট খাটিয়ার দুপাশে বাঁশ বেঁধে ডুলির মতো করা হয়েছে।

মোহন সিং উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল তাই তার মুখ দেখতে পেল না শ্যাম।

সবাই চলে গেল, শ্যাম তখনও দাঁড়িয়ে। গোলাম হুসেন কাছে এসে বলল, 'চলুন সাহেব।'

নিচ থেকে কে যেন উঠে আসছে। তার হাতে কাঠির মশাল ছিল না। খুব কাছে আসতেই শ্যাম ওকে চিনতে পারল—'চন্দ্রা?'

সেই জলকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা। থতমত খেয়ে থেমে গেল মেয়েটা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল, কোনোরকমে কান্না থামাবার চেষ্টা করে মেয়েটা বলল, 'হাসপাতালে যাবো।...

যেখানে ও যাবে সেখানে আমিও যাবো।'

গোলাম হুসেন বলল, 'লোকে কি বলবে?'

'ও লোকের নয়, ও আমার।'

শ্যাম বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি থাকলে কেউ কিছু বলবে না তোমাকে।'

অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই শ্যাম প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলেছে। ও লক্ষ্যও করতে পারল চন্দ্রার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার ঝলক।

## ১২

মোহন সিংকে সোজা অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার মোহন সিংয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নাড়ী দেখছিলেন, কম্পাউণ্ডার বামদেব মোহনের পিঠের ক্ষতগুলো ধুচ্ছিল। কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত অসংখ্য ক্ষতের দাগ।

'এই ছোটলোক শুয়োরনীটার কাণ্ড দেখ। মাংস কেমন চিরে দিয়েছে···ছোটলোক··· ।'

কথায় কথায় এই 'ছোটলোক' শব্দটা ব্যবহার করে বামদেব। রং শ্যামল, লম্বাটে গড়ন, গালের হাড় বের করা, এক চোখ কানা। খুব মদ খায়, অথচ মনটা ভীষণ পবিত্র। রোগীদের দারুণ সেবা করে বলেই বোধ হয় সকলে ওর বকবকানি সহ্য করে নেয়।

শ্যাম প্রশ্ন করল, 'ঐ বাঁচবে তো?'

ডাক্তার উত্তর দেবার আগেই কম্পাউণ্ডার বলে উঠল, 'আরে, এতে বাঁচার কথা কেন তুলছেন। আমি তো ছোটলোক এর চেয়েও অনেক মারাত্মক কেস ভাল হতে দেখেছি। কি বলেন ডাক্তার বাবু।'

ডাক্তার বললেন, 'হুঁ', শুনলাম আলিজু সাহেব শুয়োরনীটাকে গুলী করেন ও তখন বাচ্চা নিয়ে খেলছিল। গুলী খেয়ে মাটা একটু সরে দাঁড়ায়, আর ঠিক তখনই মোহন সিং না জেনে চলে আসে ওখানে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় মোহন, আর শুয়োরনীটা ওর পিঠ চিরে

দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়।…কথা বন্ধ কর…নাড়ী ভালো চলছে না। আর ক্লোরোফর্ম দেওয়া চলবে না একে।' 'এখুনি সব করে দিচ্ছি হুজুর?' কম্পাউণ্ডার বলল।

শ্যামের মনটা খুব উতলা হয়ে উঠল, কেসটা খারাপই মনে হচ্ছে। অপারেশন রুমের বাইরে চন্দ্রা দাঁড়িয়ে। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, বড় বড় চোখে জল ছল ছল করছে। সেই মুহূর্তে ঐ অচ্ছুৎ, অসহায় অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবতীটির সকাতর চোখের ভাষা যেন আকুল হয়ে একটাই প্রশ্ন করতে চাইছে—কেমন আছে মোহন সিং?

শ্যাম ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, ডাক্তার বলছিলেন মোহন সিং ভালো হয়ে যাবে। বামদেব কাম্পাউণ্ডারও বলছিল চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'মোহনকে কোথায় রাখবে বাড়ীতে, না, হাসপাতালে?'

'হাসপাতালের ওয়ার্ডে রাখবে। বাড়ীতে চিকিৎসা কি করে হবে?'

চন্দ্রা যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল, 'তাহলে তো আমি এখানে থাকতে পারবো। বাড়ীতে থাকলে তো ওর আত্মীয়রা আমায় ঢুকতে দিত না।'

'মোহনের আত্মীয়ও আছে না কি? শুনেছিলাম তো ওর কেউ নেই। মা-বাবা অনেক আগেই মারা গেছে।'

'না, ওর মামা আছে একজন। ঐ মামা আর মামী ঘড়ে মৌজায় থাকে।' তারপর গলা নামিয়ে চন্দ্রা বলল, 'ওরা বাইরে বারান্দায় বসে আছে…মোহন যদি মরে যায়, তাহলে ওর বাড়ী-জমি সব ঐ মামা পাবে।'

অশুভ চিন্তাটা করে সারা শরীর কেঁপে উঠল চন্দ্রার।

'ভেবো না, মোহন ভাল হয়ে যাবে', আশ্বাস দিল শ্যাম।

মোহন কিছুতেই ভাল হবে না, যদি ওর দেখাশোনার ভার মামা-মামীর ওপর দেওয়া হয়। 'আমি এসব খুব ভালোই জানি। আমাদেরও তো আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদেরও ঐ একই চরিত্র। সব ছোটলোক, নীচ, চোর, বদমাস…', চন্দ্রার গলার স্বরে তিক্ততা ঝরে পড়ছিল, সে

প্রায় বিদ্রোহিনীর মতো ঘোষণা করল, 'মোহনের দেখাশোনা আমিই করব।' তারপর হঠাৎ হাত জোর করে শ্যামকে বলল, 'তুমি আমার যে উপকার করছ তা সারা জীবন দিয়ে শোধ করব, আমার আর একটা উপকার করে দাও, ডাক্তারবাবুকে বলো আমি মোহনের সেবা করব। এই অনুমতিটা পাইয়ে দাও।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ওর আত্মীয়রা কি তা মেনে নেবে? তাছাড়া গ্রামবাসীরা হৈ হল্লা শুরু করে দেবে। এটা তো ব্রাহ্মণদের গ্রাম। পণ্ডিত স্বরূপকিষণ...একটা লোক-হাসানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে...তাছাড়া তোমার মা...।'

'আমার মায়ের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না, ওটা আমি ঠিক করে নেবো। আর লোক হাসানো? ওসব পরোয়া আমি করি না। পণ্ডিত স্বরূপকিষণ কিছু বলতে আসুক না, ওর মুখ পুড়িয়ে দেব, তবে হ্যাঁ আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারটা আলাদা...কিন্তু আপনি যদি...', চন্দ্রার কাজল কালো চোখের মিনতি উপেক্ষা করতে পারল না শ্যাম। উত্তেজনায় চন্দ্রা শ্যামকে কখনো তুমি, কখনো আপনি বলছিল। 'ভয় পেয়ো না, যতদূর চেষ্টা করার করব। অন্ততঃ আজ রাতে তুমি এখানেই থাকবে। বামদেবকে বলবো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে।

## ১৩

শ্যাম আগে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলল। প্রথমে ডাক্তারবাবু এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেন, 'ব্যাপারটা একটু জটিল, বুঝতেই তো পারছেন। মামা থাকতে, বাইরের—তাও আবার অচ্ছুত মেয়েকে এতোটা মাথায় তোলা ঠিক হবে না। ব্রাহ্মণরা আমার বিরুদ্ধে রিপোর্টও করাতে পারে। তাছাড়া আমি হলাম মুসলমান। সকলেই আমাকে উল্টো বুঝবে। আপনি নিজেই বুঝে দেখুন।'

শ্যাম বামদেবের সঙ্গে কথা বলল। সে তো সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল, 'আরে এতে ক্ষতি কি আছে? আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। মেয়েটাও

থাক, মামাটাও থাক। আপনি চিন্তা করবেন না একটুও।'

'একটা কথা আপনারা ভেবে দেখবেন, মোহন সিংয়ের আত্মীয়রা তার অসুবিধেই ঘটাতে চাইবে, কারণ মোহন মরে গেলে তাদের লাভ। আর অন্যদিকে চন্দ্রা…', শ্যাম কথাটা শেষ করল না।

ডাক্তার এবং বামদেব দুজনেই ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে। কিন্তু কেউই নিজের মতামত প্রকাশ করল না। পরদিন দুপুর বেলায় মোহন সিংয়ের জ্ঞান ফিরতে সে নিজেই এই সমস্যার সমাধান করে ফেলল। চন্দ্রাই তার দেখাশোনা করবে। ফলে মামা গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল আর চন্দ্রা তার খাটিয়াটা ওয়ার্ডে মোহন সিংয়ের বেডের পাশে পেতে ফেলতে দেরী করল না।

## ১৪

ঐ ঘটনার তিন-চারদিন পরে আলিজুর সঙ্গে দেখা হ'ল শ্যামের।

'মিষ্টি খাওয়াও ভাই খোশ খবরের জন্যে।'

'কেন?'

'আমাকে লুকোচ্ছ। শুনলাম তোমার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে খুব ভালো ঘরে। এও শুনেছি পাঁচশো টাকাও পাঠিয়েছে তারা।'

শ্যাম চিন্তাগ্রস্ত ভাবে উত্তর দিল, 'নায়েব তহশীলদার সাহেব, আপনাকে লুকোবার কিছু নেই। এতে তো খুশি হবার কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না আমি। মন তো প্রেম চায়, ভালবাসা চায়, আর ঐ মেয়েটি তো প্রেম কাকে বলে জানেই না। চোখে দেখলাম না পর্যন্ত…এ যে কোন্ ধরণের নিয়ম কে জানে?'

আলিজু বললেন, 'তোমার বয়েস কম, তাই ঠিক বুঝতে পারছো না। শত শত বছর ধরে চলে আসছে এই নিয়ম, কখনোই ভুল হতে পারে না। তুমি তো বিদেশীদের মতো কোর্টশিপ করার স্বপ্ন দেখছ। কিন্তু এক কালে ওসব দেশেও আমাদের মতো নিয়ম চালু ছিল। জাত-পাতের ব্যাপারটা ওরাও মানতো। দেখ না, কোনো লর্ড পরিবারের

ছেলে মজুরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কি? এই মোহন সিংয়ের কেসটাই ধরো না কেন, জাতে রাজপুত, দেখতে সুন্দর, সম্পত্তিও মোটামুটি আছে। সে একটা অচ্ছুত মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সমাজ ছাড়বে কেন? আসলে জানো শ্যাম সাহেব, সমাজ মানুষেরই বুদ্ধি আর শক্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে, তাই সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়াটা খুব ভালো কাজ না। আমি তো ছায়াকে বহুবার বলেছি সমাজের কথা মেনে নিয়ে মেয়ের সঙ্গে স্বরূপকিষণজীর ছেলের বিয়ে দিয়ে দিতে। ব্যস সব ঝগড়া মিটে যাবে। স্বরূপকিষণ খুব ধূর্ত লোক, ব্রাহ্মণ সমাজটাকে হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে। আমি ছায়াকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু মাথা মোটা জেদী মেয়েমানুষটা কোনো কথাই কানে তুলল না।'

'তা ওর ইচ্ছেটা কি?'

'মনে হয় বন্তীর সঙ্গে অন্য কারুর বিয়ে দেবার কথা। ও ভেবে রেখেছে। ছেলেটা ব্রাহ্মণ, তবে খুব গরীব, নাম বলভদ্র।'

'তা এরকম মুর্খের মতো কাজ করছেন কেন ছায়া দেবী?'

'আসলে ছায়া ভীষণ গোঁয়ার। সব কিছু নিজের ইচ্ছেমত করতে চায়। আর ঐ বলভদ্র দেখতে বেশ সুন্দর, ম্যাট্রিক পাশ করা। বন্তীর প্রেমে পড়েছে, অবশ্য গ্রামের অন্য ছোকরারাও বন্তীর সঙ্গে প্রেম করতে চায়। কিন্তু বন্তী কাউকে পাত্তা না দিলেও বলভদ্রকে মনে হয় মনে মনে চায়। তাছাড়া বলভদ্রের মা-বাবা মারা গেছে। ছায়া দেবীর ইচ্ছে ছেলেটাকে ঘর-জামাই করে রাখবে। সেই তুলনায় স্বরূপ-কিষণজীর ছেলেটা কদাকার। আসলে কি জানেন…'

এসব কথা আর শুনতে ভালো লাগছিল না শ্যামের, কাজের অজুহাত দেখিয়ে বিদায় নিল। আলিজুও বললেন, 'আরে হ্যাঁ, আমারও নমাজের সময় হয়ে গেছে।'

## ১৫

হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম চিন্তা করছিল আলিজুর কথা। ওঁর কথাগুলো

ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু ততোটা কাজেরও না। বিপ্লব এবং বিদ্রোহ ছাড়া মানুষ কিছুতেই উন্নতি করতে পারে না। অতীতে মানুষের যে অগ্রগতি হয়েছে তার পিছনে কি বিপ্লবের অবদান নেই? ধর্মের অবতাররাও কি এক ধরণের বিদ্রোহী নন? তাঁরাও তো তাঁদের সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। মানুষ যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তবে তো তা মৃত্যুরই সামিল। মানুষের মনে যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চিন্তার উদয় না হতো, তাহলে তারা আজও গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকত। তবে এ কথাও ঠিক আলিজু সাহেব নিজের বক্তব্যে অটল এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। অথচ তার নিজের মনে এখনও অনেক দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে। দেখা যাক জীবনের স্রোত তাকে কোন্ পথে নিয়ে যায়।

হঠাৎ ও থমকে দাঁড়াল, উল্টোদিক থেকে বন্তী আসছে। হাতে ফলের ঝুড়ি। ওকে দেখেই বন্তী আসতে হঁাটতে শুরু করল। এখানে পথটা দারুণ সরু, দুপাশে গাছ-লতা-পাতা। সাদা দু পাট্টা গায়ে জড়ানো। চেহারায় খুশি খুশি ভাব। শ্যাম ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জুতোর ফিতেটা আর ঝঞ্ঝাট করছে না তো?'

বন্তী হাসল। এমন অলৌকিক হাসি এর আগে শ্যাম কখনো দেখে নি। সাধারণ মেয়েদের হাসির মতো শুধু মিষ্টি নয়, তার হাসিতে এক আনন্দময় অমৃতের স্বাদ। বারবার দেখতে ইচ্ছে করে।

শ্যাম একটু রসিকতা করে বলল, 'হতভাগা ফিতেটা যদি আবার বিরক্ত করে, তো···।'

বন্তী আবার হেসে ফেলল, 'আপেল খান···আপনাদেরই বাগানের···।'

'নিজের বাগানের ফল আমি খাই না।'

বন্তীর গালে গোলাপের লালিমা ফুটে উঠল। উড়নী দিয়ে সে নিজের বুক ঢাকার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শ্যামের মন লোভাতুর হয়ে পড়ছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল বন্তীর উদ্ভিন্ন যৌবনকে।

'এ ভাবে কি দেখছেন?'

লজ্জা পেয়ে শ্যাম পাশের একটা লতা গাছের সাদা ফুল দেখিয়ে বলল, 'কী সুন্দর গন্ধ, তাই না?'

'হ্যাঁ। অমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাকে কয়েকটা ফুল পেড়ে দিন না। বিনুনীতে লাগাবো। বড্ড কাঁটা।'

শ্যাম চারধারে একবার তাকাল, না, ধারে কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক ফুল পাড়ার পর বন্তী বলল, 'থাক, আর না।' বিনুনীতে ফুল গুঁজে নিয়েছে এর মধ্যে। বাকীগুলো দিয়ে মালা তৈরী করবে। সেই পরম মুহূর্তে শ্যামের মনে হল বন্তী যেন নিজেই পল্লবিনী লতা হয়ে গেছে।

শ্যাম হেসে বলল, 'অপরূপ কেশ হয়ে উঠেছে আরও অপরূপা।' হয়তো এর অর্থ বুঝতে তোমার কষ্ট হবে, বলভদ্রকে জিজ্ঞেস কোরো।'

কিন্তু বন্তী বোধহয় মানেটা বুঝে ফেলেছিল, লজ্জায় তার মুখ আরও আনত হয়ে উঠেছে। জুতোর ডগা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল।

'বদমাস জুতোটা খুব জ্বালাচ্ছে তোমাকে, দাও ফিতেটা ভালো করে বেঁধে দি।'

বন্তী হেসে হরিণীর মতো ছুটে চলে গেল। …সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। বাগানের একটা টিলার ওপর বসে শ্যামের মনে হচ্ছিল সে এখন আর একা নয়; বন্তীও ওর সঙ্গে আছে। বন্তীর মৃদু নিঃশ্বাস, ওর গালের গোলাপী আভা, মন-ভোলানো হাসি—সব যেন বিশ্বসংসারে ছড়িয়ে পড়েছে। এক অজানা আশংকা, সেই সঙ্গে এক মধুর স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল শ্যাম।

## ১৬

মান্দর আর ঘড়া মৌজার মাঝখানে এক উপত্যকায় টিলার মতো উঁচু জায়গায় ছিল পণ্ডিত স্বরূপকিষণের বাড়ী। ওখান থেকে পুরো উপত্যকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের শিরোমন্দির উপযুক্ত বাসস্থানই বটে। আশে-পাশে আরো কয়েকটি ব্রাহ্মণ আর ধনী মহাজনদের

বাড়ী। স্বরূপকিষণজীর বাড়ী থেকে একদিকে রোড়ী-নালা, একটা উঁচু মতন জায়গা আর মন্দিরের বাজার দেখা যায়, অন্যদিকে তহশীল আর অন্যান্য সরকারী দপ্তর। ওধারে পণ্ডিত স্বরূপকিষণের ভাই বসন্ত-কিষণের বাড়ী। পণ্ডিতজী এবং গ্রামের অন্যান্য লোকেরা বসন্ত-কিষণকে ভাল চোখে দেখে না। ওর কথাবার্তা, চাল-চলন সকলেরই অপছন্দ। তাছাড়া দাদার মতো ধনীও নয়, ফলে আলাদা থাকে। স্বরূপ-কিষণজীর বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশাল একটা ভুট্টার ক্ষেত। কিছু দূরে ধর্মশালা, পাশেই গেরুয়া রঙের একটা পতাকা ওড়ে খুব উঁচুতে। আসলে স্বরূপ কিষণজীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বড় জমিদার। জমিদারীর আয় থেকেই চলে ধর্মশালার খরচ। কিন্তু কায়দা করে ওখানে স্বরূপ-কিষণ নিজের এক পূজারী বসিয়ে রেখেছে। পূজারী ব্রাহ্মণ প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, তাই তাঁর মাকে পূজোর কাজ করতে হয়।

কাগজে-কলমে পণ্ডিত স্বরূপকিষণ ধর্মশালার পুরোহিত। বছর চল্লিশ বয়েস। বেশ লম্বা। প্রশস্ত কপাল, সরু ঠোঁটে অহংকারের ছাপ। ভ্রূ জোড়া ওপর দিকে তোলা। পশ্চিমের শিল্পীরা শয়তানের ভ্রূ যেমন করে আঁকেন, আর এদেশের শিল্পীরা নর্তকীর ভ্রূ। স্বরূপ-কিষণের ঠোঁটে সব সময়ে হাসি লেগেই থাকে, সে হাসিতে ধূর্ততার ছাপ। শ্যাম জানে এই ধরণের হাসি যারা হাসে তারা ভীষণ ভয়ংকর হয়।

স্বরূপকিষণ দেখতে যত সুন্দর, তাঁর স্ত্রী ঠিক ততটাই অসুন্দর। মিশর দেশের মমীর মতো নিষ্প্রাণ, নির্জীব শুষ্কতার প্রতিমূর্তি যেন।

অজন্তার ছবির মতো রূপবান বাবা স্বরূপকিষণ আর মিশরের মমীর মতো মায়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দুর্গাদাসের মতো পুত্ররত্ন সৃষ্টি করেছেন। ক্রশ-ব্রীডিং-এর এমন অপরূপ নিদর্শন পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। দুর্গাদাসের কাঁধ চওড়া, কিন্তু গলাটা অস্বাভাবিক সরু। বাঁ পাটা খোঁড়া, একটা চোখ কাণা, সেটা ভীষণ ঢোকা, আর অবিরাম জল পড়ে। কথা বলার সময় বোকার মতো হাসে। ওকে দেখলেই ভয় লাগে।

## ১৭

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে স্বরূপ কিষণ তাঁর বাড়ীতে গ্রামের সব প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন মানুষ জড়ো হয়েছে। এদের মধ্যে লালা বংশীরাম, লালা হুকুমচন্দ, লালা ফুলকন্দ, বিশাখামল, গজ্জামল, কোড়ুরাম ইত্যাদিরাও আছে। কালো রঙ, খাড়া নাক আর অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠস্বর দিয়েই ওদের সহজে চেনা যায়। কথাবার্তা খুবই মিষ্টি, কিন্তু অর্থের বিচারে যেন দুদিকে ধার দেওয়া তলোয়ার।

ঐ সভায় গ্রামের শিখদেরও কিছু প্রতিনিধি এসেছে। আসলে এরা আধা শিখ, আধা সনাতন পন্থী। সুযোগ আর সুবিধে অনুসারে এক একজন এক একদিকে যায়। এখানকার সমাজে অবশ্য সবাই এই চরিত্রের। এরা শিখগুরুর পূজো করে, আবার শিবের পূজোও করে প্রয়োজন অনুসারে। শিখদের মধ্যে ছিল সর্দার খেশর সিং, সর্দার বচত্তর সিং, কলিয়ারী সিং ইত্যাদি।

ঘড়া মৌজা থেকেও কয়েকজন এসেছিল। পণ্ডিত রুদ্রমানজী, গঙ্গু মিশির, বুদ্ধু পুরোহিত আর পণ্ডিত পেড়ারাম। দাড়ি কামিয়ে, নতুন জামা পরে, মাথায় তিলক, গলায় মালা; সভা সাজিয়ে বসেছিল সকলে।

পা টেনে টেনে হাঁটছিল দুর্গাদাস, আর সকলকে শরবত, জল দেবার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

'পণ্ডিত স্বরূপকিষণজী কোথায়?' এই নিয়ে দশম বার পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বের করে সময় দেখে প্রশ্ন করলেন লালা বংশীরাম।

'এখুনি আসবেন', দুর্গাদাস ক্ষমাপ্রার্থীর মতো করে বলল, 'ওপরে ধ্যান করছেন কিনা···হি···হি···হি···।'

লালা কোড়ুরাম, 'লোহার দাম বেড়ে গেছে।'

ছায়ার ভাই জিয়ালাল, 'পীরের মেলার আর কত দিন বাকী ?'

দুর্গাদাস আগ বাড়িয়ে জবাব দিল, 'বারো দিন, হি···হি···হি··· এবারে খুব জাঁক-জমক হবে···আমরা সবাই যাবো···হি···হি···হি···।'

'আমরা সকলে' বলতে দুর্গাদাস কি বোঝাতে চাইছে এটা কারুরই অজানা নয়, উপস্থিত সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। দুর্গাদাসের ধারণা সে বেশ ভালো রকমের একটা রসিকতা করছে।

ঠিক সেই সময় স্বরূপকিষণজী সভায় পা দিলেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার জানাল। প্রণামের ঘটাও হল। স্বরূপকিষণ স্মিত হাসলেন। একদিকে ওঁর জন্যে সিংহাসনের মতো একটা আসন আলাদা করে তাকিয়া দিয়ে সাজানো ছিল। সবাই বলার পর কারুর মুখে কোনো কথা নেই। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। সিংহাসনের পাশে একটা কাঠের জলচৌকির ওপর যোগবাশিষ্ঠ রাখা, পাশে ঘিয়ের প্রদীপ, ধূপকাঠির সুগন্ধে ঘর ভরপুর।

গম্ভীর গলায় স্বরূপকিষণ বলতে শুরু করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজ একটা অত্যন্ত জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি। গত কয়েকদিন ধরে বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। শেষে বাধ্য হয়ে আপনাদের ডাকলাম। অযথা সময় নষ্ট না করাই উচিত। কাল রাতে যোগবাশিষ্ঠের একটা শ্লোক পড়ার পরই মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছিল। শ্লোকটা হল···'. যোগবাশিষ্ঠটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন পণ্ডিতজী। ঘরে ছুঁচ পড়ার নিস্তব্ধতা। কেউ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না। '···হ্যাঁ, এই সেই মন্ত্র···', সংস্কৃত শ্লোকটি সুন্দর উচ্চারণ করে পড়লেন তিনি। ব্যবসায়ীরা কিছু না বললেও কয়েকজন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ চুপ করে না থেকে নিজেদের বিদ্যে জাহির করার জন্যে বাহবা দিলেন, কেউ যেন সবটা তিনি একাই বুঝেছেন এমন ভাব দেখিয়ে ঘাড় নাড়লেন। পণ্ডিত পেড়ারাম দেখলেন তাঁকে কিছু একটা বলতেই হবে, তাই চোখ বন্ধ করে বেশ জোরে বললেন, 'হে ঈশ্বর, তোমার লীলার অন্ত নেই।' এখন এর অর্থ যে যা খুশি করতে পারে।

দুর্গাদাস হি হি করে হেসে ফেলল। গঙ্গু মিশির বললেন, 'বাহ্ গুরুজী! যোগবাশিষ্ঠ সত্যি যোগাবশিষ্ঠই বটে, এসব অধ্যয়ন করলে তিন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়।'

পণ্ডিত স্বরূপকিষণ মৃদু হেসে বললেন, 'এই শ্লোকের অর্থ জীবন দুদিনের মেলা।'

দুর্গাদাস হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, 'পীর সাহেবের মেলা···।'

পণ্ডিতজী গর্জন করে উঠলেন, 'দুর্গাদাস, চুপ করো।' ভয় পেয়ে হাসি চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করল দুর্গাদাস, ফলে তার মুখ ভঙ্গী আরও বিকৃত হয়ে উঠল।

অভ্যস্ত হাসিটি আবার ঠোঁটে লাগিয়ে নিয়ে স্বরূপকিষণজী বলতে লাগলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এর অর্থ হল জীবন দুদিনের মেলা, হেসে খেলে কাটিয়ে দাও···কিন্তু তার সঙ্গে কর্তব্যও করো, ধর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হয়ো না, কারণ ধর্মই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ।'

'একেবারে হক্ কথা বলেছেন', ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে সমর্থন জানাল পণ্ডিতজীকে।

লালা বংশীরাম বলল, 'পণ্ডিতজী, আপনার বাণী অমৃতের সমান।'

পণ্ডিতজী কৃপা কটাক্ষ করলেন বংশীরামের দিকে।

'কিন্তু একটা কথা বলুন, আজ কেন আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন,' বংশীরাম এবার নিজের আসল বক্তব্যটা পেশ করলেন।

লালা দীপচন্দ্র বলল, 'পণ্ডিতজীর ডাক পেয়েই আমি দোকান বন্ধ করে চলে এসেছি। একটা কৃষক আজ তার বৌয়ের জন্যে হাঁসুলী নিতে আসবে বলেছিল, কে জানে এসে ফিরে গেল কিনা।'

সর্দার বচত্তর সিং সর্দার খেশর সিংয়ের কানে কানে বলল, 'ঠিক এই রকমই একটা শ্লোক আমাদের পরম পিতা বাবা নানক বলেছিলেন', শ্লোকটা সে শুনিয়েও দিল।

সর্দার খেশর সিং গ্রামের পাটওয়ারী, সব সময়ে জানি মাপা-জোকার কাজ করে বেড়ায়। জপজী সাহেব পুরোটাই উল্টো-পাল্টা ভাবে

মুখস্থ করে রেখেছে, আর এত তাড়াতাড়ি সেগুলো বলে যায় যে অর্থ বোঝা দুঃসাধ্য। তবে যে শ্লোকটা সে সব সময় বোধগম্য ভাবে বলে তা হল : সবার আগে টাকার নাম, দ্বিতীয় নামও টাকার এবং শেষ ও সবচেয়ে খাঁটি নামটিও টাকার। এখন কিন্তু সে ধর্মের কথা বলছে বেশ গুরু গম্ভীর ভাবে। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'ঐ শ্লোকটা গুরুজীরই, হিন্দুরা চুরি করে যোগবাশিষ্ঠতে ঢুকিয়ে নিয়েছে।' বচত্তর সিং আর গুলহাটি সিংও সর্দার খেশর সিংয়ের এই পাণ্ডিত্য দেখে খুশি হয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। ওদিকে স্বরূপকিষণ এদের হাসিটাকে তাঁর প্রতি সমর্থন মনে করে বললেন, 'সর্দার বচত্তর সিংজী, আজ আপনাদের ডেকেছি এক দুঃখজনক ব্যাপারের মীমাংসা করতে।'

'বাহ্ গুরুজীর কৃপা হবে···বলুন কী এমন ঘটনা?'

পণ্ডিত স্বরূপকিষণের ভ্রূ আরও কুঁচকে উঠল, চোখের তারায় চঞ্চলতা। চন্দনের ফোঁটাটা যেন আগুনের মতো জ্বালা ধরাচ্ছে—বললেন, 'ধর্মকে রক্ষা করা আমার, আপনার এবং সকলেরই কর্তব্য। কাল রাতে যোগবাশিষ্ঠ পড়ার পর যখন ঘুমোলাম তখন আমার ঠাকুর্দা স্বপ্নে আমাকে বললেন '—বাবা, ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় তাও দেবে, সংকোচ করবে না। যা ঘটছে সেটা খোলাখুলি ভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরো। সমাজ তোমার বিপক্ষে যাবে না। এই কথাগুলো বলে ঠাকুর্দা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।'

'আরে, আপনার ঠাকুরদাতো সাধু-পুরুষ ছিলেন। সাধুদের কথা কে অমান্য করতে পারে। বলুন, মহারাজ, আদেশ দিন,' হাত জোড় করে বলল লালা কোড়ুমল।

জিয়ালাল বলল, 'কেউ কি কোনো অপরাধ করেছে?'

'হ্যাঁ', স্বরূপকিষণ গর্জে উঠলেন, 'আপনাদের চোখের সামনে ধর্ম নষ্ট হচ্ছে, লজ্জা করে না আপনাদের। ঐ খারাপ মেয়েমানুষ চন্দ্রা, যাকে তার মার সঙ্গে আমরা সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সে চোখের সামনে এক রাজপুত পরিবারের চরিত্র ও ধর্ম নষ্ট করতে চলেছে। আর আপনারা চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মুসলমান ডাক্তারটা পর্যন্ত

ঐ অদ্ভুত কুলটার দিকে। যদি এসব চলতে দেওয়া হয় তবে আমাদের ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। এই গ্রামে ঈশ্বরের অভিশাপ পড়বে।'

সভার সকলে কেঁপে উঠল। শুধু ব্যবসায়ীরা চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে রইল। লালা বংশীরাম বলল—'পণ্ডিতজী, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু আপনিই বলুন কী করা উচিত আমাদের। মোহন সিংয়ের চরিত্র তো আপনি জানেন, ও কারুর কথা শোনে না। তাছাড়া এখন তো ভীষণভাবে অসুস্থ, আর চন্দ্রা প্রাণ দিয়ে ওর সেবা করছে; তাই ও যে আমাদের কথা শুনবে বলে মনে হয় না। ও ভালো হোক, তখন দেখা যাবে।' হ্যাঁ হ্যাঁ করে বংশীরামকে সমর্থন করল।

'আগে ভালো হোক', ব্যঙ্গের সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন স্বরূপকিষণ, 'তখন ও চন্দ্রাকে বিয়ে করে বসবে এবং সমাজে আর একটি ক্ষত্রিয় ধর্ম-ভ্রষ্ট হবে। অধর্মেরই জয় হবে। আমি বলছিলাম কি মোহন সিংয়ের দেখাশোনার ভার নিক তার আত্মীয়।'

মোহনের মামা সভায় ছিল, চট্ করে উঠে হাত জোড় করে বলল, 'সমাজের কাছে আমার বিনীত নিবেদন আমার আত্মীয়ের ধর্ম রক্ষা করা হোক।'

একজন লালা বলল, 'কাজটা খুব সহজ হবে না। কারণ ডাক্তার মানুষটি শুধু সৎ নয়, ভালোমানুষও। এখনও পর্যন্ত তিনি···,' পণ্ডিতজীর চোখ ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছে দেখে লালা থেমে গেল মাঝপথে।

পণ্ডিতজী বললেন, 'পথ আমি বলছি আপনাদের, প্রথমতঃ ডাক্তারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করতে হবে। বাকী রইল চন্দ্রা, সেটারও···', এতদূর বলে উনি ছেলেকে ইশারা করলেন, 'চন্দ্রার মাকে এখানে ডাকো।'

'চন্দ্রার মা?' একসঙ্গে অনেকে চমকে উঠল।

পণ্ডিতজী বিজয়ীর দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে, বললেন, 'আজ সকালে চন্দ্রার মাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি, সেও চন্দ্রার আচরণে অসন্তুষ্ট। কথায় কথায় জানতে পারলাম চন্দ্রা এখনও নাবালিকা। চন্দ্রার মা চাইলে···', কথা শেষ হল না, দুর্গাদাস সঙ্গে করে আনলো

চন্দ্রার মাকে। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে, ভিতরে ঢুকলো না।

বৈঠকে বেশ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। নানা লোকের নানা মন্তব্য। সবাই সবজান্তা। বেশ কয়েক মিনিট কাটার পর স্বরূপকিষণ উঁচু গলায় বলতে শুরু করলেন, 'এখন কথা হচ্ছে এই যে চন্দ্রার মা··· ।'

ইতিমধ্যে চন্দ্রার মা কখন যে স্বরূপকিষণের স্ত্রী দুর্গার পাশ থেকে চলে গেছে কেউ লক্ষ্য করেনি। দুর্গা ছুটল খোঁজবার জন্যে। বাড়ীর পশ্চিম দিকে ভুট্টার ক্ষেত। ওখানে সর-সর শব্দ হচ্ছিল। কাছে যেতেই ভুট্টার ক্ষেত থেকে এক ষণ্ডা-গুণ্ডা কৃষক বেরিয়ে এসে হাত চেপে ধরল, 'কতক্ষণ ধরে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

'হায়, হায়', স্বরূপকিষণের স্ত্রী লজ্জা পেয়ে নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে প্রায় গুণগুণ করে বলল, 'আমি কি করব, দেখছো না বাড়ীতে কত লোক এসেছে।'

১৮

শ্যাম তার তৈরী করানো কুঞ্জে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল, এমন সময় সইদা এসে সেলাম করল।

'সেলাম বিবি সইদা?' মুচকি হেসে বলল শ্যাম, 'এবার কি বাকী মৌরী গাছগুলোও কেটে ফেলবে নাকি?'

'না, তরকারীর বাগানে সামান্য কাজ আছে। যাবার পথে ভাবলাম আপনাকে সেলাম করে যাই।'

'সেলাম' শব্দটা শুনলেই গায়ে জ্বালা ধরে শ্যামের। অপছন্দ করে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সে কি সত্যিই মনে-প্রাণে এই দাসত্বের সম্বোধনটাকে অপছন্দ করে? না, মনে হয় নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে সে। তা নাহলে কেউ সেলাম করলে মন খুশিতে ভরে ওঠে কেন তার? ছোট-বড়োর প্রভেদ থাকবেই। কোনোদিনও গরীবরা এই হীনতা থেকে মুক্তি পায় নি। সইদা কি ভক্তিভরে শ্যামকে সেলাম করতে এসেছে? সইদা গ্রামের বৌ আর সে তহশীলদার সাহেবের ছেলে। সম্পর্কের এই ব্যবধান এবং দাসত্বের এই শৃঙ্খলকে

অস্বীকার করতে হলে কার্যকর প্রমাণ দিতে হবে তাকে। শ্যাম অকারণে রেগে গেল, তাহলে কি আমি সইদাকে মাথায় তুলে নাচবো? কিংবা ওর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলবো, "কমরেড সইদা, তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও। সমাজ তোমার ওপর যে অত্যাচার করেছে, তার জন্যে আমি লজ্জিত। নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। অতএব কমরেড সইদা তুমি আমার মুখে থুতু দাও, সর্বাঙ্গে থুতু দাও। ইনকিলাব জিন্দাবাদ...' হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল শ্যাম।

সইদা ঘাবড়ে গেল, 'কি হল সাহেব? কি হল?'

শ্যাম হেসে বলল, 'কিছু না, এমনি হেসেছি।...বোসো, বোসো... নতুন কিছু বলো...আসল কথাটা কি জানো সইদা...এটা আলিজু সাহেবের একটা...,' শ্যাম হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'ছুটিতে তো কাজকর্ম কিছুই ভালো লাগে না, তাই স্বপ্নের জগতে ঘোরাফেরা করি।'

'সবটাই ভাগ্য', সইদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, 'আমার তো কাজের শেষ নেই, শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়।'

'ঠিকই বলেছ, সবটাই ভাগ্য,' শ্যাম ওর কথায় সায় দিতে সইদা খুব খুশি, 'জানেন কি গ্রামে খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে এদিকে?'

'না তো, কি ব্যাপার?'

'ওই মোহন সিং আর চন্দ্রার ব্যাপারটা।'

যেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে এমন ভাব দেখাল শ্যাম।

সালওয়ারের ছোট্ট পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করল সইদা। ছোট্ট গোল কৌটো, ওপরে আধুলির মতো একটা আয়না। নিজের মুখটা দু-একবার দেখে নিয়ে ও এক টিপ নস্যি নিয়ে দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিল। পানের পিক ফেলার মতো করে নস্যির পিক ফেলে সইদা বলতে শুরু করল, 'ব্যাপারটা কি জানেন...।'

মেয়েদের নস্যি খাওয়াটা শ্যামের ভীষণ অপছন্দ ওর মুখে তারই অভিব্যক্তি দেখে সইদা বলল, 'মাড়ীতে একটা ব্যথা হয় বলে মাঝে মাঝে নস্যি লাগাতে হয়। ভাল কাজ দেয়।'

কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর সইদা আবার মুখ খুললো,

'গাঁয়ের ব্রাহ্মণ আর ব্যবসাদাররা মিলে ঐ মুসলমান ডাক্তারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে। ওপরওলাকে দিয়ে তদন্ত করাবে। চন্দ্রা বাজে মেয়ে, অচ্ছুৎ, গাঁ থেকে ওদের তাড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। নিজের মামা বর্তমান থাকতে কেন চন্দ্রা দেখাশোনা করবে মোহন সিংয়ের। স্বরূপকিষণ গাঁয়ের সবাইকে ডেকে এই ঝঞ্ঝাট পাকানো শুরু করেছে।'

শ্যাম বলল, 'ওপরওলারা বোকা নয় যে দরখাস্ত হাতে পেয়েই ছুটে আসবে। এরকম শত শত দরখাস্ত ওদের দপ্তরে জমা পড়ে। আমার বাবার বিরুদ্ধেও একবার দরখাস্ত গিয়েছিল, কি হলো তার? এক্ষেত্রেও কিছু হবে না। মোহন সিং চায় চন্দ্রা ওর দেখাশোনা করুক, ব্যস ফুরিয়ে গেল।'

'তাছাড়া আরও একটা কথা শুনছি, ওরা চন্দ্রার মাকেও লোভ দেখাচ্ছে, সইদা বলতে লাগল, 'চন্দ্রা নাকি এখনও নাবালিকা।'

'মিথ্যে কথা,' শ্যাম জোর দিয়ে বলল।

'তা জানি না। তবে এটাও শুনেছি ওরা চন্দ্রার মাকে দিয়ে মোহনের বিরুদ্ধে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মামলা করাবে। ডাক্তারও এতে ফেঁসে যাবে। মোহন সিং-এরও শাস্তি হবে। আমি জানি···ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মামলা ভীষণ ঝঞ্ঝাটের হয়।···তাছাড়া ধূর্ত স্বরূপকিষণ ভালো ভাবেই জালো বিছোচ্ছে। আজ চন্দ্রার সঙ্গে দেখা হলো, তাকেও খুব চিন্তিত দেখলাম।'

'ও কি···', শ্যাম জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, ও সব জেনে গেছে, ভীষণ বিমর্ষ হয়ে গেছে। মোহন সিংকেও জানাতে চাইছে না, কারণ পিঠের ঘা শুকোতে দেরী আছে, যদি উত্তেজনায় কোনো কিছু আবার বিগড়ে যায়।'

শ্যাম মাথা নেড়ে বলল, 'বুদ্ধিমতীর মতোই কাজ করেছে। তুমি খুব খারাপ খবর শোনালে সইদা।'

সইদা চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার কাছে কি একটা টাকা হবে···মেয়ের জন্যে জামার কাপড় কিনতাম···।'

কথা শেষ হবার আগেই একটা টাকা শ্যাম দিল। সইদা সেলাম

করে চলে গেল।

সন্ধ্যে বেলায় শ্যাম চন্দ্রাদের ব্যাপারটা মায়ের কাছে বলতেই মা ওকে এসব ব্যাপারে জড়াতে নিষেধ করলেন। রাতে বাবাও ওর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর 'উঁহ্' করে একটা শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোতে শুরু করলেন।

শ্যামের কিন্তু ঘুম আসছিল না। বাইরে বেরিয়ে দেখল মেঘে ঢাকা চাঁদের স্তিমিত আলোয় সারা প্রকৃতি যেন একটা ঘোমটা পরে দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকিয়ে থাকার পর শ্যাম বিছানায় এসে ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। বার বার তার চোখের সামনে চন্দ্রার বেপরোয়া আর সুন্দর রূপটা ভেসে উঠছিল। সে যেন চন্দ্রার এক বিশেষ সান্নিধ্য অনুভব করছে।

১৯

চন্দ্রা নিজের বাড়ী ফিরছিল। মা-মেয়েতে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে। বছরের পর বছর দুঃখ-কষ্ট আর আঘাত পেতে পেতে ওর মায়ের মন এখন একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সেই যে একের পর এক বিপদ তার জীবনে আসতে শুরু করেছে তার আর শেষ নেই। এখন বৃদ্ধ বয়সে যাতে অন্ততঃ শান্তির মুখটুকু দেখতে পায় তারই জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে চন্দ্রার মা। চন্দ্রা আর মোহন সিংয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে তার আর কোনো অভাব থাকবে না এমন আশ্বাস দিয়েছেন স্বরূপকিষণজী। এমন কি অন্য কোথাও চন্দ্রার বিয়ের ব্যাপারেও সাহায্য করবেন। চন্দ্রার মা সেই আশ্বাসেই এগোতে চায়।

চন্দ্রা কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই অন্য চোখে দেখছে। গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ, মহাজন, সরকারী অফিসার, স্বরূপকিষণ এমন কি সমাজকেও ও আর বিশ্বাস করে না। এতদিন অত্যাচার করার পর আজ এসেছে হিতৈষীর মুখোশ পরে। তার মা মূর্খ, তাই ওদের কথায় বিশ্বাস

করেছে। কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই ওরা যে মাকে লাথি মারবে এটা মা যে কেন বুঝতে পারছে না সেটা ভেবে কুলকিনারা করতে পারছে না চন্দ্রা।

'তোর বয়েস কম, তাই এটা ঠিক বুঝতে পারছিস না', চন্দ্রার মা বললো।

'এটা আমার ব্যাপার, আমি ঠিকই বুঝছি।'

'এটা ওদের ধর্ম, সমাজ আর সম্মানের প্রশ্ন। ওরা সব কিছু করতে পারে, এবং হয়তো তোকে এর জন্যে অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে।'

'ফুটো কড়িও মূল্য দেব না। তুমি নিজের সঙ্গে আমার জীবনটাও তিক্ততায় ভরিয়ে দিতে চাইছ। মোহন জেলে গেলে আমি কি বেঁচে থাকবো? না, আমি তোমাকে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি—মোহন আমার, 'আমার—আমার। কিছুতেই ওকে ছাড়ব না।'

'ও কি করে তোর হয়? এখনও তো বিয়ে হয়নি?'

'হ্যাঁ, বিয়ে হয়ে গেছে। মাটির বুকে, আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের বিয়ে হয়েছে। ঈশ্বর সাক্ষী আছেন।'

নিজের যৌবনকালের দিনগুলো মনে পড়ে গেল চন্দ্রার মার। এই ধরণের কথা সেও বলতো। রুক্ষ স্বরে বলল, 'ঈশ্বরই যদি সাক্ষী হবেন তবে সমাজ কেন আমাদের বিয়েটাকে মেনে নেয় নি। ঈশ্বরের সাক্ষী আজকাল কেউ মানে না। সমাজের স্বীকৃতি চাই।'

'সমাজের মুখে আগুন। কি সুখ দিয়েছে সমাজ আমাদের? মোহন আর আমি ঠিক করে নিয়েছি কি করব। ও ভাল হয়ে গেলে এই জায়গা ছেড়ে আমি আর ও পাঞ্জাবে চলে যাবো। পৃথিবীটা খুব বড় জায়গা মা, শুনেছি মীরপুর পর্যন্ত লরী এসে গেছে। লরীতে বসবো, আর যেখানে খুশি হুস করে চলে যাবো।

কিছুক্ষণের জন্যে মেয়ের কথায় এক স্বপ্নজগতে চলে গেল চন্দ্রার মা, তার পরই বলল, 'না রে, কাজটা ভালো হবে না। কাঁহাতক সমাজের বিরুদ্ধে লড়বি? ঐ করেই তো আমার জীবন গেল, তুইও ও পথে পা মাড়াস নে লক্ষ্মী মা আমার···।'

'আমাকে সান্ত্বনা দেবার বা ভোলাবার চেষ্টা কোরো না মা। সাবধান করে দিচ্ছি ওই পণ্ডিতের ফাঁদেও পা দিও না। ভুগতে হবে…।'

রাগে কথাটা শেষ না করেই চন্দ্রা চলে এসেছিল। কী বোকা তার মা? আচ্ছা পরে একবার ভাল করে বোঝানো যাবে তাকে।

নদী পার হয়ে এগোতে গিয়ে ওর মনে পড়ল পন্থাল বাঁধের একটা জলাধারের কাছে মোহনের ব্যাণ্ডেজগুলো রেখে এসেছে। ধুতে হবে। ভীষণ গরমও পড়েছে। জলাধারে যাই ধোয়ার কাজটাও হবে। স্নানও সারা যাবে।

জলাধারের কাছে নূরাঁর সঙ্গে দেখা। দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। মোহন সিংয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর সেই বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ ধুয়ে দুই সখীতে মিলে জলে নেমে মনের সুখে স্নান করল।

## ২০

ব্যাণ্ডেজের কাপড়টা চাদরে বেঁধে নিয়েছে চন্দ্রা। স্নান করার পর ওর শরীর যেন উপত্যকার বাতাসেরই মতো হাল্কা হয়ে গেছে, গুণ-গুণিয়ে গান গাইতে গাইতে পথ হাঁটছে। ধানের ক্ষেত পার হয়ে উপত্যকায় উঠছিল চন্দ্রা। দুপাশে লম্বা লম্বা ঘাস। হাত দিয়ে অনুভব করছিল এক অদ্ভুত কোমলতা। আর কয়েক দিনের মধ্যে কাটার যোগ্য হয়ে উঠবে ঘাসগুলো। তখন ঘাস কাটাই শুরু হবে, ঢাক-ঢোল বাজবে। কাস্তে নিয়ে পৌঁছে যাবে গ্রামের সব নারী-পুরুষ। এই জমিটা সরকারী অফিসের জমির সঙ্গে এক হয়ে আছে। তাই তহশীলদার সাহেব তাদেরও ডাকবেন ঘাস কাটার জন্যে। চন্দ্রাও নিশ্চয়ই যাবে, অসুবিধেটা কোথায়! যদিও সব অফিসারদের মতো এই তহশীলদারও ঘুষখোর, ধোঁকাবাজ লোক। এদের চন্দ্রা হাড়ে হাড়ে চেনে। গরীব কৃষকদের সব দুর্দশার মূলে এই অফিসারগুলো।

তবে শ্যাম ভিন্ন চরিত্রের ছেলে, ওর মধ্যে এদের বদগুণগুলো। এখনো ঢোকে নি। শ্যামের সঙ্গে কথা বলার সময় ওর মনে রাগ বা ঘৃণার ভাব জাগে না, যেমন জাগে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে। ওর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং চিৎকার করে বলতে চায় তোরা সব শয়তান···শয়তান···শয়তান।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল চন্দ্রাকে। সামনে স্বরূপকিষণের ছোট ভাই বসন্তকিষণ আসছে। লোকটা বদ চরিত্রের। সব সময় শিস দেয়, নদীর ঘাটে, পথে, মেয়েদের দেখলেই উঁকি-ঝুঁকি মারে। ব্রাহ্মণের কোনো গুণই নেই তার মধ্যে। গ্রামে বেদের দল এলে তো বসন্তকিষণের পোয়া বারো। চব্বিশ ঘণ্টা ওদের সঙ্গে কাটিয়ে দেবে। নেশা ভাঙ করবে।

আকৃতিতে আর হাসিতে স্বরূপকিষণের সঙ্গে মিল থাকলেও অন্য সব ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। দাদার বুদ্ধি বা রূপ কোনোটাই ছিল না তার, লেখাপড়াও শেখে নি, চাষের কাজেও মন দেয় না। মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করাই সবচেয়ে প্রিয় কাজ বসন্তকিষণের। পরণে লাঠ্‌ঠা কাপড়ের সালওয়ার, আর লাল ডোরাকাটা রেশমী জামা। বাঁ দিকে হেলানো পাগড়ী। চন্দ্রাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল বসন্ত কিষণ, 'আরে চন্দ্রারাণী, কোত্থেকে আসছ ?'

চন্দ্রা এই বদমাশটার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না, অথচ এক্ষেত্রে না বলেও উপায় নেই, 'মোহনের ব্যাণ্ডেজ ধুতে গিয়েছিলাম।'

হো হো করে হেসে উঠল বসন্তকিষণ, 'আর কতদিন মোহনের ব্যাণ্ডেজ ধোবে ?'

চন্দ্রা গলা চড়িয়ে বলল, 'ঈশ্বরের কৃপায় মোহন শিগ্‌গীরই ভালো হয়ে যাবে।'

'তখন ও কি চন্দ্রারাণীর দিকে ফিরে তাকাবে ?···সোজা বাড়ী চলে যাবে।'

চন্দ্রা রাগ করে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই বসন্তকিষণ বলল 'একটা কথা শুনে যাও প্রাণেশ্বরী।' ভীষণ রেগে গিয়ে চন্দ্রা বলল,

'আমি তোর প্রাণেশ্বরী নই রে হারামজাদা। শুয়োরের বাচ্চা, তোর মা···।'

'আহা···আহা···।' চন্দ্রার দিকে একটু ঝুঁকে বসন্তকিষণ বলতে লাগল, 'এতো গালাগাল নয়···ভগবানের দিব্যি বলছি··· চামেলীর ফুল···ফুল, রাণী।' তারপর চট করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল—'একটা কথা বলে রাখি, ঠাট্টা নয়। গাঁয়ের ব্রাহ্মণেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তোমাদের দুজনকে আলাদা করে দেবে। আমি অবশ্য তোমাকে সাহায্য করতে পারি··· '

'কী ভাবে করবে?' স্রোতে ভাসা মানুষের মতো একেই আশ্রয় করতে চাইল চন্দ্রা।

বসন্তকিষণ খপ্ করে চন্দ্রার হাত ধরে বলতে শুরু করল, 'প্রাণেশ্বরী, তোমাকে সাহায্য করব না তো কাকে করব? আহা···কী মোলায়েম হাত···।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে চড় কষালো বসন্তকিষণের গালে। ওর পাগড়ী পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তুলে মাথায় পরার আগেই চন্দ্রা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'আ হা হা···এতো চড় নয়। ফুল, চন্দ্রারাণী···ফুল···', নির্লজ্জ বেহায়ার মতো হাসতে লাগল বসন্তকিষণ।

বসন্তকিষণের এই দুর্ব্যবহারে চন্দ্রার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরে গেছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভয়ে নয় উত্তেজনায় কাঁপছিল থরথর করে। ঐ ভাবে কখন সে হাসপাতালে পৌঁছেছে জানে না। সোজা ওয়ার্ডে ঢুকে দেখল মোহন সিং খাটে আধশোয়া অবস্থায় যেন ওরই প্রতীক্ষা করছে। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না চন্দ্রার। খাটের বাজুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। যেন শত শত বছর ধরে আবদ্ধ কোনো আগ্নেয়গিরি এবার ফেটে পড়বার উপক্রম করছে। মোহন সিং আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?' অনেক চেষ্টা করে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সব কথা সে বলল মোহন সিংকে।

পায়রার চোখের মতো লাল হয়ে উঠল মোহন সিংয়ের চোখ। মনে হচ্ছিল শরীরের সারা রক্ত চোখে এসে জমা হয়েছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল তার। এক সময়ে কোনো কথা না বলে চোখ বন্ধ করল মোহন সিং।

'কয়েকটা দিনের ব্যাপার চন্দ্রা। ব্যস মাত্র কয়েকটা দিন', কেটে কেটে কথাগুলো বলল মোহন সিং।

'আমায় কথা দাও মোহন, কখনো আমায় ছেড়ে যাবে না', চন্দ্রার গলার স্বর বুজে আসছিল।

মোহন নিজের ডান হাত চন্দ্রার হাতের ওপর রেখে বলল, 'যত দিন বেঁচে থাকব, তোমাকে ছেড়ে যাবো না···চিন্তা কোরো না··· আর কয়েকটা দিনের ব্যাপার মাত্র···মাত্র কয়েকটা দিন···।'

মোহন মুখ বন্ধ করল। চোখও। চন্দ্রা বুঝতে পারল না কী ভাবছে মোহন সিং। ও আস্তে আস্তে গায়ে হাত বোলাতে লাগল মোহনের।

## ২১

আগস্টের অর্দ্ধেক পার হয়ে গেল। একদিন সকালে তহশীলদার সাহেব ঘাস কাটার আয়োজন করলেন। বিস্তৃত বাগানে; খোলা উপত্যকায় হলুদ রঙের ঘাস সর-সর করছে। সকাল বেলায় উঠে পড়েছে রবি আর নিম্মী। দড়ি দড়া বিতরণ করা হল, কাস্তেতে শান পড়ল। শ্যামের মাও আজ খুব ব্যস্ত। পঞ্চাশ-ষাটজনের খাওয়ার আয়োজন করতে হবে। গুড়ের সরবৎ আর লস্যিও থাকা চাই।

ঢুলিকাররাও হাজির। শ্যামের বাবা বাড়ীর মধ্যে এসে বললেন, 'নাও ঢোলও এসে গেছে, এবার কি শানাই আনবো?'

শ্যামের মা মিষ্টি হেসে বললেন, 'শানাই বাজবে নিশ্চয়ই, তবে সেটা ছেলের বিয়েতে। তখন কিন্তু আমি প্রত্যেকের বাড়ীতে সওয়া সের করে মিছরী পাঠাবো।'

'আমি তো বেশি নেবো', ছায়া হাসতে হাসতে বলল, 'ছেলের মাসী না আমি?'

'তোমার কথা আলাদা', শ্যামের মা বললেন।

আজকের এই ঘাস কাটা উৎসব উপলক্ষ্যে ছায়া আর বন্তীরও নিমন্ত্রণ হয়েছে।

ঘাস-কাটাদের তুটো দল তৈরী হয়ে গেল। একটা গঙ্গু মিশিরের দল, অন্যটা তুল্লার। যতোটা জায়গায় ঘাস কাটা হবে, সেটাকে তুভাগ করে তুদলের ওপর ভার দেওয়া হল। একটা দলের সর্দার গঙ্গু মিশির, অন্যটার তুল্লা। তু'দলেই চল্লিশ-পঞ্চাশ জন করে লোক। গঙ্গু মিশিরের দল একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করবে, আর তুল্লার দল মাঠের মাঝামাঝি থেকে। যে আগে শেষ করবে জয়ের সম্মান তার।

এই ঘাসকাটার উৎসব শ্যামের ভীষণ ভালো লাগল। এখানে এই উৎসবে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সবাই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। এই অদ্ভুত একতা কি করে সম্ভব? শ্যামের মনে হল—মানুষ যতো মাটির কাছে আসে, ততই অন্য মানুষ তার আত্মীয় হয়ে ওঠে।

ঢোল বাজতেই কাজ শুরু হয়ে গেল। কাস্তে চলতে লাগল দ্রুত গতিতে। মাঝে মাঝে তু-একটা কথা, হাসি।

শ্যাম দেখতে পেল এক জায়গায় সইদা, চন্দ্রা আর নূরাঁও কাস্তে চালাচ্ছে। ওরা বাজী রেখে ঘাস কাটছিল। সবাই জানে চন্দ্রার সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত, তবুও বাজী ধরতে আপত্তি কি।

একটু পরে সইদা পিছিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলার পর চন্দ্রাকে পিছনে ফেলে নূরাঁকে এগোতে দেখা গেল।

নূরাঁ আগে পৌঁছে গেছে, তার মানে ও চন্দ্রাকে হারিয়ে দিয়েছে। একটু পরে শেষ সীমায় চন্দ্রাও পৌঁছলো। কিন্তু একি চেহারা তার, ক্লান্ত অবসন্ন, মুখ ঘেমে গেছে। একটু চিন্তিত হলেও ঠাট্টা করতে ছাড়ল না নূরাঁ।

'কি রে চন্দ্রা, কোনো গণ্ডগোল বাঁধাস নি তো?'

চন্দ্রার মুখ রাগে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, 'দূর হয়ে যা ডাইনী।'

,ওপাশে ঢোল বেজে চলেছে ক্রমশঃ দ্রুততালে। শ্যামের ইচ্ছে হচ্ছিল হাতে কাস্তে নিয়ে সেও নেমে পড়ে মাঠে। ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় নিয়ে সে যেন তার মধ্যবিত্ততার অভিমানকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে পারবে।

তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে একটা কাস্তে হাতে নিয়ে শ্যাম চলে এলো গঙ্গু মিশিরের কাছে, 'আমাকেও ঘাস কাটতে শেখাও।'

গঙ্গু মিশির ওকে আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'বাবু সাহেব, ভগবান না করুন আপনাকে কখনো ঘাস কাটতে হয়।'...কেন এসব চিন্তা করছেন! চেয়ারে বসে আমাদের নাটক দেখুন।'

'না...না...গঙ্গু মিশির, দয়া করে আমাকে একটু শিখিয়ে দাও।'

'পারবেন না, ভীষণ কষ্ট হবে...ঠিক আছে যখন বলছেন...', গঙ্গু জম্মা চৌকিদারকে ডেকে বলে দিল শ্যামকে ঘাস কাটা শেখাতে।

অন্য একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল শ্যামকে জম্মা চৌকিদার দু-চারবার দেখাতেই শ্যাম চট করে শিখে ফেলল।

অনেকক্ষণ কাস্তে চালাবার পর শ্যাম বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এদিক...ওদিক তাকাতেই দেখল একটু দূরে বন্তী দাঁড়িয়ে জল দিচ্ছে সবাইকে। একদৃষ্টে শ্যাম তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। একটু পরে চোখে চোখ পড়তেই বন্তী লজ্জায় মুখ নামাল। শ্যাম ওকে ডাকল।

বন্তী যেন হাওয়ায় ভেসে চলে এল ওর কাছে। গাল লাল হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে।

'আজ্ঞে, কি চাইছেন?'

'তেষ্টা পেয়েছে।'

'কী খাবেন? জল, লস্‌সী না সরবৎ?' বন্তী একটু হাসল।

'ঠাণ্ডা জলই খাওয়া ভাল।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসে করে জল আনল বন্তী।

শ্যাম মাথা নাড়ল। 'দেখছো না ঘাস কাটছি। আজ হাতে করে জল খাবো। আর এক গ্লাসে তেষ্টা মিটবে না, পুরো বালতি আনো।'

দু-হাতের অঞ্জলিতে বন্তী জল ঢালছে, আর শ্যাম খেয়ে চলেছে। তেষ্টা মিটে যাবার পরও অঞ্জলি পেতেই থাকলো, আর বন্তী জল ঢেলে চলেছে। জল গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে?'

'না তো। মন চাইছে অনন্তকাল ধরে এইভাবে আঁজলা পেতে থাকি, আর তুমি জল ঢেলে যাও।'

বন্তী চঞ্চল হয়ে উঠল, 'খেতে থাকুন না, কে আপত্তি করছে। কিন্তু মনে রেখো ঠিকমতো ঘাস কাটবে, তা না হলে খেতে পাবে না।'

দুজনেই জোরে হেসে উঠল। শ্যাম আবার কাস্তে তুলে নিয়েছে। বন্তী খুব আস্তে, প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'আমি এবার যাই?'

শ্যাম ঘাস কাটতে কাটতে বলল, 'বন্তী।'

'বলুন।'

'বন্তী।'

'বলুন।'

'বন্তী।'

'বলুন।' দ্বিতীয় মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা না করে সে ছুটে পালিয়ে গেল ওখান থেকে।

ভীষণ খুশি মনে মহোৎসাহে কাস্তে চালাতে গিয়ে 'ইস' করে উঠল শ্যাম। আঙুল কেটে গেছে। বেশ রক্ত পড়ছে। শ্যাম মুখ তুলে তাকাল, দূরে নূরাঁ, সইদার সঙ্গে চন্দ্রা কথা বলছে—কী জানি কেন আঙুলের কথা ভুলে শ্যাম আস্তে আস্তে ঘাস কাটা শুরু করল।

## ২২

সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা আগে ঢুলীরাও দুদলে ভাগ হয়ে গিয়ে গঙ্গু মিশির আর দুল্লার দলের পিছনে দাঁড়িয়ে জোর দমে বাজিয়ে চলেছে ঢোল। তখনও পর্যন্ত ঘাস-কাটিয়েদের দল দুটো সমানে-সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এই এক ঘণ্টায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

ক্রমশঃ দেখা গেল তুল্লার দল ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে গঙ্গুর দলকে পিছনে ফেলে। এবং সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে তুল্লা বাজী জিতে নিল। তার দল কাজ শেষ করে ফেলেছে। তুল্লা ছুটে চলে এলো গঙ্গু মিশিরের সামনে, তারপর কবাডি খেলার মতো ভঙ্গী করে গঙ্গুকে ঘিরে দৌড়তে লাগল, আর মুখে বলতে লাগল'…তা রা…রা… রা…চুক্…চুক্…'

আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন প্রলাপ, কিন্তু যারা জানে তারা বুঝতে পারছে পরাজিতকে তাচ্ছিল্য করা হয় এইভাবে।

গঙ্গু হাতজোড় করে হার স্বীকার করে নিতেই, তুল্লার দল গঙ্গুর দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিল।

চটপট কাটা ঘাসগুলো বড় বড় আঁটি করে বাঁধা হয়ে গেল। এবার খাবার পালা। গোলাম হুসেন জানাল বারোজন লোক রান্না প্রায় শেষ করে এনেছে। এখুনি খেতে দেওয়া হবে।

পেট ভরে খাওয়ার পর অনেকে বাড়ী চলে গেল, তবে বেশির ভাগই ঘাসের আঁটিতে ঠেসান দিয়ে, কেউ ঘাস বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে নানা গল্পে মত্ত হয়ে উঠল।

নানা কথার মধ্যে এক সময় গঙ্গু মিশির হঠাৎ বলে উঠল, 'তুল্লা তুমি জিতেছ ঠিকই, তবে এটাও তো ঠিক আমার দলে অনেক বেশি মেয়ে ছিল…', 'ওর কথা শেষ হবার আগেই চন্দ্রা প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমরাও তোমাদের মতোই সমানে কাস্তে চালিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা হয়ে যাক।'

সবাই হেসে উঠল ওর কথায়। গাল-গল্পে কখন যে রাত বারোটা বেজে গেছে খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে ভীড় কমে আসছে। শ্যাম বাড়ী ফিরছে, একবার ফিরে তাকাল মাঠের দিকে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক। মাতা ধরিত্রী যেন ডাকছেন তাঁর সন্তানদের —আয়, মায়ের কোলে এসে শুয়ে পড়…এখানে ভয়ের কিছু নেই।

হ্যাঁ, শ্যাম জানে এখানে ভয় নেই, থাকতে পারে না। ভয়ের বাসা ঐ বাংলোবাড়ীতে, যেখানে রাতে চৌকিদার পাহারা দেয়।

## ২৩

পীরের মেলার আর একদিন বাকী ; শ্যামের বাবা দারোগাকে নিয়ে মেলার আয়োজনের তদারকী করে এসেছেন। আসে-পাশের গ্রাম থেকেও বহু লোক আসে এই মেলায়। রবি আর নিম্মীরও নতুন জুতো-জামা হয়েছে।

বিকেলের দিকে চা খেয়ে শ্যাম আর আলিজু নদীর তীরে বেড়াচ্ছিল। আলিজু ডাক্তারে ব্যাপারে বেশ চিন্তিত। কারণ ওপরওলা এবারে আর চুপ করে বসে না থেকে ব্রাহ্মণদের অভিযোগ-পত্রের উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছেন। যদি তদন্ত কমিশন বসে যায় তাহলে ডাক্তার বিপদে পড়বে।

'কিন্তু ডাক্তার তো সম্পূর্ণ নির্দোষ,' শ্যাম বললো।

আলিজু জানালেন যে ডাক্তার অবশ্য লিখে জানিয়ে দিয়েছে মোহন সিংয়ের ইচ্ছেতেই চন্দ্রাকে ওয়ার্ডে থাকতে দেওয়া হয়েছে। আর চন্দ্রার নাবালিকত্ব সম্বন্ধে ডাক্তারের বক্তব্য—ওটা তো যাচাইয়ের ব্যাপার, আগে থাকতে কিছু বলা অন্যায়।

শ্যাম মাথা নাড়ল, 'তাতো ঠিকই, ডাক্তারের যুক্তি অকাট্য এবং সত্যি।'

'কিন্তু শ্যাম সাহেব, পৃথিবীতে যা উচিত এবং ন্যায়সঙ্গত তা কি সব সময়ে সঠিক মূল্য পায়? বিশেষ করে যেখানে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিষয় জড়িয়ে আছে? কথাটা কিন্তু সত্যি। আপনি কলেজের ছাত্র, বয়েস কম এসব ঠিক বুঝবেন না। এই দেখুন না কেন, আমি পাঁচবছর থেকে প্রমোশন পাচ্ছি না, কেন? না, আমি মুসলমান। অথচ আজে-বাজে হিন্দুগুলো···'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর আলিজু আবার মুখ খুললেন, 'মানছি, উভয় পক্ষের মনেতেই বিষ আছে। সুযোগ পেলেই একে অপরের মুণ্ডু কাটতে তৈরী হয়ে যাবে।'

'আপনিও কিন্তু যুক্তির বদলে, ভাবাবেগের বশবর্তী হচ্ছেন আলিজু সাহেব। এটা যতোটা না ধর্মীয় ব্যাপার, তার চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক ও আর্থিক। তা না হলে মুসলমান কখনো মুসলমানকে খুন করত না, বা, হিন্দু হিন্দুকে।...চাকরীর ব্যাপারটাই নিন না কেন... ?'

আলিজু অত্যন্ত বিষণ্ন, তাই কোনো তর্কের মধ্যে যেতে চাইলেন না। শ্যাম আন্দাজ করল হয়তো সম্প্রতি প্রমোশনের ব্যাপারে আবার কিছু একটা হয়েছে। প্রসঙ্গ পাল্টাতে সে প্রশ্ন করল, 'কাল মেলায় যাচ্ছেন তো ?'

'না।'

'কেন ?' শ্যাম একটু আশ্চর্য হয়েছে, 'অন্য সব অফিসাররা তো যাচ্ছেন। এমন কি যাঁদের যাবার প্রয়োজন নেই, তাঁরাও একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে যাচ্ছেন। তা ছাড়া আপনি তো এই এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার যাওয়া তো আরও দরকার।'

'না। যাচ্ছি না। তহশীলদার সাহেব তো গেছেনই। তাছাড়া এখানকার অফিসের কাজ কে দেখবে সবাই চলে গেলে।'

'না, না, চলুন। আমরা সবাই যাচ্ছি, আমার মা, ভাই বোন তো যাচ্ছেই। সেই সঙ্গে ছায়া দেবী, আর বস্তীও। বেগমকে নিয়ে আপনিও চলুন।'

আলিজু কথাটাকে পাত্তাই দিলেন না। দুজনে নদীর ধারে পায়চারি করতে লাগলেন চুপচাপ। হঠাৎ এক সময় আলিজু বলতে শুরু করলেন, 'আসল ব্যাপারটা কি জানেন শ্যাম সাহেব, জীবনে প্রেম আর ঘৃণার চেয়েও বড় একটা জিনিষ আছে, তার নাম টাকা। সততা, যোগ্যতার চেয়েও বড় হল টাকা পয়সা। আমার তো মনে হয় টাকার শক্তি অসীম', তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'এবার রহস্যটা বলি আপনাকে—অন্য হিন্দু নায়েব তহশীলদাররা বড় অফিসারদের ঘুষ খাইয়ে প্রমোশন বাগিয়ে নিয়েছে, আর আমি এদিকে এত খবর না রেখে পাঁচ-ওয়াক্ত নমাজ পড়ে কাটিয়েছি।'

শ্যাম একটু হাসলো, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম এটা ধর্মের

ব্যাপার না, টাকা পয়সার ব্যাপার। ধর্মের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বৈশ্য সভ্যতার সোনালী জালে আটকে পড়েছে। হিন্দুই হোক, বা মুসলমান, সকলেরই যাচাই হবে অর্থের কষ্টিপাথরে। যন্ত্রের যুগে এটাই তো সেরা মাপকাঠি! মুখে ভাই-ভাই বললে এই বিভেদ দূর হবে না। সমস্যারও সমাধান হবে না। সম্পত্তি, নগদ টাকা কড়ি, এবং এই ধরণের অনেক কিছুর সমাধান হওয়া জরুরী। এগুলো না হলে তো ভাই-ভাইয়ের বিবাদ মিটবে না।'

'কথাটা ঠিক। কিন্তু যদি ঐ সমস্যাগুলোর সমাধানের পরও আলাদা থাকতে চায়, যেমন ভাইরা আলাদা হয়ে যায়, তবে?'

'তবে আলাদা থাকাই ভাল। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'তাহলে শ্যাম সাহেব আপনি হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা হয়েই থাকতে বলছেন?'

'না, আমি তো এদের ভাই মনে করি। শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন, সারা পৃথিবীর লোককেই আমি নিজের ভাই মনে করি। সকলে একসঙ্গে মিলে-মিশে এক নতুন সভ্যতা, এক নতুন জীবন-যাত্রার পদ্ধতি, আর এক নতুন শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের জন্ম দিক এটাই আমি দেখতে চাই। তাহলে কেন আমি হিন্দু আর মুসলমানদের আলাদা হয়ে থাকার অধিকার দিতে চাইছি? আমার মতে এটা দরকার।

যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ নিজের জন্যে যে-সব অধিকারগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে চায়, সেগুলো অন্যদের না দিচ্ছে ততক্ষণ পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। অতএব আমার মতে আলাদা হয়ে থাকার অধিকারকে মেনে নেওয়া উচিত। যদি একটা দেশকে দশ-বিশ টুকরোর ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু দেশের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান হয় না। ইউরোপে এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে। ওখানে কখনো কখনো একটা দেশকে সাত-আট অংশে ভাগ করা হয়েছিল, আবার কখনো অনেকগুলো দেশকে মিলিয়ে এক করাও হয়েছিল। কিন্তু শুধু ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণের দুঃখ দূর করা যায় না। এতে আর্থিক অবস্থারও পরিবর্তন হবে না, মানুষের দাসত্বও

ঘুচবে না।'

'তারপর?' 'আলিজু আজ যেন কথা বলতে চান না, শুধু শুনতে চান, তারপর কি হবে?···একই সঙ্গে তুরকম কথা বলছেন কেন? এই বললেন আলাদা-আলাদা থাকা দরকার, এখন বলছেন তাতে কোনো লাভ হবে না। লাভ হয় না এমন উপদেশ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি?'

শ্যাম বলল, 'আমি বলেছিলাম আলাদা থাকা সর্বাগ্রে এক ধরণের মানসিক প্রস্তুতি। যেমন ধরুণ, এক ভাই আলাদা থাকতে চায়, অন্য ভাই এটাকে খারাপ মনে করে। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য নিজেদের বক্তব্য নিয়ে তুই ভাইয়ের উচিত হবে ঝগড়া না করা। তুজনেই আলাদা থাকুক। এইবার শুরু হবে মানসিক প্রস্তুতি—যে ভাই আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে বিব্রত করা উচিত হবে না, সে কোনো এক সময়ে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবে আলাদা থাকার বিপদ কত। যতক্ষণ না সে এটা বুঝছে, আলাদা থাকতে দাও তাকে। এরপর আমি একটা কথাই বলব—ইতিহাস আর মানুষের অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মূল সমস্যার সমাধান কখনই হয় নি, হবে না। যে এখনও এটা বিশ্বাস করে না, তাকে পরীক্ষা চালিয়ে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার সময় দেওয়া হোক।'

'কিন্তু কতো দিনে এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে?'

'যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ অন্য মানুষকে সেই সব অধিকার দিতে রাজী হবে, যে অধিকারগুলো সে নিজের জন্যে সুরক্ষিত করে রাখতে চায়।'

আলোচনা শেষ হল। অথচ শ্যামের মনে হচ্ছিল এই তো তর্কের শুরু। এই সমস্যাটা নিয়ে আগেও সে অনেকবার চিন্তা করেছে। আজ চিন্তিত আলিজুর মুখের ভাব দেখে নতুন করে ভাবাচ্ছে তাকে। হয়তো এই সমস্যাটা নিছক আর্থিক নয়, অন্য ভাবনাও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তুদিক দিয়েই একে দেখতে হবে। জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় ভেদ-ভাব এই অন্ধ-বিশ্বাসের ভিত্তির ওপরেই দাঁড়িয়ে। এশিয়াবাসীরা ইউরোপীয়দের মূর্খ, নির্বোধ, হীনমনা আর প্রতারক মনে করে।

আবার ইউরোপীয়রা আমাদের অকর্মণ্য ও হীনবীর্য বলে উপহাস করে। অনেক হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে এই ভিত্তির বিচারেই ঘৃণা করে। যেমন যে কোনো দেশের খ্রীষ্টানরা ইহুদীদের দু-চোখে দেখতে পারে না। অথচ শুধু এই বিচারে সবাইকে আলাদা করে রাখার বিষয়টিও কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান করবে না। আবার মিলিয়ে দিলেও লাভ হবে বলে মনে হয় না। সব মানুষের মধ্যে আর্থিক অবস্থায় সমতা এলে জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং ধার্মিকতায় দৃষ্টিকোণের বিচারে ততটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। এবং ঐ পরিবর্তন ঘটাতে হলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ও মনোজগতে ঘটাতে হবে বিপ্লব।

সমস্যাটা জটিল, বিপ্লব আসবে কিভাবে? মাথা ব্যথা করিয়ে দেয়। তার চেয়ে পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর—সুন্দর আকাশ ভরা তারা, সুরভিত ফুলের রূপ, পাতলা ঠোঁটে আলতোভাবে লেগে থাকা হাসি—এগুলোর মধ্যে ডুবে থাকাই ভাল।

২৪

পরদিন সূর্যোদয় হবার আগেই শ্যামরা বেরিয়ে পড়ল মেলায় যাবার জন্যে। সমস্ত উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছে স্বর্ণাভ আভা। আকাশে জোড়ায় জোড়ায় পায়রা। নিজেকে খুব হালকা লাগছিল শ্যামের। বাতাসে হিমেল স্পর্শ, এইজন্যে আগস্ট মাসটা এত ভাল লাগে শ্যামের, প্রকৃতিতে যেন কুমারী মেয়ের লাবণ্য আর মাধুর্য ছড়িয়ে থাকে এই সময়। মনের আনন্দে শিস দিতে শুরু করল সে। একটু পরে লাগাম আলগা করে ঘোড়ার গতি কমালো।

দল ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে সে। ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সবার আগে গোলাম হুসেন, তারপর ঘোড়ার পিঠে রবি আর নিম্মী। ওদের ঘোড়ার সঙ্গে সহিস আছে। তারপর মা আর ছায়া মাসী খচ্চরের পিঠে, তাঁদের পর বন্তী আর সবার শেষে পায়ে হেঁটে আসছে চাকর, তার কাছে খাবার-দাবার।

পুরো দলটা শ্যামের পাশ দিয়ে এগোতে লাগল। রবি দূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে বলল, 'দাদা, ওটা বরফ না? সত্যি?'

শ্যাম ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'তুমি আমাদের ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছ কেন? সঙ্গে সঙ্গে চলো,' শ্যামের মা বললেন অনুযোগের সুরে।

'ঐজন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি', শ্যাম হাসল।

বন্তীর ঘোড়া কাছে আসতেই শ্যাম তার সঙ্গ নিল। দুজনেই লাগাম ঢিলে করে আস্তে আস্তে হাঁটাচ্ছিল ঘোড়াদের। বন্তী আজ সাদা সিল্কের সালওয়ার আর কুর্তা পরেছে। হাতে সোনার চুড়ী। নিটোল ফরসা হাতের রূপ তাতে আরও অপরূপ হয়ে উঠেছে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কারুর মুখে কথা নেই।

দলটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, এমন কি পিছনের চাকরটাকেও দেখা যাচ্ছে না। শ্যাম পিছনে ফিরে তাকাল, পূর্ব আকাশে আলোর ছোপ পড়ছে।

'যে কোনো মুহূর্তে সূর্য উঠে যাবে,' শ্যাম বলল আপন মনে।

বন্তী অন্যদিকে মাথা নিচু করে তাকিয়েছিল, উত্তর দিল না। ওর সুন্দর লম্বা ধপধপে ফর্সা গলাটা যেন প্রতিপদের চাঁদের মতো। শ্যামের গলায় কি যেন আটকে গেছে।

পাশাপাশি ঘোড়া দুটো চলছে। শ্যাম হাত বাড়িয়ে বন্তীর একটা হাত ধরল—সূর্য বেরিয়ে এসেছে। প্রথম সূর্যের আলোয় যেমন আকাশে লালের ছোপ লাগে, বন্তীর গালেও তেমনি গোলাপী আভা ফুটে উঠল। ঠোঁটের প্রান্তদেশ কাঁপছে। বন্তীর স্পর্শে এক অনুভূতি আচ্ছন্ন করে তুলছিল শ্যামকে।

ঘোড়া দুটোও নিঃশব্দে চলছে। বন্তী আর শ্যামের হাত এমন ভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে যেন কোনো শক্তিই তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। দুজনের হাতের মধ্য দিয়ে একই তরঙ্গ, একই লয়—এবং কোথায় তাদের শুরু আর কোথায় তাদের শেষ একথা যেন কেউ বলতে পারবে না।

হঠাৎ দুজনের মনে অদ্ভুত এক আনন্দের শিহরন জাগল, দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে গোড়ালি দিয়ে খোঁচা মেরে ঘোড়া ছোটালো। দলের সঙ্গে থাকা ভালো।

হঠাৎ বন্তীর ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল, কিছুতেই এগোবে না। পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে ধনুকের মতো বেঁকে উঠেছে। ঠিক সেই সময়ে ওর লাগামটা শ্যাম না ধরে নিলে কি হতো কে জানে।

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও…,' বন্তী বলল, 'হতভাগাটাকে এখুনি শায়েস্তা করছি।' দুবার চাবুক পড়ার পরই বন্তীর ঘোড়া তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শ্যাম আর বন্তী যখন আবার দলের কাছে এল, তখন মা বললেন, 'এ কিভাবে ঘোড়া ছোটাচ্ছো। কখনো আস্তে, কখনো জোরে। পাহাড়ী রাস্তা, নিচে খাদও আছে। আর বন্তীরই বা হোলো কি আজ? বেটাছেলেদের মতো ঘোড়া ছোটাচ্ছো, পড়ে গিয়ে নাক মুখ ভাঙ্গলে বিয়েই হবে না মা।'

সবাই হেসে উঠল। ছায়া বললেন, 'আমার ঐ মেয়ের তো ছোটবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়ার শখ। ওর বাবা ওর জন্যে সব সময়ে ঘোড়া বা খচ্চরের ব্যবস্থা করে রাখতেন। এখন বড় হয়ে চড়ে না অতো, তবে গাছে চড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় ও পাকা ওস্তাদ।' কন্যাগরবে গরবিনী মাতা।

রাস্তা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে উঠছে। কখনো বেশ ঢাল, কখনো চড়াই। মাঝেমাঝে পথ এত সরু যে পাশাপাশি ঘোড়া যেতে পারে না। এই ভাবে যেতে যেতে ওরা আবার পিছিয়ে পড়েছে।

'তেষ্টা পেয়েছে,' বন্তী বলে বসলো।

'কিন্তু কাছাকাছি কোথাও ঝর্ণা দেখতে তো পাচ্ছি না,' শ্যাম চারপাশে তাকায়।

অনেক নিচে রূপোলী ফিতের মতো নদী বয়ে চলেছে উপত্যকার বুক চিরে। সেদিকে তাকিয়ে বন্তী আবার বলল, 'ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

এগোলে কিছু একটা পাওয়া যাবে এই আশ্বাস দিয়ে শ্যামরা ঘোড়া ছোটালো। কিছুদূরে একটা নালা, কিন্তু জল নেই। সেখানে এক কৃষকের সঙ্গে দেখা। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানালো কিছুদূর এগোলেই পাওয়া যাবে। কৃষকটি চলে যাবার আগে বলল, 'আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?'

'পীরের মেলায়।'

'তাহলে তো হুজুর আপনি পথ ভুল করেছেন। আসল রাস্তা ঐ নিচে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে ঐখানে গিয়ে জল খেয়ে নিন, তারপর পাশেই একটা পাকদণ্ডী আছে তাই ধরে নেমে গেলে মেলার পথটা পেয়ে যাবেন।'

ছোট্ট একটা ঝর্ণা, আশেপাশে গাছ আর লতা-পাতার ঝোপ। বেশ শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ।

দুজনে পেট ভরে জল খেল। তারপর বন্তী নরম ঘাসের ওপর বাঁ হাতে মাথা রেখে আস্তে আস্তে গা এলিয়ে দিল।

'ওভাবে শুয়ো না, তোমার মাথার মালা নষ্ট হয়ে যাবে,' শ্যামের মনে হল, অন্য কোনো এক পুরুষ তার হয়ে কথা বলছে।

'যাকগে। আবার ঠিক করে নেব।'

বন্তী চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, মৃদু নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠা-নামা করছে ওর বুক। শ্যাম জোর করে অন্যদিকে চোখ ফেরালো। এই লতাটার নাম কি? এই ফুলে গন্ধ আছে কি? মনকে ভীষণভাবে অন্যমনস্ক করতে চাইছিল শ্যাম।

কখন যে শ্যাম বন্তীর খুব কাছে চলে এসেছে জানে না। হঠাৎ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে এক অদ্ভুত স্বরে শ্যাম ডাকল, 'বন্তী।'

কোনো উত্তর নেই। একই ভাবে শুয়ে আছে বন্তী। আবার ডাকল শ্যাম। বন্তীর নিঃশ্বাস দ্রুততর হচ্ছে। চোখের পাতা কাঁপছে প্রজাপতির পাখার মত। নিজের অজান্তে শ্যামের ঠোঁট নেমে এলো বন্তীর ঠোঁটের ওপর। অনেকক্ষণ ঐভাবে থাকার পর শ্যামের ঠোঁট বন্তীর গাল, গাল থেকে শঙ্খ-ধবল গলায়, ঘাড়ে বিচরণ করতে লাগল।

ঘাড়ের একটা জায়গায় হঠাৎ কুট করে দাঁত বসিয়ে ফেলল শ্যাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল চুনীর মতো রক্তবিন্দু…

সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর এক জগতে চলে গেল শ্যামের অন্তরাত্মা। সবুজ উপত্যকার বুক স্পর্শ করে বয়ে আসা বাতাস যেন নবযুবতীর মতো আলিঙ্গন করছিল শ্যামকে।

২৫

শ্যামের মা সন্দেহের চোখে ছেলেকে জরীপ করতে করতে বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, 'এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে?'

'আরে তোমরা তো এগিয়ে গিয়েছিলে, আবার পিছন থেকে এলে কি করে?' ছায়াও চিন্তিত।

শ্যাম বলল, 'মাসী, আসলে আমরা পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম। একটা কৃষকের দেখা না পেলে কোন্ দিকে যে যেতাম ভগবান জানে।'

শ্যামের মা সরল মনে একথা বিশ্বাস করে নিলেন, 'না, না, আর একলা যেয়ো না, এই পাহাড়ী রাস্তাগুলোয় ভীষণ বিপদ থাকে। সঙ্গে সঙ্গে থাকো।'

'ঠিক আছে মা।'

পুরো দলটা এক ভাবে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে শ্যাম বন্তীর দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছিল। এবং বন্তীও লজ্জা পেয়ে ঘাড়ের সেই লাল বিন্দুটাকে নানা ছলে ঢাকার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছিল, অথচ ওটা সহজে কারুর নজরে পড়ার কথা নয়।

পথে অনেক কৃষকের দলের দেখা মিলতে লাগল। বেশীর ভাগ মানুষের জুতো বগলে উঠেছে। খদ্দরের জামা-কাপড়, চোখে কাজল, সে এক বিচিত্র সাজে সেজেছে সবাই।

গোলাম হুসেন বলল, 'সাহেব, পীরের মেলা থেকে দু-আড়াই ক্রোশ দূরে দেখার মতো একটা জায়গা আছে। লোকে 'রামকুণ্ড'

বলে। ব্রাহ্মণরা বলে যে রামচন্দ্র যখন ১৪ বছর বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন একবার এখানে আসেন। জায়গাটা কিন্তু সত্যিই দেখার মতো। আগে ওটা দেখে নিন, পরে মেলায় যাবো।'

শ্যামের মায়েরও ইচ্ছে আগে তীর্থটা সেরে নেওয়া ভালো। শ্যাম মনে মনে হাসল, ইতিহাস যা বলে তাতে রামচন্দ্র বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের দক্ষিণ দিকেই বনবাসে ছিলেন, এই পূর্বাঞ্চলের জঙ্গলে এসেছিলেন কি? আসুন বা না আসুন রামকুণ্ড তীর্থস্থানটি ভারী সুন্দর। চারপাশে পাহাড়, মাঝে ছোট্ট একটা উপত্যকা। বিশাল পাথরের ওপর পাথরের তৈরী মন্দির। দেওয়ালে-দেওয়ালে শ্যাওলা। চুন-সুরখী ছাড়াই কি করে যে পাথরগুলো জোড়া হয়েছে শ্যাম ভেবে পেল না। প্রায় হাজার বছরের পুরনো মন্দির।

মন্দির-প্রাঙ্গনে পাথর কেটে তুটো কুণ্ড তৈরী করা হয়েছে। খুবই গভীর, এবং সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। তুটি কুণ্ডের মাঝখান থেকে নির্মল জলস্রোত বেরিয়ে আসছে অবিরাম। ডানদিকের কুণ্ডটা বাঁ দিকের চেয়ে বড়। বড়টা রামকুণ্ড, ছোটটার নাম লক্ষণকুণ্ড। এই তুই কুণ্ডের একপাশে পাথর কেটে নিচে নেমে যাবার সিঁড়ি তৈরী করা আছে।

ভীষণ অন্ধকার এখানে, যত নিচে নামা যায়, অন্ধকার তত বাড়ে। শ্যামেরা নিচে নামছিল। জায়গাটা ছায়ার আগে দেখাছিল বলে তিনিই সবার আগে পথ দেখাচ্ছেন। তারপরেই রবি আর নিম্মীর হাত শক্ত করে চেপে শ্যামের মা; তাঁর পিছনে বন্তী, সবার শেষে শ্যাম। অন্ধকারের সুযোগে শ্যাম চেপে ধরেছে বন্তীর হাত।

ছায়া নামতে নামতে বলে চলেছেন এখানকার ইতিহাস। হঠাৎ উনি দাঁড়িয়ে পড়ে দেশলাই জ্বালালেন, শ্যাম সঙ্গে সঙ্গে বন্তীর হাত ছেড়ে দিল।

এইবার ওরা পৌঁছে গেছে একটা ছোট কুণ্ডের সামনে। মাঝারি সাইজের একটা ঘরের মাঝখানে এই কুণ্ড। এর নাম সীতাকুণ্ড। দেশলাই নিভে যেতেই শ্যাম বন্তীর কোমর জড়িয়ে ধরল।

ছায়া আবার দেশলাই জ্বালতেই শ্যাম চট করে হাত সরিয়ে নিল। বন্তী কিছুতেই হাসি চাপতে পারল না। ছায়া মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে দেখে বলে উঠলেন, 'ছি, ছি···কি আক্কেল, তীর্থস্থানে এসেও হাসি? আজকালকার মেয়েরা বড় বেহায়া।'

'ঠিক বলেছ মাসী, আজকালকার মেয়েদের দেখলে তো আমি নাক-কান মুলি···ধর্মের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্কই নেই··· ।'

বন্তী আবার খুব জোরে হেসে উঠল। এবার কিন্তু কেউ দেখতে পেল না মেয়ের এই বেয়াদপিতে ছায়া কতোটা রেগেছেন। তবে শ্যামও আর কোনো দুষ্টুমী করল না।

দেশলাই জ্বলল। 'লোকে বলে এই সীতাকুণ্ডের নাকি তল পাওয়া যায় না, অনেকে ডুব দিয়ে চেষ্টা করেছে, পায়নি। এখান থেকে জল বয়ে গিয়ে ওপরের ওই কুণ্ডদুটোতে গিয়ে পড়ে···রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ডে··· ।'

শ্যামের মা মাথায় ইতি ঠেকিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, 'ধন্য তুমি সীতা দেবী, ধন্য··· ।'

দেশলাইয়ের স্তিমিত আলোতে সীতাকুণ্ডের জল আরও কালো লাগছিল। পরিবেশটায় বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে। কাঠিটা নিভে গেল, অন্ধকার গাঢ়তর হল, শুধু মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া প্রাণের আর কোনো চিহ্ন নেই। শ্যাম ভাবছিল···এই সেই সীতাকুণ্ড,··· অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। চোদ্দ বছর বনবাস, রাবণের চুরি করে নিয়ে যাওয়া, সামান্য ধোপাদের অভিযোগে বনবাস···সীতার জীবনটাই ছিল ধুলি-মলিন, অন্ধকার আর ব্যর্থতার ইতিহাসে ভরা। এই সীতাকুণ্ড যেন তারই প্রতীক, আ'র রাম-লক্ষ্মণকুণ্ড কেমন সূর্যস্নাত হয়ে ঝলমল করছে ওপরে। সীতা যেন সমস্ত ভারতীয় নারীর প্রতীক।

সীতাদেবী সত্যিই ধন্য ; কারণ তিনি শুধু ধরিত্রীমাতার কন্যাই নন, স্বয়ং বসুন্ধরা। ধরিত্রী নারী। নিজে অন্ধকারের গভীরে থেকে যে প্রাণের ফসলকে বাইরে প্রকাশ করে তারাই হল রাম-লক্ষ্মণ। শ্যাম সেই মহান মহাকবিকে প্রণাম জানাল, যিনি সীতা চরিত্রকে অমর করে

রেখে গেছেন।

আর ভাব জগতে বিচরণ না, শ্যাম বাইরে চলে আসতে চায়, 'ছায়া মাসী, দেশলাই জ্বালো, এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

২৬

ওরা যখন মেলায় পৌঁছল, তখন মেলা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত। জায়গাটা পীর আর মদান গ্রামের মাঝখানে একটা নিচু মতন উপত্যকায়। বিশাল মাঠের মধ্যে খোমানি আর হাড়িয়ার গাছ আছে প্রচুর। মাঠের পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে মান্দর নদী, উত্তর-পূর্বদিকে পীরের খাল। মাঝে একটা উঁচু মতন জায়গার চারপাশে বহু প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ কোথাও এক ফুট, কোথাও দু'ফুট, কোথাও বা তিন ফুট উঁচু। রামকুণ্ডের কাছে যে ধরণের প্রাচীর আছে, এখানকার প্রাচীরও সেই ধাঁচের। সম্ভবতঃ একই যুগে এগুলো তৈরী হয়েছিল, যদিও রামকুণ্ড থেকে মেলার মাঠ প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে। প্রাচীরের গায়ে ভাঙ্গা থামে যেসব কারুকার্য আছে সেগুলোর সঙ্গেও রামকুণ্ডের মিল আশ্চর্য রকমের। মনে হয় এককালে এখানে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল। এরই মাঝে জমে উঠেছে হাজার হাজার মানুষের মেলা।

শ্যামেরা মাঠের উত্তর-পূর্বদিকে এগিয়ে গেল। এখানে সেই প্রাসাদের অনেকটা এখনও অভগ্ন আছে। প্রায় সত্তর-আশি ফুট উঁচু সিঁড়ি, তবে কেউ ওঠে না। মনে হয় একটু চাপ পড়লেই ভেঙ্গে পড়বে।

এখানে আর একটা মজার জিনিস চোখে পড়ল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল বড় স্টিম রোলারের চাকা। কাছেই একটা পুরনো মুগুর পড়ে আছে, অতবড় মুগুর শ্যাম জীবনে কখনো দেখেনি। পাঁচ-সাতজন লোক তুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। এটা না'কি ভীমের মুগুর। ভীম ব্যায়াম করতেন।

মেলায় যেসব কুস্তীগীররা আসে তারা এই মুগুরটা ওঠাবার চেষ্টা

করে। আজ পর্যন্ত কেউ সফল হয়েছে বলে জানা নেই।

গোলাম হুসেন বলল, 'এটা তো মানুষের না, ভগবানের মুগুর। এবার পীরের কবর দেখাতে নিয়ে যাবো আপনাদের। এত লম্বা কবর দেখলে আপনি ঘাবড়ে যাবেন। মানুষ কখনো এত লম্বা হয় না। আসলে এসবই ঈশ্বরের ব্যাপার।'

শ্যাম একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা পণ্ডিতজী, পাণ্ডবদের রাজধানী তো ছিল দিল্লীতে, এখানে তারা এতবড় প্রাসাদ তৈরী করতে গেল কেন? বনবাসে থাকার সময় কি ওরা এখানে এসেছিল?'

'না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা সংসার সম্বন্ধে উদাসী হয়ে কৈলাসে যাচ্ছিলেন। পথে এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যান।'

শ্যামের মনে পড়ে গেল এই এলাকায় নানা জায়গায় জলকুণ্ড তৈরী করা হয়েছিল এবং কাছেই অনেক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সে দেখেছে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যুধিষ্ঠিরদের কৈলাসে যাবার তত তাড়া ছিল না, তাই তারা কাশ্মীর, কাংড়া আর মণ্ডী এলাকায় বেশ কিছুদিন করে বিশ্রাম করে গেছে। প্রায় সব ঝর্ণার কাছেই একটা করে জলকুণ্ড দেখতে পাওয়া যায় এই পাহাড়ী এলাকায়। হয়তো এগুলো সাধারণ মানুষের তৈরী, অন্ধ এবং অশিক্ষিত মানুষ সবকিছুকেই ধর্মের নামে চালিয়ে দিতে অভ্যস্ত।

শ্যাম ঐ পণ্ডিতজীকে প্রশ্ন করল, 'এই উঁচু সিঁড়ির ইতিহাস জানেন না কি আপনি?'

'জানি। পাণ্ডবরা যখন হস্তিনাপুর থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌছল, তখন তাদের মা কুন্তীদেবী ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আবার যাত্রা করার আগে তিনি হঠাৎ বেঁকে বসলেন, বাপের বাড়ী না দেখে তিনি একপাও এগোচ্ছেন না। অনেক বুঝিয়েও কোনো ফল না পেয়ে, শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবরা এই উঁচু প্রাসাদ তৈরী করে। কুন্তীছাদে চড়ে একবার নিজের বাপের বাড়ী দেখে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন।' শ্যামের মন একথায় সায় দিল, মেয়েদের যত

বয়সই হোক না কেন বাপের বাড়ীর প্রতি এক অদ্ভুত টান অনুভব করে সব সময়ে। বৃদ্ধা কুন্তীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। এই পাহাড়, জঙ্গল, উপত্যকা, নদী পার হয়ে কুন্তীর দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল তাঁর পিতৃগৃহের দিকে।

নিজের কল্পনা বিলাসে নিজেই হেসে উঠল শ্যাম। তবে এটাও ঠিক পৌরাণিক কাহিনীগুলো ঠিকভাবে জানার জন্যে নব মূল্যায়নের প্রয়োজন। গ্রামের সরল মানুষ আক্ষরিক অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু সেগুলোর যে সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল্যবোধ আছে তা জানানো দরকার সবাইকে। শ্যাম মনে মনে ঠিক করে নিল ভবিষ্যতে এই নিয়ে গবেষণা করবে।

ভগ্নস্তুপের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ ঘোরার পর মেলার প্রাণকেন্দ্রে ফিরে এলো সে। দারুণ হৈ-চৈ চলছে। বিকি-কিনিরও শেষ নেই। ছোটখাটো গয়না বিক্রির দোকানে কমবয়সী মেয়েদের বেশী ভীড়। দোকানদারও বেশ রসিক, রূপ-যৌবনের প্রশংসায় যথেষ্ট স্বাধীনতা নিচ্ছে। অবশ্য এক্ষেত্রে কেউ কিছু মনে করে না।

গোলাম আলি গিল্টির গয়নার দোকান দিয়েছে। সোনার মতো ঝকঝকে অথচ দামে ভীষণ সস্তা। আংটি, নাকছাবি, কানের দুল বিক্রি হচ্ছে হু হু করে। গোলাম আলি চেঁচাচ্ছে: 'সোনার জিনিস কৌড়ি দামে বিকোচ্ছে···সোনার জিনিস···।'

ওর চেয়েও গলা উঁচু করে রূপোর গয়নার দোকানের মালিক চেঁচিয়ে খদ্দেরদের সাবধান করছে: 'রূপো দিয়ে রূপো নাও, আজেবাজে জিনিস কিনো না···।'

মিষ্টির দোকানের আলাদা জাঁকজমক। শ্যামের খুব আশ্চর্য লাগছিল, চাষীবাড়ীর ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে খাঁটি ঘিয়ের খাবার খেতে অভ্যস্ত, অথচ এখানে তেল বা ডালডার খাবার খাওয়ার জন্যে পাগল।

বসন্তরামও দোকান দিয়েছে—কিসমিস, নারকোল আর মাখানার। যুবক-যুবতীদের কাছে খুবই প্রিয় খাদ্য। রসিক বসন্তরাম রসের

ফোয়ারা ছুটিয়েছে, চুটকী-কবিতা, গালিবের শের শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিচ্ছে কমবয়সী জোয়ান ছেলেমেয়েদের। ও এবার বিশেষ করে এই মেলার জন্যে 'বিলিতি, নারকোল আনিয়েছে। কোনো যুবতীকে লক্ষ্য করে বলছে, 'আমার দোকানের কিসমিস খাওয়ালে তোমার প্রেমিক তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসবে।' সবাই হেসে আকুল। বসন্তরাম যে নিজেও একজন বড় কবি এটা প্রমাণ করার জন্যে কাদের যেন বোঝাচ্ছিল—'আরে মশাই, মির্জা গালিবের মতো প্রেমিক স্বভাবের কবি আর কোনো দেশে খুঁজে পাবেন না। উনি হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লীতে থাকেন।···কি হে দিল্লী কখনো গেছো? যাও ঘুরে এসো, তিনটে জিনিস আছে দিল্লীতে দেখবার মতো—ঘণ্টাঘর, চাঁদনীচৌক আর মির্জা গালিব। আমি তো হাত জোর করে বলেই ফেলেছিলাম, 'হুজুর আমি পাহাড়ী মানুষ, এতোদূর থেকে আপনার দর্শন পাওয়ার জন্যে এসেছি। একটা কবিতা অন্ততঃ আমায় দিন।···'

বড় বড় চোখ করে কৃষক-যুবক প্রশ্ন করল, 'আর উনি আপনাকে কবিতা দিলেন?'

'হুঁ হুঁ, তাহলে আর বলছি কি?'

শ্যামের আর শোনার ইচ্ছে হল না, এগিয়ে গেল। এক জায়গায় সস্তা দরের রসিকতা হচ্ছে। মানুষ হেসে লুটোপুটি।

আরো একটু এগোলে কুস্তির আখড়া। এখানে দর্শকরা বেশির ভাগই পুরুষ, কিসমিস, খেজুর আর মাখানা চিবোচ্ছে এবং প্রতিপক্ষের সমর্থকদের নিয়ে ব্যঙ্গ রসিকতা করছে। ঘামের সুগন্ধে এখানে টেকা মুশকিল।

গ্রামের কুস্তিগীর বহিরাগতকে হারিয়ে দিয়েছে একটু আগে। তাই উপস্থিত জনতা আরও উন্মত্ত। ঢোল বাজছে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। যেন ফিরে এসেছে এক আদিম পরিবেশ। শ্যামের মনে হলো সভ্যতার খোলস ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়বে এবং ওই দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঐ ভাবে উন্মত্তের মতো নাচবে। কিন্তু পারল না। ক্রমশঃ ও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেই পরিবেশ থেকে···মানুষগুলো যেন সমুদ্রের

ঢেউয়ের মতো দোলায়িত হচ্ছে···আর শ্যাম যেন তীরে বসে আছে নিশ্চেষ্ট দর্শকের মতো।

## ২৭

মেলা থেকে ফিরে শ্যামের মা স্বামীকে বললেন, 'বলছিলাম কি শ্যামের আশীর্বাদের সময় আত্মীয়-স্বজনকে ডাকতেই হবে। আমার বোনকে আমি লিখবো, তুমি শ্যামের কাকা আর পিসীদের লেখো।'

'এতো করার কি দরকার,' শ্যামের বাবা এড়াবার চেষ্টা করলেন। আসলে আত্মীয়-স্বজন থেকে একটু দূরে থাকতে চান তিনি।

'না। এই আমাদের বাড়ীতে প্রথম শুভকাজ। নিকট আত্মীয়দের আসা চাই। তাছাড়া এখানে আমাদের সমাজের তেমন কেউ নেই।'

শ্যামের বাবা মেনে নিতে বাধ্য হলেন এই যুক্তি।

'আর একটা কথা,' এইটুকু বলে শ্যামের মা ইতঃস্তত করতে লাগলেন।

'কি কথা?'

'ছায়া আর ওর মেয়ের এখানে বেশি আসা যাওয়া আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'কিন্তু কেন?'

'কিছুই না···তবুও···।'

'ঠিক আছে তুমি যা ভালো বুঝবে করবে,' শ্যামের বাবা মাথা ঘামাতে চাইলেন না এ নিয়ে।

এর পাঁচ-ছদিন পরে শ্যামের মা একদিন শ্যামকে ডাকলেন, 'বাবা, তোমার এই শুভকাজে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ডাকা হচ্ছে। আত্মীয়রা না এলে ভালো লাগবে না।'

শ্যামের এমনিতেই এসব ভালো লাগছে না। এক'দিন ছায়া বা বন্তী কেউ একবারও আসেনি বাড়ীতে।

'মা, তুমি সব ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়ো করছ। এই সম্বন্ধটা আমার

একটুও ভালো লাগছে না।'

'পাগল হয়ে গেলি নাকি?'

'না মা পাগল নই। এ বিয়ে আমি করব না।'

'কেন, ছায়ার মেয়েকে বিয়ে করতে চাস,' মার গলায় ঝাঁঝ, তীব্র দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন শ্যামের মুখের দিকে। শ্যাম কুঁকড়ে গেল।

গলায় বিষ ঢেলে শ্যামের মা বললেন, 'আমি কি জানতাম ওদের আসা-যাওয়ায় এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। তোমাকে তো আমি ভালো ছেলে বলেই জানতাম। আমার ছেলে যে এরকম হবে ভাবতেও পারিনি।'

'মা।'

'চুপ করে থাকো। আমি সব বুঝতে পারি। তুমি খুবই সরল··· একবার ভেবে দেখো···ওদের না আছে সমাজ, না আত্মীয়-স্বজন। টাকা পয়সা, মান-সম্মান কিছুই তো নেই। গ্রামের লোকেরাও ওদের পছন্দ করে না। বদনামও আছে।'

'মা···।'

'মা-বাবার বদনাম করাতে চাও। লোকে বলবে কি···তহশীলের হাকিমের ছেলের এর চেয়ে ভালো সম্বন্ধ আর জুটল না? একটা বাজে মেয়ে—।'

'মা!' শ্যাম গর্জে উঠল, তার সারা শরীর কাঁপছে।

'ছোটলোক, বজ্জাত, কুত্তী...,' ওর মা আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন, 'আমার ছেলেকে হতভাগীরা কেড়ে নিতে চাইছে।'

মায়ের কান্না, চোখের জল শ্যাম আর সহ্য করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল মায়ের চোখের জলের উষ্ণ স্রোতে পাহাড়ের গা বেয়ে সে যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে অতল খাদে। বাচ্চা ছেলেরা বিপদের আশংকা বুঝে যেমন দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে, শ্যামও তেমনি এক অসহ্য ব্যথায় পাগল হয়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমায় ক্ষমা করে দাও মা, ক্ষমা করো।'

শ্যামের মা ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চোখের জল

মুছে দিলেন, তাঁর মুখে-চোখে এখন হাসি-অশ্রুর খেলা। 'জানিস বাবা, কাল গঙ্গু মিশির এসেছিল, তার ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। কত খুশি ও। ঢোল বাজবে, সানাই বাজবে। সবাই চায় ছেলের ভালো বিয়ে হোক···আমরাও চাই···তুই আমাদের কত আদরের ছেলে···।'

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল শ্যাম খাটে মুখ গুঁজে শুয়ে। আগেকার সেই অনুভূতি আর নেই। এক অদ্ভুত হতাশা তাকে ঘিরে ধরেছে। কিছুটা চিন্তা করার পর নিজেকেই এখন সে ধিক্কার দিচ্ছে।···গাধা, কাপুরুষ···চিরকাল তুমি তোমার এই দুর্বলতার জন্যে জীবনের পরম সম্পদ থেকে বারবার বঞ্চিত হয়েছো, তবুও তোমার শিক্ষা হলো না।··· এখনও সময় আছে, তুমি না পুরুষ, বিদ্রোহী হও, বারবার পড়ে পড়ে মার খেয়ো না। একবার সাহস করে জীবনের মুখোমুখি হও। দেখবে তোমার এই নৈরাশ্যে ভরা জীবন সঙ্গীত-মুখর হয়ে উঠছে। সাহস দেখাও।

কিছুতেই সে রাতে ঘুম এলো না শ্যামের।

গঙ্গু মিশিরের ছেলের সঙ্গে পণ্ডিত পেড়ারামের মেয়ের বিয়ে। দুজনেই কাছাকাছি থাকে, ঘড়া মৌজায়। ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম।

গঙ্গু মিশিরের বাড়ী আর পেড়ারামের বাড়ীর মাঝখানে আখরোট গাছের বড় বাগান। সামনে ভুট্টার ক্ষেত। দুই পরিবারের মধ্যে জানাশোনা দীর্ঘকালের। গঙ্গুর ছেলে আর পেড়ারামের মেয়ে ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলাধুলো করছে। ফলে এক অদ্ভুত ভালোবাসা গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। কারুর মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। অথচ শ্যাম তারই জ্বালায় জ্বলে মরছে।

আগস্টের শেষে শীত বাড়তে শুরু করেছে। আকাশে চাঁদের আলোর বন্যা, দূর থেকে ভেসে আসছে শানাইয়ের সুর। সব অফিসারদের নেমন্তন্ন হয়েছে। এরজন্যে গঙ্গু মিশির আর পণ্ডিত পেড়ারাম দুজনেই বেশ গর্বিত।

শহর থেকে গ্যাসের আলো আনা হয়েছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা

সেখানে ভীড় করে বসে। বড়রাও বাদ যাচ্ছেন না। একজন তো বলেই ফেললেন, 'কামাল করে দিয়েছে ভাই এই ইংরেজরা, কি জিনিস আবিষ্কার করেছে দেখো।'

'এতে এতো প্রশংসা করার কি আছে বুঝি না বাপু। এসব বহুকাল আগে আমাদের দেশে ছিল। প্রাচীন ঋষিরা সর্ববিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। মহাভারতে সঞ্জয় মহারাজ দূরবীন আর রেডিয়োর সাহায্যে পুরো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছিলেন। রামচন্দ্র তো পুষ্পক রথে করে লংকা থেকে এসেছিলেন।'

এসব কাহিনী শ্যাম বহুবার শুনেছে। বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই ধরনের কথা বলেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওরা স্বীকার করতো না ইংরেজরা এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছে। কিন্তু যখন মাথার ওপর উড়তে দেখল, তখন বলা শুরু করল, 'আরে এর কথা তো আমাদের পুঁথিতে বহুকাল আগেই বলা আছে।'

কি করে নির্বোধের মতো এই জাতীয় অহংকারের কথা এরা নির্বিবাদে বলতে পারে ভেবে শ্যামের গায়ে জ্বালা ধরে গেল। এই আত্ম প্রবঞ্চনা, এই অজ্ঞানতা আমাদের দেশের অর্দ্ধ শিক্ষিত মানুষদেরই মুখে শোভা পায়।

এইসব চিন্তা করতে করতে হঠাৎ শ্যাম লক্ষ্য করল উঠোন থেকে বন্তী বেরিয়ে আসছে। গ্যাসের আলোকে ম্লান করে দিয়ে বন্তী যেন উজ্জ্বল দীপশিখার মতো উদ্ভাসিত। হলুদ রঙের সিল্কের পোশাক পরেছিল বন্তী, হাতের থালায় মিছরী, কিসমিস, বাদাম। কিছু বোঝবার আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

উঠোনে তখনও কর্ণ, দ্রোণাচার্য; অর্জুনদের বীরত্বের আলোচনা হচ্ছিল। আর শুনতে ভালো লাগল না শ্যামের।

গঙ্গু মিশিরের বাগানে পীচের গাছ, তার তলায় বসে কিছু ছেলেমেয়ে খেলছিল 'ডাক্তার-রোগী' খেলা।

অন্য একটা জায়গায় কম্পাউণ্ডার বামদেব এবং আরোও কয়েকজন মিলে তাস খেলছে। শ্যামকে দেখে কে বলে উঠল, 'আসুন, আসুন,'

তারপর পাশের একজনকে বলল, 'আমাদের তহশীলদার সাহেবের ছেলে।' লোকটি আর কেউ নয়, থানার দারোগা ইয়ার মহম্মদ।

'আপনার···আপ···নার সঙ্গে আ···লা···প হয়ে খুব খুশী হলাম', শ্যাম লক্ষ্য করল এই দারোগার গলায় একটা বড় ক্ষত চিহ্ন। নূরাঁর সঙ্গে একেই দেখেছিল শ্যাম।

ইয়ার মহম্মদ মদ খেয়েছিল। সে নেশার ঝোঁকে শ্যামকে জড়িয়ে ধরে বার বার একই কথা বলতে লাগল—'আপনার সঙ্গে···আলাপ··· হয়ে···শ্যাম সাহেব···ভী···ভীষ···ণ ভা···লো লাগল··· ।'

কে-একজন ওর মুখে মদের বোতলটা লাগিয়ে দিতেই ইয়ার মহম্মদ ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। মাটিতে শুয়ে পড়ল।

বিয়ের বেদী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। কমবয়সী মেয়েরা হীর আর রঞ্ঝার প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত গান গেয়ে চলেছে বেদী ঘিরে, ঢোলকও বাজছে সেই সঙ্গে। মানুষের প্রেম শাশ্বত; মানুষ চিরকাল প্রেমের জয়গান গেয়ে এসেছে। তাহলে কেন তাদের প্রেম ব্যর্থ হয়ে যাবে··· ?

কথাগুলো চিন্তা করতে করতে শ্যাম কখন যে আবার চলে এসেছে আখরোট গাছের কাছে জানে না। শ্যামের মনে হলো চাঁদও যেন তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে আর বলছে: শ্যাম···বন্তী···বন্তী···শ্যাম। হঠাৎ শ্যাম থমকে দাঁড়াল, আধো আলো-ছায়া সর্বাঙ্গে মেখে কে যেন এগিয়ে আসছে উল্টো দিক থেকে। এবং সেও শ্যামকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শ্যাম আর থাকতে পারল না, এগিয়ে গিয়ে দুহাত দিয়ে বন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বন্তীর সারা শরীর কেঁপে উঠল, সে আর থাকতে পারল না। উষ্ণ আলিঙ্গনে বাঁধা দুটি দেহ-মন চুম্বনের আশ্লেষে নিজেদের যেন ক্ষইয়ে দিতে চাইছিল সে মুহূর্তে। সে এক অপূর্ব, অনাস্বাদিত অনুভূতি, শ্যামের মনে হচ্ছিল তারা যেন অনন্তকাল ধরে এইভাবে থেকে যেতে পারে।

ঐ ভাবে অনেকক্ষণ থাকার পর শ্যাম প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বলভদ্রকে ভালোবাসতে ?'

'না, একথা এখন স্বীকার আমি অনায়াসে করতে পারি যে তখন, তুমি আসার আগে পর্যন্ত, কেউ যদি আমাকে ওকথা বলতো, তাহলে হয়তো আমি মেনে নিতাম যে ওকে আমি ভালোবাসি··· ।···তখন আমি ভালোবাসা কাকে বলে জানতুম না ।'

'সত্যি ?'

'সত্যি ।'

'ওহ্ মাই ডার্লিং···।'

'আমি কিন্তু ইংরিজী জানি না। তবে তুমি যা বললে তার মানেটা আন্দাজ করতে পারছি।···আমাকে ইংরিজী শেখাবে··· ।'

'শেখাবো···বলো : ওহ্ মাই ডার্লিং ।'

বন্তী ধীরে ধীরে বলল : 'ওহ্ মাই ডার্লিং ।' ···তারপর একটু চুপ করে থেকে বন্তী আবার বলল, 'আমি কিন্তু বলভদ্রের সঙ্গে এভাবে··· ।'

'তা আমি জানি,' শ্যাম আগেই বলে ফেলল ।

'কী করে জানলে শ্যাম ?'

'ওহ্ মাই ডার্লিং ।'

'ওহ্ মাই ডার্লিং'—এবার অনেকটা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল বন্তী। তারপর দুজনে একই সঙ্গে হেসে উঠল ।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্তী বলল, 'এখন যদি আমি মরে যাই খুব ভালো হয় ।'

'কেন ? এত আনন্দ, এত সুখ সহ্য হচ্ছে না···এত ভয় পাও কাকে ?'

'নিজেকে, তোমাকে, ভাগ্যকে আর পণ্ডিত স্বরূপাকিষণকে ।'

'স্বরূপকিষণকে কেন ?'

'ওর ছেলে দুর্গাদাসের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়, আর···।'

'আর···?'

'আর রোশন মামা এতে রাজী হয়ে গেছে, কারণ স্বরূপকিষণ তাঁকে দু-হাজার টাকা দেবে বলেছে। মনে হয় ইতিমধ্যে টাকাটা তিনি নিয়েও নিয়েও নিয়েছেন।'

'তারপর···?' বলতে বলতে শ্যাম আবার বন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

'দুর্গাদাস মানুষ না, জানোয়ার। ওকে দেখলেই আমার বুক কাঁপে। ও খালি মামার ওপর চাপ দিচ্ছে তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে দেবার জন্যে···। মামা এখনও এড়িয়ে যাচ্ছেন। ভয় হয় মামা যদি···।'

'আর তুমি! তুমিও কি সেটা মেনে নেবে?'

'আমি মরে যাবো', শ্যামের আলিঙ্গনের মধ্যেই বন্তী আবার কেঁপে উঠল, 'শ্যাম, কথা দাও, তুমি কখনো আমায় ছেড়ে যাবে না।'

'প্রাণ থাকতে না।'

'শ্যাম, আমি বেশি লেখাপড়া শিখিনি। সরল মনে নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। দেখো, আমাকে যেন আঘাত পেতে না হয় কখনো।'

শ্যাম ওকে আদরে আদরে ভাসিয়ে দিতে লাগল। বন্তীর ঠোঁটে হাসির আভাস। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার, কদিন আগে পর্যন্ত তোমায় চিনতাম না···আর এখন তুমিই সব···'আমার শেষ কথাটা এমনভাবে বলল বন্তী যেন সে তার সমগ্র অন্তরাত্মাকে শ্যামের চরণে উপহার দিচ্ছে।

হঠাৎ দুজনেই কীসের শব্দে চমকে উঠল। দূরে আখরোট গাছগুলোর পাশ দিয়ে দুর্গাদাসকে চট্ করে চলে যেতে দেখল শ্যাম। ওর সঙ্গে ছিল বন্তীর মামা আর পণ্ডিত স্বরূপকিষণ। নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা করতে করতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছেন।

এক অজ্ঞাত ভয়ে শ্যামের বুকও কেঁপে উঠল। ঠিক সেই সময় গাছের ডাল থেকে একটা বাদুড় তার কালো ডানা মেলে নিচের উপত্যকার দিকে উড়ে গেল।

পরের দিন শ্যাম খবর পেল যে চন্দ্রা আর মোহন সিংয়ের ব্যাপারে ডাক্তারের আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে সরকারী কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু। ঐ কমিশন এমন কি মান্দরে চলেও এসেছে। কিছু অফিসার ডাকবাংলোতে, বাকীদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তহশীলদার সাহেবের অফিস সংলগ্ন মাঠে তাঁবু ফেলে। বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে সবার মধ্যে। মুসলমান ডাক্তারটিকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল আগেই। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভীষণ উৎসাহ, তারা এমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন তাদেরই জয় হয়েছে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আলিজু শ্যামকে ঠাট্টা করে বললেন, 'হুজুর, গরীবের মা-বাপ, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম গরীব মুসলমান ডাক্তার ভালো কাজ করতে গিয়ে ফেঁসে যাবে। আর ব্রাহ্মণরা নিজেদের খুশি মতো কমিশন তৈরী করাবে। আর দেখুন, প্রেম করল চন্দ্রা আর মোহন—ওদের লড়াই হোক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, তা না, মাঝখান থেকে পিষে মরছে ডাক্তার বেচারা। এটা একটা ভাবাবেগের ব্যাপার হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। মানছি হিন্দুরা ন্যায়-নীতি খুব মেনে চলে, কিন্তু মুসলমানের ব্যাপারে ওরা কেমন যেন অসহায় হয়ে যায়।'

আমজাদ হুসেন অফিসের বুড়ো পেয়াদা, ও খুব মন দিয়ে এদের কথা শুনছিল, হঠাৎ বলে উঠল—'হুজুর, অপরাধ নেবেন না, আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন। এই ধর্মের আর ভাবালুতার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান এক। আমার ছোটবেলাকার একটা গল্প বলি শুনুন : আমার জ্যেঠামশাই ছিলেন সেসন জজ। খুব পণ্ডিত এবং পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়তেন। উনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন, তার কারণ লেখাপড়ায় ছোটবেলায় আমি খুব ভালো ছিলাম। একদিন উনি আমাকে ডেকে বললেন :

'আমজাদ, আমজাদ, এদিকে আয়। তুই খুব ভালো ছেলে, দারুণ বুদ্ধিমান, বড় হয়ে তুই তহশীলদার, মুন্সেফ, জজ হবি।'

'আমি উত্তর দিলাম না। উনি তখন আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আচ্ছা, একটা কথা বল, তুই জজ হলে ন্যায় বিচার করাবি তো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা বলতো, মুসলমানকে খুন করেছে এমন এক খুনী হিন্দুর বিচার যদি তোকে করতে হয়, কি সাজা দিবি?'

'ফাঁসী।'

'সাবাশ, আর হিন্দুকে খুন করেছে এমন এক মুসলমান আসামীর যদি বিচার করিস তাহলে কি করবি?

'একেও ফাঁসী দেব।'

সেসন জজ গম্ভীর হয়ে গেলেন, আমার বাবাকে ডেকে বললেন, 'তোর ছেলেটা একেবারে অপদার্থ, ঠিক মতো শিক্ষা দিচ্ছিস না।' তারপর উনি আমাকে কান মুলে দিয়ে শেখালেন ঐরকম হলে মুসলমানকে তত কঠিন সাজা দেব না। তখন বলেছিলাম বটে, কিন্তু মন মানেনি।'

শ্যাম ব্যঙ্গ করে বলল, 'আর তাই হুজুর আজ জজ না হয়ে পেয়াদা হয়েছেন। ওসব কথা নতুন নয়। আমি জানি হিন্দুদের বাড়ীতেও প্রতিদিন শেখানো হয়—বাছা সাপকেও বিশ্বাস করতে পার মুসলমানকে নয়। ছোটবেলা থেকে উভয়পক্ষই এক শিক্ষা পাওয়ার ফলে বড় হয়ে মেলামেশা করলেও মন থেকে কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না। তবে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমতঃ আর্থিক ও রাজনৈতিক বিভেদটা মেটাতে হবে। হিন্দু আর মুসলমানদের আলাদা আলাদা স্কুল আর একটা খারাপ দৃষ্টান্ত। কিন্তু মনে হয় না তাতে কোনো ফল হবে...জন্মের পর থেকেই মনের মধ্যে যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তার জের চলবে আরও কয়েক বংশ ধরে... ।'

আমজাদ হুসেন মুচকি হেসে বলল, 'আজকে যেন আপনাকে ভীষণ

হতাশ লাগছে শ্যাম সাহেব, আপনারাই যদি সাহস হারিয়ে ফেলেন··· ।'

আলিজু বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন শ্যাম সাহেব, আপনি কথাগুলো বেশ দামীই বলছেন। তবে আমি এখন ভবিষ্যতের বদলে বর্তমান নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ডাক্তারের ব্যাপারটা কি হবে শেষ পর্যন্ত ?'

'কি বলব বলুন ?' শ্যাম বলল, 'আমার তো বিশ্বাস হিন্দুদের সান্ত্বনা দেবার জন্যেই এই কমিশন। ডাক্তার সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং ডাক্তার বেকসুর রেহাই পাবেন বলেই দৃঢ় বিশ্বাস আমার।'

আলিজু মুচকি হাসলেন, 'হায়, আপনি যদি ঐ কমিশনে থাকতেন··· ।'

'তাহলে তখন আপনি আর একটা সুযোগ পেতেন বলার, দেখুন মশাই আর এক হিন্দুকে... '

শ্যামের কথা শেষ হবার আগেই তিনজনে হো হো করে হেসে উঠল।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে শ্যাম হাসপাতালে গেল। একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় চেয়ার পেতে বিচিত্র ভঙ্গীতে বসেছিলেন ডাক্তার। কাজ তো বন্ধই, ফলে তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। নিজেকে অপরাধী মনে হল শ্যামের। তার কথাতেই তো চন্দ্রাকে সেবা করার অনুমতি দিয়েছিলেন ডাক্তার। অনেকক্ষণ ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করল শ্যাম, নানাভাবে চেষ্টাও করল সান্ত্বনা দেবার। বামদেব বেশ দৌড়ঝাঁপ করে কাজে ব্যস্ত। আজ কি জানি কেন বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা অকারণে হাসপাতালে আসছে ওষুধ নেবার নাম করে। আসল উদ্দেশ্য ডাক্তার কতোটা ভেঙ্গে পড়েছে তা দেখা। এত সংকীর্ণচিত্তও মানুষ হয়—শ্যাম ভাবল।

ওয়ার্ডে গিয়ে মোহন সিং আর চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করল শ্যাম। ওরা দুজনেই ভয়ে গুম মেরে বসেছিল। চন্দ্রার মুখে দিশাহারা ভাব। কণ্ঠস্বরেও নেই সেই স্বাভাবিক চঞ্চলতা। কিন্তু দৃষ্টি বলে দিচ্ছে যাই হোক না কেন নিজের সংকল্পে সে অটুট হয়েই আছে।

মোহনের ঘা অনেকটা ভালো হয়েছে, এখন সে খাটে হাতের ভরে

আধশোয়া অবস্থায়। তাও চোখের তারায় নৈরাশ্য আর হতাশা। সারা শরীরে ক্লান্তির আর দুর্বলতার ছাপ সুস্পষ্ট।

চন্দ্রা শ্যামকে লক্ষ্য করে বলল, 'ডাক্তার একে উঠতে-বসতে মানা করেছেন। কিন্তু ও বলছে ঘা তো শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ওর তো উচিত আরও পনের-কুড়ি দিন শুয়ে থাকা। এতো বলছি, শুনছে না।'

'কি করবো কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।' মোহন সিং বলল।

'সব সময়ে অস্বস্তি বোধ করলে, বা বিষণ্ণ থাকলে শরীর সারতে আরও বেশি সময় নেবে। তাছাড়া, অকারণ চিন্তা করেই বা কি লাভ। ঘাবড়াবার কোন দরকার নেই। পৃথিবী আমাদের সঙ্গে থাক বা না থাক, আমরা দুজনে একসঙ্গেই থাকছি।'

চন্দ্রার কথায়, দৃষ্টিতে, তার ব্যক্তিত্বে এমন এক আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা যাচ্ছিল যে শ্যাম মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। বুক ফুলিয়ে ঝড়ের সামনে এভাবে দাঁড়াতে খুব কম লোককেই দেখেছে শ্যাম।

একটু হেসে সে মোহন সিংকে বলল, 'তোমার চিন্তা করার একটুও দরকার নেই। যে পুরুষের পাশে চন্দ্রার মতো নির্ভীক, বাহাদুর স্ত্রী থাকে সে কেন বিপদে ভয় পাবে?'

মোহনের ফ্যাকাসে ঠোঁটে হাসি দেখা গেল, কিন্তু কিছু বলল না।

পণ্ডিত স্বরূপকিষণের বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের মিটিং বসেছে। ব্যবসায়ী আর শিখরাও এসেছে। সারা গাঁয়ে ভীষণ উদ্দীপনা। প্রত্যেকেই গলা ছাড়িয়ে নিজের বক্তব্য অন্যদের শোনাতে চাইছিল।

'আমি বলি কি', কঞ্জীমল কোনার বলল, 'এই কমিশনকে বাধ্য করা হোক ডাক্তারকে এমন কড়া শাস্তি দিতে যাতে ভবিষ্যতে সবাই সাবধান হয়ে যায়।'

বচত্তর সিং তার সঙ্গীর কানে কানে বলল, 'কথাটা শুনলে গড়গঞ্জাজীভাই, গত বছর এই ব্যবসায়ীটাই ডাক্তারের কি প্রশংসা আর খোশামোদ করত।'

গড়গঞ্জা বললে, 'সর্দারজী, এই দুনিয়া, বলার কিছুই নেই।'

ঔসরমান বলল, 'আমার মতে তো ব্যাপারটা শুধু ডাক্তারের মধ্যে

সীমাবদ্ধ না রেখে, নায়েব তহশীলদার আর তহশীলদার সম্বন্ধেও তদন্ত করানো উচিত।'

পণ্ডিত বসন্তকৃষ্ণ বলল, 'এই তহশীলদারটাও মুসলমানদের পক্ষে। হারামজাদী চন্দ্রার বন্ধু হচ্ছে ঐ ছোঁড়াটা। গঙ্গামাইয়ের দিব্যি বলছি, আমি নিজের চোখে ওদের...।'

লালা বংশীরাম আর একবার তার সোনার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'পণ্ডিত বসন্তকৃষ্ণজী, এই মামলাটা এখন আর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবদ্ধ নেই। এটা এখন রাজা আর প্রজার সম্পর্কের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। আমাদের ইচ্ছে কমিশন এখানকার সব অফিসারদের সম্বন্ধেও তদন্ত করুক। দারোগা, শুল্ক বিভাগের অফিসার আর জঙ্গল ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা অত্যন্ত অনুচিত কথা বলে, বড্ড বাড়াবাড়ি করে। এদের প্রত্যেককে কমিশনের সামনে খাড়া করা হোক, যাতে কে দুধ আর কে জল সবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

সভার সকলে একবাক্যে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন, একেবারে ঠিক কথা বলেছেন লালা বংশীরামজী...কী অসাধারণ আপনার বুদ্ধি...বাহ্...বাহ্...।'

'হবেই বা না কেন? উনি বাজারের চৌধুরী...ব্যবসায়ী মহলের মাথা।' পণ্ডিত গন্দলরাম পাশের লোকের পেটে খোঁচা মেরে বললেন কথাটা।

বংশীরামের মুখে গর্বের হাসি।

পণ্ডিত স্বরূপকিষণ বললেন, 'ভাইসব, আপনাদের সব কথা আমি শুনলাম। এবং সর্বতোভাবে আপনাদের মতকে সমর্থনও করি; কিন্তু সামান্য একটু মতভেদ হচ্ছে, তারজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন আপনারা। এইসব অফিসারদের অত্যাচারের কথা যা বলছেন, সে বিষয়ে ওদের অহংকারকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে আমিও চাই। কিন্তু এখনই না, ধীরে ধীরে। প্রথমে একটাকে শেষ করা যাক, তারপর আর একটাকে, এইভাবে একের পর এক। ভগবান গীতায় বলেছেন যে...।'

পণ্ডিতজী শ্লোকটা পড়তে লাগলেন এবং সভার সকলে চুপ করে তা শুনতে লাগল।

সভা শেষ হলো। সবাই যখন চলে যাচ্ছে তখন হাতের ইশারায় স্বরূপকিষণ রোশনকে থেকে যেতে বললেন। বৈঠকে তখন শুধু পণ্ডিতজী, রোশন আর দুর্গাদাস। পণ্ডিতজী রোশনকে বলতে লাগলেন, 'ভাই, এই লোকগুলো এখনও এখানকার অফিসারদের বিপজ্জনক চালটা ধরতে পারেনি। আমি ওদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিনি। আপনিই বলুন না, এই মুহূর্তে মূর্খগুলোর কথায় পড়ে যদি সব অফিসারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করি, তাহলে চারদিক থেকে সকলে আমাদের ধিক্কার দেবে। আশপাশের গ্রামে অনেক মুসলমান আছে। ওরা একজোটে আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাছাড়া অফিসারগুলো সঙ্গে সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে কমিশনের সদস্যদের হাত করে নেবে। শুধু কি তাই সারা এলাকায় এমন ঝঞ্ঝাট তৈরী করবে যে, শেষে আমাদের প্রাণ বাঁচানোই হয়ে উঠবে মুশকিল।

'সত্যি কথা বলছেন মহারাজ,' হাত জোর করে রোশন বলল, 'আপনি দেখছি সাক্ষাৎ চাণক্যের অবতার।'

'বেটা, আমি যাই চিন্তা করি না কেন, সব সময় তোমাদের, নিজেদের এবং পুরো সমাজের ভালোর দিকটা খেয়াল রেখেই করি। আচ্ছা, এবার বলো তো, সেদিন গঙ্গু মিশিরের ছেলের বিয়ের দিন যে কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম, তার কি করলে?'

রোশন চুপ করে থাকল।

'দেখো বাবা, সময় চলে যাচ্ছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে খুব ভালো লগ্ন আছে। ছেলে আর মেয়ের দুজনের পক্ষেই সেটা খুব শুভ। নক্ষত্রও ভালো। চন্দ্র চতুর্থ ঘরে আর রবি দ্বিতীয় ঘরে থাকবে। সমস্ত কর্মে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। আমি ভাবছি ঐ লগ্নেই বিয়ে হয়ে যাক।'

'হো···হো···হো···,'দুর্গাদাস তার ভয়ংকর হাসি হাসতে লাগল। হাসলে ওর মুখে অসংখ্য দাগ দেখা যায়। রোশনলাল একবার

তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে।

পণ্ডিত স্বরূপকিষণ এক ধমক লাগিয়ে দুর্গাদাসকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। লাঠিটা হাতে নিয়ে পা ঘেঁসটে ঘেঁসটে দুর্গাদাস বেরিয়ে গেল, তার কানা চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

পণ্ডিত স্বরূপকিষণ আবার বলতে শুরু করলেন, 'বাবা রোশনলাল তুমি একটুও চিন্তা কোরো না। আমি জানি, আমার ছেলে দেখতে খারাপ, কিন্তু মনটা তার খারাপ না। আর তাছাড়া বস্তী তো এই ঘরের রাণী হয়েই থাকবে। ওর কোনো কষ্ট হতে দেব না। আর কষ্টই বা হবে কেন? ও এক বড় বংশের জমিদারের বাড়ীর পুত্রবধূ হবে; সারা এলাকার লোক ওকে সম্মান করবে। সেই সঙ্গে তোমার এবং ওর মায়েরও সম্মান বাড়বে সমাজে। আর টাকা-পয়সার দরকার পড়লে আমি তো থাকবোই। তুমি ঐ লগ্নটায় রাজী হয়ে যাও।'

রোশনলালের চোখেমুখে লোভের ঘৃণ্য চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল, 'ঠিক আছে পণ্ডিতজী। আমি বস্তী আর ওর মায়ের ব্যাপারটা সামলে নেবো। আমি রাজী···তবে হ্যাঁ...এই বিয়ের ব্যাপারে হাজার দুই টাকার দরকার হবে।'

পণ্ডিত স্বরূপকিষণ খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'বাবা, তুমি খুব সরল মানুষ। আজ তুমি যেভাবে গুরুজনের কথার মূল্য দিলে তা কখনো ভুলব না। ঈশ্বর তোমায় করুণা করবেন। এখন আমার কাছে বারোশো টাকার মত আছে। এখন তাই নিয়ে যাও, বাকীটা পরশু দিন নেবে। কোনো ব্যাপারে একটুও চিন্তা কোরো না···।

রোশনলাল চোখ নামিয়ে বলল, 'আজ্ঞে না, আপনি থাকতে আমার আর চিন্তা কি।'

পণ্ডিতজী টাকা আনতে উঠলেন, কিন্তু দুপা গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'একটা কথা বলবো?'

'আজ্ঞে, বলুন।'

'ছায়াকে কিন্তু আমার এখনও ভয় লাগে।'

রোশনলাল বলল, 'ও চিন্তা করবেন না আপনি। মা-মেয়ের

আমিই তো গার্জিয়েন, যা চাইব, তাই হবে। তাছাড়া ও তো আমার বোন, সামলে নেবই। অবুঝে নিশ্চয়ই, তবে টাকা পেলে সোজা রাস্তায় চলবে। সে রকম হলে বকুনী দেব।'

'কিন্তু তাতেও যদি রাজী না হয়?'

'তাহলে ওকে ভুলি-ভালিয়ে ঐ সময় শহরে পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু ওতো বাচ্চা নয়?'

'তখন জোর ফলাতেই হবে। দুটো চড় খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের সময়টাতে ওকে ঘরে তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দেবো। মেয়ে-মানুষের জাত তো।'

'আর বন্তী?'

'বন্তী তো বাচ্চা মেয়ে, ওর সাহসই হবে না আমার সামনে টুঁ শব্দটি করবে। ও তো আমার ছায়া পর্যন্ত দেখলে ভয় পায়,' রোশনলাল বেশ গর্বিত ভাবেই বলল কথাটা।

হঠাৎ তার গলা ভারী হয়ে উঠল, বলল, 'একটা কথা পণ্ডিতজী, বন্তী আমার খুব প্রিয়, ওকে আমি নিজের মেয়ের মতোই দেখি। আমার মান-সম্মান কিন্তু আপনার হাতেই থাকবে, দেখবেন ও যেন মনে ব্যথা না পায়।'

পণ্ডিতজী রোশনলালের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কোনো চিন্তা কোরো না তুমি। আমার পুত্রবধূও আমার কাছে তোমার চেয়ে কম স্নেহের হবে না। এখানে ওকে সবদিক দিয়ে সুখে রাখবো। ও তো এই এলাকার রাণী হয়ে থাকবে।'—শেষ কথাটা বলার সময় এক অদ্ভুত ক্রুর হাসি ফুটে উঠেছিল পণ্ডিতজীর মুখে, রোশনলাল মাথা নিচু করেছিল বলে তা দেখতে পেল না, দেখলে হয়তো ও ভয়ে শিউরে উঠতো। পণ্ডিতজী আবার বললেন, 'তাহলে শুভ মুহূর্তটির কথা ঘোষণা করে দেওয়া হোক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ···হ্যাঁ···ইয়ে···না···এখনই না···দু-চার দিন আরও যাক।'

'ঠিক আছে···এখন তুমি টাকাটা নিয়ে যাও। একটু বোসো,

আসছি।' ওঁর ওঠার শব্দ হতেই দরজার বাইরে একটা শব্দ হলো, যেন কেউ পা ঘেঁসটে ঘেঁসটে হেঁটে তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টা করছে।

## ২৯

দুর্গাদাস গেল হুকুমচন্দ পসারীর কাছে, জানতে চাইল শক্তি বাড়াবার কোনো ওষুধ তার কাছে আছে কিনা।

'হুকুমচন্দ দুর্গাদাসকে আশপাশ তলা দেখে নিয়ে বলল, 'পণ্ডিতজী কী ধরণের শক্তি বাড়াবার ওষুধ তোমার দরকার ?'

দুর্গাদাস কাশতে লাগল। চিবুক দিয়ে লালা ঝরছিল। গামছা দিয়ে মুছে নিয়ে বলল, 'ঐ আর কি, শক্তি বাড়াবার যে ওষুধ তুমি অন্যদের দাও সেইরকম ওষুধ চাই আমার⋯মানে পণ্ডিত হংসরাজের ছেলেকে যেমন দিয়েছিল তার বিয়ের পর, সেরকম চাই।'

'বুঝেছি⋯বুঝেছি⋯,' হুকুমচন্দ জোরে হেসে উঠল। ওকে ঐভাবে হাসতে দেখে দুর্গাদাস বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। হাসি থামিয়ে শিশি ভরে ওষুধ দিল হুকুমচন্দ।

'এটা সাত দিনের ওষুধ, তারপর আবার নিয়ে যাবে। লাল লংকা, টক আর তেলে ভাজা জিনিষ খাওয়া মানা, খুব দুধ খাবে, শুনেছ ? তিনটাকা।⋯'

দুর্গাদাস তিনটাকা দিল। একটু চুপ করে থাকার পর প্রশ্ন করল, 'আমার এই কানা চোখের চিকিৎসা হয় না ?'

'ভগবান ছাড়া আর কেউ ওর চিকিৎসা করতে পারবে না। তবে একটা কাজ করতে পারো, শহরে গিয়ে কানা চোখে পাথরের নকল চোখ বসিয়ে আসা যায়। একেবারে সত্যিকারের চোখের মতোই দেখতে।'

'কতো টাকা লাগবে ?' দুর্গাদাস জানতে চাইল।

'তাতো আমি জানি না, শহরের ডাক্তার ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না ও কাজ।'

'ঠিক আছে আমি শহরেই যাব', যুদ্ধজেতার মতো করে ঘোষণা করল দুর্গাদাস, 'শহরে যাবো।' তবে একটা কথা, যতদিন না যাওয়া হচ্ছে ততদিন রঙীন কাঁচের চশমা পরতে পারি? কোনো ক্ষতি হবে না তো?

'একটুও না', হুকুমচাঁদ হেসে বলল, 'একেবারে উকীল ব্যারিস্টারের মতো দেখতে লাগবে। দুর্গাদাস ব্যারিস্টার।

ইতিমধ্যে দু-চারজন দোকানদারও ওখানে ভীড় করেছিল, তারা বলতে শুরু করল 'দুর্গাদাস ব্যারিস্টার···দুর্গাদাস ব্যারিস্টার'।

সারা শরীর লজ্জায়, অপমানে কাঁপছিল দুর্গাদাসের। তাড়াতাড়ি ওষুধের শিশিটা কোর্টের পকেটে পুরে লাঠি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। দোকানদাররা ওর রাস্তা রুখে দাঁড়িয়ে পড়ে আরও ঠাট্টা করতে লাগল।

হতাশ দুর্গাদাস তখন ধরা গলায় বলল, 'আমি কুৎসিৎ, ভীষণ খারাপ দেখতে। কিন্তু বলো তো তোমরা, এরজন্যে আমার কতটুকু দোষ? কতখানি দায়ী?'

মুহূর্তের মধ্যে সকলে চুপ করে গেল, হাসির বদলে মুখে এখন গাম্ভীর্যের ছায়া। সকলেই যেন একটা পরম সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলল. সত্যিই তো কুৎসিৎ হবার ব্যাপারে দুর্গাদাস কতটুকু দায়ী, তাছাড়া তারাও তো এক একজন দুর্গাদাস হয়ে উঠতে পারত।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুর্গাদাস চলে গেল, এবারে আর কেউ ওকে বিরক্ত করল না।

মান্দর নদীর তীরে বাবা অহরমননাথের আশ্রমে গিয়ে দুর্গাদাস প্রণাম করল।

বাবা অহরমননাথ তাঁর রক্তবর্ণ চক্ষু ধীরে ধীরে খুলে বললেন, 'বেটা, কি চাও তুমি?'

'বাবাজী, পূজো এনেছি', এই বলে দুর্গাদাস মিছরী আর পাঁচটা টাকা ওঁর সামনে রাখল।

'বোলো বেটা···ক্যেয়া চাহতা হ্যায়?'

'আপনার দয়া চাই বাবাজী, কৃপা করে আমাকে বশীকরণ মন্ত্র দান

করুন।'

'কেন? বশীকরণ মন্ত্র চাইছিস কেন? যাকে দেখে তুই মুগ্ধ হয়েছিস সে তো বিবাহিতা।'

'না, মহারাজ, আমার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবার কথা। ওকে আমি ভীষণভাবে চাই।'

'তাহলে?'

'মহারাজ আমি খুবই কুৎসিৎ···মানুষ বলেই মনে হয় না। আমাকে আপনি দয়া করুন প্রভু। এমন একটা ক্ষমতা দিন যাতে সে আমার রূপ না দেখে, হৃদয় দেখে।'

বাবাজী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আজ রাতে মান্দর নদীর তীরে যে চিতা জ্বলতে দেখবি—কিংবা যদি কোনো চিতা জ্বলতে না দেখিস, তবে পুরনো কবর স্থানে চলে যাবি। তারপর রাত বারোটা থেকে পুরো একঘণ্টা সবচেয়ে পুরনো কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে জোরে জোরে এই মন্ত্রটা পাঠ করবি...। আমার মুখের কাছে তোর কান নিয়ে আয়।'

বাবাজী তার কানে কানে একটা মন্ত্র তিন-চারবার উচ্চারণ করলেন।

'মুখস্থ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ প্রভু।'

'তাহলে এবার যা।'

'যাচ্ছি প্রভু'

'যা বলছি, হারামী, কুত্তা, ল্যাংড়া, বদমাস...দূর হ এখান থেকে।'

প্রণাম করতে করতে দুর্গাদাস পালাল। দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত বাবাজী শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন তাকে।

তারপর পাশে বসে থাকা সমাধিস্থ সাধুটিকে বললেন, 'এই ভোলানাথ···ভোলানাথ···এই শূয়োরের বাচ্চা···।'

খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলল ভোলানাথ, এপাশ ওপাশ দেখে শান্তভাবে বলল, 'আদেশ করুন গুরুজী।'

'এই পাঁচ টাকা ধর। সরকারী দোকানে গিয়ে এক টাকার

চরস, দুটাকার আফিম আর বাকী টাকার মদ নিয়ে আয়।'

'শাশ্বত সত্য···শিব-শম্ভু,···শিব-শম্ভু···চলুক···চলুক··গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস···।' ভোলানাথ বেরিয়ে গেল।

··সেই রাতে কেউ যদি মা·দরের পুরনো গোরস্থানের পাশ দিয়ে যেত তবে একটা দৃশ্য দেখে তার শরীর এমনভাবে ভয়ে কেঁপে উঠতো যে বলার নয়। এবং ভবিষ্যতেও সেই দৃশ্যটির কথা ভাবলে সে শিউরে শিউরে উঠবে।

·সে দেখতে পেত আধখানা চাঁদের বিষণ্ণ আলো গাছ আর ঝোপঝাড়ে ভরা সেই ভয়ানক অন্ধকারকে দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। গাছ আর ঝোপঝাড়ে ঝুলছে অসংখ্য কাপড়ের লম্বা লম্বা ফালি, যেন তাদের আড়ালে মৃত আত্মারা তাদের সাদা হাড়গুলো দেখতে চাইছে এবং আরও দেখতে পেতো যে একটা জরাজীর্ণ কবরের চারপাশে একটা ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই ভূতটা ল্যাংড়া, একটা চোখ তার জ্বলজ্বল করছে, বড় বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, আর সেই ভূতটা হাত নেড়ে নেড়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে নেচে নেচে শিব, কালী, শ্মশানেশ্বরীকে আহ্বান জানিয়ে বলছে দুর্গাদাসের মনঃস্কামনা যেন পূর্ণ হয়।

অন্ধকারের নিস্তব্ধতা খান খান করে সেই ভূতটা উন্মত্তের মতো নাচছে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একই মন্ত্র পাঠ করে চলেছে। তার নাচ এত ভয়নাক, তার চেহারা এত বীভৎস আর মন্ত্রের শব্দগুলো এত ভয়ংকর যে মনে হয় কবরের মধ্যে শুয়ে থাকা মৃতদেহগুলো পর্যন্ত ভয়ে চমকে উঠছিল।

ভূতটা অনেকক্ষণ ধরে নেচে চলেছিল, তার পায়ের চাপে উড়ছিল ধুলো। এবং সেই ধুলোর ফলে পরিবেশটা আরও ছায়াময়, রহস্যঘন হয়ে ওঠায় ভূতটাকে বিশালাকৃতির ছায়ার মতো মনে হচ্ছিল। ক্রমশঃ তার নাচ এবং মন্ত্রোচ্চারণ দ্রুততর হয়ে উঠছিল। এক সময়ে ক্লান্ত, অবসন্ন মানুষটা ছিটকে পড়ল একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের গায়ে। ঐ অবস্থায় হাত-পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ পড়ে থাকলো। ধীরে ধীরে চাঁদ চলে গেল পাহাড়ের আড়ালে···তারাগুলো মিলিয়ে আসতে শুরু

করল একে একে···আরও কিছুক্ষণ পরে পূবের আকাশে দেখা গেল আলোর আভা। বাতাসও যেন ঐ গোরস্থানের কাছে এসে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।···

৩০

দুর্গাদাসের এই বিচিত্র কাহিনী সারা গাঁয়ের লোক জেনে গেছে। সকলের মুখে মুখে ফিরছে তার প্রেম-কাহিনীর কথা। দুর্গাদাসের কদাকার রূপ এবং তার ঐসব হাস্যকর প্রচেষ্টা হয়ে উঠল রঙ্গ-রসিকতার মূল বিষয়। সুন্দর এবং কুৎসিতের আলোচনায় শ্যাম নিজেকে জড়াতে চাইল না। এই দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য নাও থাকতে পারে—কিন্তু যেখানে প্রেম নেই, সেখানে মিলনের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া শ্যাম জোর জবরদস্তি করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। বন্তীকে ভালোবাসবার পূর্ণ অধিকার দুর্গাদাসের আছে, কিন্তু বন্তী যখন ওকে ভালোবাসে না, তখন জোর করে বিয়ে করার প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। বিশেষ করে বন্তীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস এতই বেশি যে দুর্গাদাস তার ধারে কাছে লাগে না। বিয়ে কি করে সম্ভব? অথচ এই প্রশ্নটা শ্যাম এড়িয়ে যেতেও পারছে না। কারণ এটা তারও জীবন-মরণের প্রশ্ন, তার ভালোবাসার প্রশ্ন। স্বরূপকিষণ বা রোশনলাল ঐ বিয়ের কথা এখনও প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও দুর্গাদাসের আচরণে সবাই জেনে গেছে। সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে বন্তীর সঙ্গে দুর্গাদাসের বিয়ে হচ্ছেই···সম্বন্ধও কথা পাকা হয়ে গেছে। অতএব শ্যামকে একটা কিছু করতেই হচ্ছে। এর আগে কয়েকজন যুবতীর সঙ্গে শ্যাম যে প্রেম করে নি, তা নয়, তবে বন্তীর ব্যাপারটা অন্য। আগেকার প্রেমে ছিল চপলতা, উচ্ছ্বাস, কিন্তু বন্তীর সঙ্গে তার প্রেমের গভীরতার অন্ত সে নিজেই খুঁজে পায় না।

আগে যখন ওর বন্ধু-বান্ধবরা প্রেম করতো, তখন শ্যাম তাদের কতো ঠাট্টা করেছে। প্রেম কি? এই নিয়ে আলোচনা করতে

গিয়ে শ্যাম বলত—সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনো প্রেম করি নি, তবে করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এটাও ঠিক যুবক-যুবতীর প্রেম বলতেই দেহগত ব্যাপারটা শ্যামের চোখে বড় হয়ে উঠত। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সবসময়ে সে কোনো বড় একটা কিছু ভাববার চেষ্টা করত না। যুবতীর সঙ্গে প্রেম করার বদলে একটা খরগোশকে ভালোবাসা অনেক ভাল, এমন কথাও তার মাথায় উদয় হতো। কেমন নরম-নধর তার দেহ, গায়ে হাত বোলালে সে কি অপূর্ব অনুভূতি···

···আজ কিন্তু শ্যামের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রেম এখন ওর কাছে এক গভীর বহতা নদী, যেখানে ডুব দেবার কথা চিন্তা করলেও সারা শরীরে শিহরণ জাগে। প্রেম তার জীবনে এনে দিয়েছে এক বিচিত্র পরিবর্তন। তার সমগ্র সত্তা যেন ডুবে গেছে এক বিষণ্ণতার সাগরে। তার ব্যক্তিত্ব, তার ইচ্ছাশক্তি সব যেন হারিয়ে গিয়ে, অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে। এক নতুন দিগন্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে তার অন্তরাত্মা। তার বদলে সে হয়ে উঠেছে এক নতুন মানুষ, যার কাছে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে অনাস্বাদিত মাধুর্যে। আগে এমন কখনও হয় নি।

তাহলে এখন তার কি করা উচিত? চুপ করে বসে থাকবে এবং দেখবে কিভাবে সমাজ তার লৌহকঠিন বজ্রমুষ্টি দিয়ে গলা টিপে ধরছে শ্যামের সুখ-স্বপ্নের?

কিন্তু তা তো হতে দেওয়া যায় না। অথচ তার মা-বাবা এর বিরুদ্ধে। শ্যামের সমাজ আর বন্তীর সমাজ কখনও এক হতে পারে না। বন্তীর বিয়ের ঠিক হয়েছে অন্যত্র, শ্যামের বিয়ের কথাও প্রায় পাকা হয়ে গেছে অন্য মেয়ের সঙ্গে। দুজনের জগতও আলাদা। জাত-পাত, উচ্চ-নীচের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে। তাছাড়া একলাও কতটুকুই বা করতে পারে? বয়েস কম আছে ঠিকই, কলেজে পড়ে, টাকা-পয়সার ব্যাপারে মা-বাপের ওপর নির্ভরশীল···বন্তীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? এই পৃথিবীটাই এমনভাবে অর্থের গোলাম হয়ে গেছে যে

তার অভাবে প্রতি পদে পদে তাদের আঘাত পেতে হবে, বস্তীর ফুলের মতো সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে...হ্যাঁ কথাটা মিথ্যে নয়। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে শ্যামকে।

হঠাৎ শ্যামের ভীষণ রাগ হতে লাগল নিজের ওপর, এবং ঝড়ের আঘাতে নড়বড়ে নৌকো যেভাবে কাঁপে, সেইভাবে কাঁপতে লাগল ওর শরীর···কাপুরুষ···কাপুরুষ...কাপুরুষ···কালপুরুষ ছোটলোক··· এইভাবে তুমি তোমার পবিত্র প্রেমের অমর্যাদা করবে? বুদ্ধির দোহাই দিয়ে নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে চাইছ।···এভাবে প্রেমের অপমান কোরো না, এত সস্তা হতে দিও না তাকে। তোমার ভীতির কারণগুলো খুঁজে বের করো। এর পিছনে তোমার নীচতার, দুর্বলতার রূপটিই ফুটে উঠছে! কুৎসিতের অন্ধ চোখ, যা নতুন জীবনকে এক অন্ধকারে আবৃত করে দিচ্ছে, ওটা তোমারই চোখ। যে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং বিড়ম্বনার ল্যাংড়া ভূতটি তোমার আশা আর আকাঙ্ক্ষার কবরের ওপর নাচছে, সে কিন্তু তোমারই মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

শ্যামের প্রতি ধমনীতে যেন উষ্ণ লাভার স্রোত বইতে লাগল এবং সেই মুহূর্তে ও প্রতীক্ষা করল, যাই হোক না কেন বস্তীর সঙ্গে দুর্গাদাসের বিয়ে হতে দেবে না। যেমন ভাবেই হোক আটকাবে।

## ৩১

শ্যাম সইদার মারফত ছায়াকে খবর পাঠাল যে সে দেখা করতে চায়। এমনিতেই ছায়া ওদের বাড়ী খুব কম আসছিলেন, বস্তী তো একেবারেই না। তাছাড়া বস্তীর মামা রোশনলালও ওকে বাড়ী থেকে বেরোতে দিচ্ছিলেন না। মা-মেয়ের ওপর নানা রকম বিধি-নিষেধ। আহত বাঘিনীর মতো ছায়া ক্ষেপে উঠেছিল। বাড়ীতে রোজই প্রায় ঝগড়া। বস্তী ক'দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে খালি কেঁদে চলেছে।' ছায়া সব কথা জানালেন শ্যামকে।

'তাহলে এবারে তুমি কি করবে মাসী?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে, যদি জোর করে ওরা বন্তীর বিয়ে দিতে চায় তাহলে সকলের সামনে ধর্মের··· ।'

'মাসী, তুমি ধর্মের দোহাই পাড়তে থাকবে, এবং ঐ ধর্মেরই নাম নিয়ে স্বরূপকিষণ তোমার মেয়ের বিয়েটা সেরে ফেলবে সেই ফাঁকে।

'না, তা হতে আমি দেব না। আমি চেঁচাব, সভার সকলের সামনে বুক চাপড়াবো···দেখবো সমাজ কি সত্যিই এত নির্লজ্জ ··।'

'এসবে কিছু হবে না মাসী। আমার কথা শোনো বন্তীকে নিয়ে তুমি শহরে চলে যাও, আর এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকবে যাতে কেউ খুঁজে না পায়। তারপর বিয়ের লগ্নটা পার হয়ে গেলে গ্রামে ফিরে এসো।'

'হায় ভগবান! আমার শয়তান ভাইটার কথা আর কি বলব? ও এতো ছোটলোক কি করে যে হয়ে গেল ভেবে পাইনা। বন্তীর ওপর এমন কড়া নজর রাখে যে বলার নয়। ওতো আমাকেও বাড়ী থেকে বেরোতে দেয় না, তবে তত জোর খাটাতে পারে না। যেদিন শুনলাম ও স্বরূপকিষণের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে সেদিন থেকে আমার সারা শরীর জ্বলছে। ভাইটা যে কেন মরে না··· ।'

'গালাগাল দিয়ে কোন লাভ নেই মাসী, একটা পথ বের করতে হবে।'

'তুমি ভাবছ ছায়া চুপচাপ বসে আছে। না, রোজই ঝগড়া হয়। কিন্তু শয়তান ভাইটা আমাকে তো মেরেইছে এমন কি আমার ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে পর্যন্ত চড় মেরেছে। ঐ হাতে কুষ্ঠ হোক পাপীটার... ।'

শ্যাম একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'মাসী, তুমি কি জানো··· ।' কথাটা শেষ করল না সে।

ছায়ার বিষণ্ন মুখে হাসির আভাস দেখা গেল—'সন্দেহ একটু করেছিলাম, এখন সব জানি··· ।'

শ্যামঃ 'এটা আমার জীবনের···'

শ্যামের কথার মাঝখানেই ছায়া বলে উঠলেন, 'কিন্তু তোমার মা,

তোমার বাবা…

'ওসব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে সবচেয়ে জরুরী হলো এই বিয়েটা আটকানো। আমার বাবা-মা আজ না মানলেও, কাল সব মেনে নেবেন, এক বছর পরে মানবেন। একদিন না একদিন তো মেনে নিতেই হবে। আর যদি রাজী না হলেই বা কি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ছায়া মাথা নিচু করে বললেন, 'এই হতভাগা প্রেম আমাকে কত কষ্টই না দিয়েছে জীবনে, 'ওঁর কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ফুটে উঠছিল, 'তখন আমিও ভেবেছিলাম এক পাও পিছিয়ে আসব না, তাতে যত ক্ষতিই হয় হোক। ভালোবাসবো শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত…।'

ছায়া চুপ করে গেলেন। চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল। বন্তীর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে সেই শোকাশ্রু আর বাধা মানল না।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শ্যাম বলল, 'একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। তুমি আদালতে একটা দরখাস্ত করে জানিয়ে দাও, ভাই রোশনলাল বন্তীর বিয়ে দেবার জন্যে স্বরূপকিষণের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে…।'

'কিন্তু তাহলে তো আমার ভাইয়ের জেল হয়ে যাবে …তুমি তো জানো এভাবে বিয়ের জন্যে টাকা নিলে তিন বছরের শাস্তি হয়।'

একটু ভেবে শ্যাম বলল, 'ঠিক আছে অত কথাও বলার দরকার নেই। এটুকু বললেই চলবে যে আমার ভাই রোশনলাল আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বন্তীর বিয়ে দিতে চাইছে জোর করে। আদালতের কাছে এই প্রার্থনা যে বিয়েটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। ফলে আদালত তদন্ত শুরু করবেই, এবং বিয়েটা আটকে যাবে।'

'ও কিন্তু আমার আর আমাদের মেয়ের গার্জেন, যা খুশি করতে পারে।'

'না, পারে না,' শ্যাম বলল, 'তুমি ভালো উকিলের কাছে গিয়ে দরখাস্ত লেখাও। ইনজাংকসান চাইবে।'

'ইঞ্জেকসান ?'

'না, ইঞ্জেকসান, উকিল সব বলে দেবে তোমাকে। আর ঐ সঙ্গে রোশন লালকে গার্জেনের পদ থেকে সরিয়ে দেবারও প্রার্থনা থাকবে দরখাস্তে।'

ছায়ার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'এটাই সবচেয়ে ভালো হবে। আমি কালকেই দরখাস্ত করছি···কিন্তু,' হঠাৎ ছায়ার মুখ আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠল, 'কিন্তু ঐ দরখাস্তটাও তো দিতে হবে তহশীলদার সাহেবের অফিসে।'

শ্যাম বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না মাসী, শুধু দরখাস্তটা করে দাও। বাবার সঙ্গে কথা বলব আমি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ছায়া শ্যামের হাত দুটো ধরে বলে উঠলেন, 'তুমি আমায় বাঁচালে বাবা। দীর্ঘজীবী হও, দুঃখীনীর আশীর্বাদ থাকবে তোমার সঙ্গে।'

ছায়া চলে গেলেন। সইদা এতক্ষণ চুপচাপ বসে কুঞ্জের ঘাস কাটছিল, এবার শ্যামের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'মামলাটা খুব সোজা নয় সাহেব।'

শ্যাম উত্তর দিলো না, সে এখন জ্বলছে নিজের জ্বালায়।

সইদা একটু কেশে বলল, 'আমার জামাটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে, পয়সাও নেই। একটা জামা করিয়ে দেবেন।'

শ্যাম দু'টাকা কয়েক আনা ওকে দিল। সইদা সেলাম করে ওখান থেকে রওনা দিল।

কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে ক্ষেতের আলের পথ ধরে নিজের বাড়ীর দিকে হাঁটছিল সইদা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আবার কয়েক পা এগোল। কি ভেবে দাঁড়াল। আবার বাড়ীর দিকে কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক সময়ে দেখা গেল ও ফিরে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত শ্যামের বাড়ীতে ঢুকল।

শ্যামের মা তখন মোড়ায় বসে তরকারী কুটছিলেন। ওকে দেখে বললেন, 'আয় সইদা।'

সইদা মেঝেতে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল। ওর মুখটা বেশ

ফ্যাকাশে, চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'মাজী, একটা কথা বলব, যদি কাউকে না জানান তবেই…'

৩২

পরদিন সকালে গোলাম হুসেন এসে খবর দিল গত রাতে মোহন সিং বসন্তকিষণকে খুন করেছে।

শ্যামের মাথা ঘুরে গেল কথাটা শুনে। ওর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ধপ করে মোড়ার ওপর বসে পড়ে বললেন, 'রাম…রাম…ঘোর কলিযুগ এসে গেছে…'

'কিন্তু হলো কেমন করে?' শ্যাম জানতে চাইল।

'তা তো জানি না। শেষ রাতের দিকে খুনটা হয়েছে, সারা গ্রামের লোক গণ্ডগোল শুরু করে দিয়েছে। বসন্তকিষণের লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। দারুণ ভীড়। শুনেছি, আজ ওখানে সরকারী কমিশন বসার কথা ছিল। অনেক অফিসাররাও হাসপাতালে গেছেন।'

'ছি, ছি, ছি…কী যুগ এসেছে। রাজপুত ব্রাহ্মণকে খুন করে দিল? কি দিনকাল হলো রে বাবা, ব্রাহ্মণ হত্যা করছে রাজপুত…আমার তো হাত-পা চলছে না…।' কাঁদতে লাগলেন শ্যামের মা। একটু পরে চোখ মুছে বললেন, 'ওটা তো রাজপুত না, সাক্ষাৎ রাক্ষস। নীচজাতের মেয়েমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করে মোহন সিংও নীচ হয়ে গেছে। এই রকমই তো তার পরিচয়।'

শ্যামের মায়ের মুখে খবর শুনে শ্যামের বাবা ছুটলেন হাসপাতালে।

'মা, আমিও একটু হাসপাতালে যাচ্ছি।' শ্যামের মা ভীষণ ভয় পেয়ে তাকে যেতে নিষেধ করতে লাগলেন। মাকে বলল শ্যাম, 'তুমি একটুও চিন্তা কোরো না।'

গোলাম হুসেন জানালো, 'মোহন সিংও হাসপাতালে আছে। তার কয়েকটা ঘায়ের সেলাই খুলে গেছে। রক্তও পড়ছে খুব। ওর

হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে লোহার খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। পুলিশও পাহারা দিচ্ছে।'

হাসপাতালে প্রচণ্ড ভীড়। বারান্দায়, বাগানে, ওয়ার্ডে সর্বত্র মানুষে গিজগিজ করছে। খুব আলোচনা চলছে। একটা শ্যামলা রঙের যুবক হাত-পা নেড়ে বলছিল, 'আমি চট করে ওর হাতটা তখন ধরে ফেললাম, আমাকে ও ছুরি মারতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। তারপর ওর পায়ে পা লাগিয়ে প্যাঁচ কষতেই ও মাটিতে পড়ে যায়।'

'মোহন সিংয়ের কথা বলছ?' শ্যাম জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?'

সেলাম করে ওই যুবক আবার মহা উৎসাহে বলতে শুরু করল, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন সাহেব, রাত তিনটে আন্দাজ প্রতিবেশীর বাড়ীতে একটু হট্টগোল শুনতে পেলাম। আমি থাকি পণ্ডিত বসন্তকিষণ আর স্বরূপকিষণদের বাড়ীর কাছে।'

'তাই নাকি', শ্যাম বলল।

কে একজন জানাল যুবকটি লালা কোড়ুমলের ছেলে, জগজীত।

জগজীত বলতে লাগল, 'রাত তিনটে আন্দাজ প্রতিবেশীর বাড়ীতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল শুনতে পেলাম। বাচ্চা আর মেয়েরা কাঁদছিল। একসময়ে দুর্গাদাসের চীৎকারও শুনতে পাই। পণ্ডিত স্বরূপকিষণ চেঁচিয়ে লোকজনদের ডাকছিলেন।'

'আমি যেভাবে ছিলাম, ছুটলাম। হাতে একটা লাঠি পর্যন্ত নেবার সময় পাইনি। ওখানে গিয়ে শুনলাম এইমাত্র মোহন সিং বসন্তকিষণকে ছুরি মেরে পালিয়েছে দেওয়াল টপকে। ওখান থেকে মোহন সিং যায় স্বরূপকিষণজীর বাড়ী। সেখানেও প্রায় সবাই জেগে উঠেছিলেন। ফলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মোহন সিং হাতে ছুরি নিয়েই উঠোন পার হয়ে ভুট্টার ক্ষেতে ঢুকেছে। আমি যখন ওখানে পৌঁছলাম দেখি মোহন সিং মাঠের ওপারে আলের ওপর উঠছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে যখন ওকে ধরলাম, তখন ও আমায় বলল, "ছেড়ে দে আমাকে, ছেড়ে দে।" আমি বললাম, "খুন করে পালাচ্ছিস, তোকে ছাড়ব কেন?"

তখন ও বলল, "আমি খুন করিনি, ন্যায় বিচার করেছি।" আমি বললাম, 'সে বিচার আদালত করবে। আর তখনই ও আমাকে ছুরি মারতে চেয়েছিল··· ।'

পণ্ডিত পেড়ারাম বললেন, 'তোমাকে সাহায্য করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসেনি, মানে, স্বরূপকিষণজীর চাকর-বাকররা ।'

'এলো আর কোথায় ?' জগজীত হাত নেড়ে বলল, 'এরা তো সব চাষী। জমিদার মরে গেলেই ওদের লাভ। তাছাড়া মোহন সিংয়ের মতো খুনীর পিছনে ছোটার দরকারই বা কি ছিল ওদের ?'

একজন চাষী ওখানে উপস্থিত ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'আমরা তো নীচের বাড়ীতে দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়েছিলাম, হট্টগোলের শব্দ কানেই আসেনি।'

'সব বুঝেছি', গড়গঞ্জজি বললেন, 'তোদের আমি ভালোভাবেই চিনি। সব নিমকহারামের দল।'

ছোকরা তখন বেগতিক দেখে ভঞ্জীমল সোনারকে লক্ষ্য করে বলল, 'লালাজী, আপনিই বলুন, মানুষ যদি বাড়ীর মধ্যে থাকে তবে কি সে বাইরের আওয়াজ শুনতে পাবে, বিশেষ করে সেই বাড়ীতে যদি জানলা না থাকে।'

'আর সাফাই গাইতে হবে না··· ।'

এক চৌকিদার কড়া গলায় বলে উঠল, 'এদের কথা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। সব কটা বদমাস। কে জানে মোহন সিংয়ের সঙ্গে এদের ষড়যন্ত্র আছে কিনা ?'

অনেকে চৌকিদারকে সমর্থন করল। একজন বলল, 'এই চাষীগুলোকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।'

অন্যজন সুর মেলাল, 'পুলিশ জানে কীভাবে এদের পেট থেকে কথা বের করতে হয়।'

চাষীটা কাঁদ কাঁদ সুরে বলল, 'দোহাই হুজুর, দোহাই। আরে ভাই তোমরা গ্রামের লোক হয়ে এসব উল্টো-পাল্টা কি বলছ ?'

তৃতীয়জন বলল, 'দাঁড়াও না, দারোগা ইয়ার মহম্মদ একবার

চোখ লাল করে ডাণ্ডা তুললেই সব সত্যি কথাগুলো বেরিয়ে আসবে হড়হড় করে।

চাষী বেশ বিচলিত। জগজিত তখনো নিজের কৃতিত্বের কথা ফলাও করে বলে চলেছে, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন, ওর পায়ে পা লাগিয়ে মাটিতে ফেলে দিলাম। মুখ থুবড়ে পড়েছিল, পড়েই রইল, কিছুতেই ওঠেনা। প্রথমে ভাবলাম ন্যাকামী করছে, অন্যমনস্ক হলেই পালাবে। দাঁড়িয়ে থাকলাম মাথার কাছে। কিন্তু কিছুতেই উঠছে না দেখে ওর চুলের মুঠি ধরে মুখটা আমার দিকে ফেরাতেই দেখি মোহন সিং-এর মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জ্ঞান নেই। ভালো করে তাকিয়ে দেখি পিঠ থেকে গল গল করে রক্ত পড়ছে। ভয় পেয়ে চেঁচামিচি শুরু করলাম। তারপরের ঘটনা তো জানেনই···মোহনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। আর আমি তো এই···।'

এইসময় কে একজন এসে আবার মোহন সিং-এর কথা তুলতেই জগজিত আবার প্রথম থেকে ফলাও করে বলতে শুরু করল, 'মানে কথাটা কি জানেন, রাত তখন তিনটে হবে···'

শ্যাম অন্যদিকে এগিয়ে গেল। সেখানে একজন বলছিল, 'আমি মান-সম্মানের কথা বলছি। শুনেছি বসন্তকিষণ একবার চন্দ্রাকে রাস্তায় খুব বিরক্ত করেছিল, এমন কি ওর সতীত্ব পর্যন্ত নষ্ট করতে চেয়েছিল।'

'একেবারে মিথ্যে কথা.' একজন ব্রাহ্মণ বলল।

দ্বিতীয় জন বলল, 'সবই হতে পারে ভাই, সবই হতে পারে। বসন্তকিষণকে তো আমরা ভালোভাবেই চিনি। ওর স্বভাব-চরিত্রের কথা কে না জানে। ভগবান ওর আত্মার কল্যাণ করুন। যে মরে গেছে তার বিরুদ্ধে কিছু না বলাই ভালো।'

'খোদার জগতে সবাইকে মরতে হবে, কিন্তু ইমানের প্রশ্নটাও তো বাদ দেওয়া যায় না,' প্রথমজন আবার বলল।

'তা এতে আছেই বা কি?' অন্য একজন বলতে শুরু করে দিল,

'এই হারামজাদী চন্দ্রাটাকেই দেখ না কেন। নীচজাতের মেয়েমানুষ, চালচুলো নেই। বসন্তকিষণ যদি একটু রসিকতা করেই থাকে, তাতে এমন কি ভয়ানক ব্যাপার হয়েছিল? ওকি মহারাণী নাকি? রাজকুমারী? এই সেদিন পর্যন্ত লোকের দোরে দোরে ঘুরত ভিক্ষের জন্যে, আর এখন হঠাৎ দারুণ সম্মানী হয়ে উঠেছে···হুঁ।'

অন্য একজন মন্তব্য করল, 'কিন্তু ভাই, ও তো এক রাজপুতের প্রেমিকা। সঙ্গ করতে করতে নিজেও রাজপুতানী হয়ে গেছে।'

সকলে হেসে উঠল। শ্যামের ভালো লাগল না এদের হাসি। জনতার গুঞ্জন থামার নয়। সকলেই নিজের মত জাহির করতে চায়। কেউ কেউ মোহন লালকে সমর্থন করল, কারণ এটা নাকি তার মান-সম্মানের প্রশ্ন ছিল।

'তাই বলে সামান্য-সামান্য কথায় খুন-খারাপি হয়ে যাবে? খুব বললেন বটে একটা কথা।'

অন্য একজন বলল, 'শুনেছি বসন্তকিষণের পাঁজরের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে।'

'না, অনেক পরে মরেছে। অনেকক্ষণ ধরে রক্ত পড়েছিল। তারপর তো ওকে হাসপাতালে এনেছে।'

'খুনীও এখানে, বসন্তকিষণও এখানে···ভাগ্যের কি পরিহাস, তুজনেই এক হাসপাতালে।'

জনতার মধ্যে যখন এইরকম আলোচনা চলছে, তখন একজন হঠাৎ দৌড়ে বারান্দা থেকে নেমে বাগানে এলো, 'বসন্তকিষণ বেঁচে আছে, মরে নি!'

লোকটার চিৎকার শুনে বাগানে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

'বসন্তকিষণ মরে নি,' লোকটা আবার চেঁচিয়ে বলল, 'ও বেঁচে আছে।'

শূন্যতা···এক গভীর শূন্যতা বোধ···দূর থেকে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক শুনতে পেল শ্যাম···আকাশ থেকে ভেসে আসছিল।

'ও বেঁচে আছে,' লোকটা উত্তেজিত, 'বিশ্বাস না হয় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো। মরে নি, শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে। নাড়ী থেমে গিয়েছিল বলে বাড়ীর লোক ধরে নেয় যে বসন্তকিষণ মরে গেছে।... এখন নাড়ী ফিরে এসেছে।'

জনতার মুখ থেকে হতাশার ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে আসছে, তারা লোকটার কথা বিশ্বাস করতে লাগল।

সবাই ছুটল অপারেশন থিয়েটারের দিকে। কিন্তু পুলিশ মাঝ পথে ওদের আটকে দিল। পণ্ডিত স্বরূপকিষণ ওদের দিকেই আসছিলেন, সবাই হাত জোড় করে প্রণাম জানাল।

'পণ্ডিতজী...' সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'আমার ভাই বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে।'

সবাই পণ্ডিতজীকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। তিনি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওপাশে অপারেশন থিয়েটারে বসন্তকিষণের চিকিৎসা করছিলেন ডাক্তার সারা তহশীলে অন্য কোনো ডাক্তার না থাকায় সরকারী কমিশন ডাক্তারকে কাজে যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছে।

বসন্তকিষণ তখনও অজ্ঞান। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। বড় বড় মাথার চুল এলোমেলো। জানতে চাইলে ডাক্তার শ্যামকে বললেন, 'খুব রক্ত বেরিয়েছে, এখনও ঠিক মতো থামানো যায় নি। বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না, তবে চেষ্টা করে যেতে তো হবেই।'

'ঠিক বলেছেন,' শ্যাম ঘাড় নাড়ল, তারপর একটু সময় নিয়ে প্রশ্ন করল, 'শুনেছি মোহন সিং-এর...।'

'হ্যাঁ, ওর ঘা দিয়ে আবার রক্ত পড়ছে। আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। হতভাগাটা এক নম্বরের বুদ্ধু।'

বাগানের এক কোণে ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল চন্দ্রা।

শ্যাম ওর কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ডাকল, 'চন্দ্রা', উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল।

চন্দ্রা একবার তার দিকে তাকাল, এবং তারপর শূন্য আকাশে দৃষ্টি মেলে দিল। ওর ফ্যাকাশে ঠোঁট টান টান হয়ে আছে, চোখে জল নেই। তবে ওর মুখে-চোখে এক দৃঢ় সংকল্পের ছাপ সুস্পষ্ট, যা নিরাশা, মৃত্যু এবং অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে অনেক উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যেন।

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে শ্যাম বলল, 'চন্দ্রা, বসন্তকিষণ মরেনি! বেঁচে আছে। নাড়ী চলছে।'

অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চন্দ্রা তাকিয়ে রইল শ্যামের মুখের দিকে। ধীরে ধীরে তার মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গেল। ঠোঁটের টান টান ভাবটা কোমল হলো। আর সেই বড় বড় ফোঁটায় জল টপটপ করে পড়তে শুরু করল তার চোখ থেকে।

৩৩

দ্বিতীয় দিনেও বসন্তকিষণ মারা গেল না। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ঝুলছিল সে এক বিচিত্র অনিশ্চতায়। মোহন সিংয়ের ঘায়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পুঁজ দেখা দিয়েছে। এবারে কিন্তু চন্দ্রাকে ওয়ার্ডে ঢোকার অনুমতি আর দেওয়া হয় নি। হাসপাতালের লোকেরাই যা করার করবে মোহনের আত্মীয়দেরও ঢুকতে দিচ্ছে না। বাইরে, ভিতরে পুলিশ পাহারা। এখনও মোহন সিংয়ের হাতে-পায়ে বেড়ি। হাসপাতালে হাত-পা খুলে রাখার নিয়ম। এবারে কিন্তু ডাক্তার তাই নিয়ে কোনো চাপ দেন নি। কেউ আর মোহনকে বিশ্বাস করে না। এখন সে শুধু একটা রোগী না, ভয়ংকর অপরাধীও বটে—খুনী।

ঠিকমতো জ্ঞান ফেরার পর পুলিশ জেরা করতে শুরু করল মোহনকে। শ্যামের বাবা এই এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট, তাই মোহনের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু শ্যাম কিছুই বলতে রাজী না।, পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দেয়নি মোহন সিং। চুপ করে শুয়ে থাকে, মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কাতরায়। সেলাই খুলে

যাওয়ায় ব্যথা বেড়েছে, সেইসঙ্গে চন্দ্রা কাছে আসছে না।

ওকে যখন বলা হল বসন্তকিষণ মরেনি, বেঁচে আছে—তখনও মোহন সিং মুখ খুলল না। শুধু ওর মুখটা মড়ার মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর চোখ বন্ধ করে কি যে ভাবতে শুরু করেছিল সেই জানে। পুলিশ তার ওপর জোর-জবরদস্তিও করতে পারছিল না। সাধারণতঃ এই ধরণের অপরাধীদের বেধড়ক পিটিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করে পুলিশ, কিন্তু এক্ষেত্রে মোহনের অবস্থা এতই খারাপ যে মারলে হয়ত মরেই যাবে। তবে তার চেয়েও বড় শাস্তি ওকে দেওয়া হয়েছে—চন্দ্রাকে কাছে আসতে দিচ্ছে না।

···মাঝে মাঝে মোহন সিং দেখতে পেতো অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে কে যেন এগিয়ে আসছে। তার আঙুল এক বিশেষ পরিচিত কোমল হাতকে স্পর্শ করছে, তারপর সে ঐ নরম-সরম পুঁটলিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠের ক্ষতগুলোর জ্বালা কমে যাচ্ছে। এবং ঐ নরম পুঁটলিটাকে বুকে নিয়ে পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল···তার কিছুক্ষণ পরে···দশ মিনিটও হতে পারে বা দু-এক ঘণ্টাও হতে পারে হঠাৎ চমকে ওঠে ও···ওর বুকের ওপর সেই নরম বস্তুটি আর নেই, তার বদলে চেপে বসে আছে লোহার ভারী শেকল। তাহলে চন্দ্রা আসেনি তার কাছে?

···স্বপ্নটা ভেঙ্গে যেতেই আবার সর্বাঙ্গে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করে মোহন সিং। ছটফটানি বাড়ে, সমগ্র শরীরে যেন আগুনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, মোহনের ইচ্ছে—এখনই এই বন্ধ দরজা ভেঙ্গে, পাথরের দেওয়াল বিদীর্ণ করে চন্দ্রা তার কাছে চলে আসুক। এক মুহূর্তের জন্যেও এলে চলবে, ও শুধু চন্দ্রার মুখটা এক লহমার জন্যে দেখতে চায়। তার কোমল হাত একবার শুধু ছুঁয়ে যাক মোহনের কপাল··· তারপর চন্দ্রার নরম দেহলতাকে একটা পুঁটলির মতো বুকে চেপে ধরবে মোহন সিং···মিটে যাবে ওর সব জ্বালা-যন্ত্রণা···আসুক ও, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে ও যেন আসে···

···ঠোঁট কামড়ে ধরে ধীরে ধীরে কাতরাতে শুরু করে মোহন সিং

এবং এক বিচিত্র ভাবনার জগতে ডুবে যায় আস্তে আস্তে···না···না, চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করবো না আমি···এখন তো নয়ই···ওর ব্যথা ভরা মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যাবে···হয়তো দুর্বল হয়ে গিয়ে সব কথা বলে ফেলবো···না···না···এখন ওর সঙ্গে দেখা আমি কিছুতেই করতে পারব না···

ওকে কাতরাতে দেখে একজন সিপাহী বলল, 'মোহন সিং খুব ব্যথা করছে নাকি···ডাকবো চন্দ্রাকে ?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

মোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও চন্দ্রা হাসপাতাল ছেড়ে একপাও যায়নি। ওয়ার্ডের চারপাশে পাগলের মতো ঘুরত, তারপর বাগানের এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ধমক দিলেও শুনতো না। ভালো কথা বললেও কানে নিত না। রাতে হাসপাতালের বারান্দায় কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকত সে। ঘুমোতে ওকে খুব কম লোকই দেখেছে। হয় বারান্দায় ঠেস দিয়ে বসে আছে, নয় যে ঘরে ওর প্রেমিক পুলিশ পাহারায় বন্দী, তার আশে-পাশে ঘুরছে। ওর অবস্থা অনেকটা সেই পাখির মতো, যার বাসাটা হিংস্র চিলে দখল করে নিয়েছে, আর আর্ত-চিৎকার করতে করতে পাখিটা তার বাসার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রার সমগ্র সত্তাই যেন এখন সেই আর্তনাদের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে খবর নিত, 'কেমন আছে ও, ভালো আছে তো ?'

সিপাহীরা বলত, 'খুব ভালো আছে, তোমার কথা সব সময় বলে।'

কথাটা বলেই কিন্তু তারা হো হো করে হেসে উঠত এবং চন্দ্রার মুখ আগুনের আংরার মতো লাল হয়ে যেত। রাগে কাঁপতে থাকত তার শরীর, কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর ক্লান্ত পায়ে সেখান থেকে চলে যেতো সে। নিজেকে সান্ত্বনা দিত, 'ভয় পেয়ো না···সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রায় প্রতিদিনই শ্যাম ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত। ওকে বোঝাতো, চন্দ্রার মায়ের অভাবটা পূরণ করতে চাইত শ্যাম। কারণ

এই ঘটনার পর সারা গাঁয়ে চন্দ্রার হিতৈষী বলতে আর কেউ ছিল না। সকলেই ঘেন্নায় ওর ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চাইছে না। না, শ্যাম ছাড়াও আর একজন চন্দ্রাকে ছেড়ে যায় নি—সে হলো নূরাঁ। এছাড়া কানা কম্পাউণ্ডার বামদেবও চন্দ্রাকে যথা সম্ভব সাহায্য করত, ভালো ব্যবহার করত।

পাঁচ-ছ দিন পরে বসন্তকিষণ কিছুটা সামলে উঠল। ডাক্তার বললেন, 'এখন কিছুটা আশা করা যাচ্ছে। হয়তো বেঁচে যাবে···।'

···'তার মানে বসন্তকিষণ বেঁচে যাবে,' চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল শ্যামকে।

'হ্যাঁ', শ্যাম উত্তর দিল, 'ডাক্তার তো তাই বললেন।'

'তার মানে মোহন সিং-এর আর ফাঁসী হবে না।'

'হ্যাঁ, বেঁচে গেলে ফাঁসী হবে না, তবে মনে হয় যাবজ্জীবন জেল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কমও হতে পারে শাস্তি। বয়েস কম, আর এটাই প্রথম অপরাধ···।'

'যাবজ্জীবন জেল মানে কতদিন?'

'চোদ্দ বছর।'

'আমি··· আমি চোদ্দ বছর ওর জন্যে অপেক্ষা করতে পারব। সারা জীবনই অপেক্ষা করতে পারব।'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে থাকল।

হঠাৎ চন্দ্রা বলে উঠল, 'ও যদি এখান থেকে পালাতে পারে।'

শ্যাম চন্দ্রার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল; চন্দ্রার সাহস, মনের জোর ওকে সবসময়ে বিস্মিত করেছে।

'বলছিলাম কি' চন্দ্রা যেন শ্যামকে বোঝাতে চাইছে, 'ও যখন ভালো হয়ে যাবে, তখন···। ডাক্তার যদি ওকে সুস্থ হয়ে ওঠার সার্টিফিকেট না দেয়, তাহলে কি এই দু-তিনদিনে ও কি পালাতে পারবে না? এটা কি সম্ভব নয়?' খুব আশা নিয়ে চন্দ্রা তাকিয়ে রইল শ্যামের মুখের দিকে।'

'সম্ভব হতে পারে...কিন্তু···।'

'কিন্তু কি?'

'পালিয়ে যাবে কোথায়?'

'খুব দূরে, এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় চলে যাবো, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। সেখানে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবো আমরা।' চন্দ্রার মুখ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু এখান থেকে পালানো কঠিন। সব সময়ে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া ও এখনও ভীষণ দুর্বল...ওর ঘা...।'

'কিন্তু ও তো ভালো হয়ে যাবেই,' চন্দ্রা খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'পালানো খুব শক্ত হবে না। একটা না একটা পথ খুঁজে বের করবই। খুব দূর দেশে চলে যাবো, কিছুদিন ছদ্মবেশ নিয়ে লুকিয়ে থাকলেই হবে। তারপর গণ্ডগোল থেমে গেলে নতুনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করব।'

একটু চুপ করে থাকার পর চন্দ্রা বলে উঠল, 'একটা কাজ...একটা কাজ করে দাও না,' ও শ্যামের হাত চেপে ধরল।

'কি?'

'দারোগা চাইলে সব করতে পারে। ও একটু ইশারা করলেই এখান থেকে পালাতে অসুবিধে হবে না।'

শ্যামের ঠোঁটে ফুটে উঠল এক বিষন্ন হাসি, বলল, 'তা কি করে হয়? খুনের কেস যে। তাছাড়া একাজ ও করবেই বা কেন? বরখাস্ত হয়ে যাবে।'

চন্দ্রা ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু মোহন সিংতো পালাবে হাসপাতাল থেকে, পুলিশের হেফাজত থেকে তো নয়। পাহারায় একটু ঢিলে দিলে কাজটা করা সম্ভব হবে। আর দারোগার গায়েও আঁচ লাগবে না।'

'আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখব', শ্যাম বলল।

তারপর চন্দ্রা এমনভাবে কথা বলতে লাগল, যেন সে নিজের সঙ্গে কথা বলছে: 'দারোগা যদি না শোনে, তাহলেও কাজটা করা যায়। মোহন সিং-এর আত্মবিশ্বাস, পাহারায় ভুলত্রুটি...সিপাহীদের ফোসলানো যায়।...খুব...?'

শ্যাম শুধু দেখেছিল এই মেয়েটির মনে কী গভীর আত্মপ্রত্যয়, সংকল্পে কী অসাধারণ দৃঢ়তা। হায়, সেও যদি চন্দ্রার মতো সাহসী হতে পারত! ওর মনে যদি সেই দৃঢ়তা থাকতো তবে বন্তীকে নিয়ে চলে যেতো কোনো অজানা জায়গায়। কেন যে করতে পারছে না এমনি ধরণের কিছু একটা ?...শ্যাম চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় ও আর আলিজু বেড়াতে বেরিয়েছে, পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। খুব খুশি-খুশি লাগছিল তাঁকে।

'একটা ভালো খবর শোনাই, অফিসাররা কমিশন তুলে নিয়েছেন।'

শ্যাম আর আলিজু দুজনেই দারুণ খুশি হয়ে অভিনন্দন জানাল ডাক্তারকে।

'কখন পেলেন খবরটা ?' আলিজু প্রশ্ন করল, এই ধরণের খবর সাধারণতঃ সেই আগে পায়।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'একটু আগে টেলিগ্রাম এসেছে। কমিশনের একজন সদস্যই একথা আমাকে বলেছেন '

আর একদফা শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানানো হলো ডাক্তারকে। অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে আলিজু প্রশ্ন করল, 'তারপর আপনার রোগীদের খবর কি ?'

'আমার ধারণা...ঠিক বলতে পারছি না...কিন্তু যত দিন যাবে বসন্তকিষণের বেঁচে যাবার আশা ততই বাড়বে। এখন তো শতকরা চল্লিশ ভাগ আশা করা যায়।'

'আর মোহন সিংয়ের খবর কি ?'

'ঠিক হয়ে আসছে। আগের চেয়ে অবস্থা ভালো, তবে খুবই দুর্বল। কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। আমার মনে হয় চন্দ্রাকে যদি ও কাছে পেত...।'

আলিজু হেসে ফেলল, 'আবার কি কমিশন বসাবার ইচ্ছে আছে নাকি আপনার ?'

তিনজনেই হেসে উঠল।

ডাক্তার বললেন, 'ওই বেচারীকে মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার

সুযোগ দেওয়া উচিত।'

আলিজু বলল, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছেন। আরে ও কাজটা তো পুলিশের, কে দেখা করবে, কে করবে না। আপনি ভুলেও এর মধ্যে নিজেকে আর জড়াবেন না। আচ্ছা, বলুন তো আপনি, দেখা করবে কীসের অধিকারে? চন্দ্রা ওর বৌ নয়, বা আত্মীয়াও নয়। আইনমাফিক দরখাস্ত পর্যন্ত করতে পারবে না।'

শ্যাম বলল, 'সারা দুনিয়া জানে ওরা স্বামী-স্ত্রী। চন্দ্রা মোহনকে ভালোবাসে।'

আলিজু বললেন, 'আইনের সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক?'

ডাক্তার হাসলেন, তারপর রোগী দেখার আছে বলে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি হাঁটার পর আলিজু হঠাৎ বলল, 'আপনি কি জানেন ছায়া নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে?'

'কি বললেন?'

'এই মানে রোশনের কর্তৃত্ব সে আর মানবে না। ওই কর্তৃত্বের অধিকার যেন বাতিল করা হয়। আর রোশন লাল নাকি জোর করে বন্তীর সঙ্গে দুর্গাদাসের বিয়ে দিচ্ছে এই সেপ্টেম্বরে। এই বিয়েতে ছায়ার মত নেই এবং এই বিয়ে বন্ধ করা হোক।'

'হুঁ।'

'ছায়া ঐ দরখাস্ত তহশীলদার সাহেবের দপ্তরে পেশ করেছে। তহশীলদার সাহেব দরখাস্ত নেবার আগে নাকি ছায়াকে অনেক বুঝিয়েছিলেন, ও শোনেনি।'

'তহশীলদার সাহেব?' শ্যামের মুখ দিয়ে কথাটা যেন বেরিয়ে গেল।

'হুঁ।'

'তারপর?'

'তিন তারিখে শুনানী হবে। রোশন লালকে উপস্থিত থাকার

হুকুম জারী করা হয়েছে। আমার মনে হয় তহশীলদার সাহেব উনকেই বোঝাবার চেষ্টা করবেন, যাতে ঘরের ঝগড়া বাইরে না যায়। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বললাম—খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছেন।'

'হুঁ।'

'এ ব্যাপারে আপনার কি মত?' আলিজু আড়চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শ্যামের মুখের দিকে।

'না—এ ঘটনার পুরোটা আমার জানা নেই,' শ্যাম শুকনো গলায় বলল।

আলিজু চুপ হয়ে গেল। একটু বাদে আবার বলতে শুরু করল, 'আপনি গালিবের ঐ শেরটা জানেন, যার দ্বিতীয় লাইনটা এই :

'গিরি থি জিস পে কল বিজলী ওহ মেরা আশিঁয়া কেঁও হো—'[১] এর প্রথম লাইনটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

খোঁচাটা শ্যাম বুঝতে পারল, বলল, 'প্রথম লাইনটা এরকম :

'মুশকিলে ইতনী পড়ী মুঝপর কি আসাঁ হো গই।'

আলিজু মুচকি হাসল। আসামীকে অত সহজে ফাঁদে ফেলা যাবে না দেখছি—সে বুঝতে পারল।

## ৩৪

শ্যাম থানায় গেল। দারোগা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো তার কথা। কথায় কথায় শ্যাম যখন আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করল, তখন দারোগা না হেসে আর থাকতে পারল না।

'হাসছেন কেন!' শ্যামের রাগ হয়ে গেল।

'এমন কথা আপনি বলছেন যে না হেসে থাকা যায় না।'

---

১। কাল যে বাজ পড়েছিল সেটা আমার বাসাতেই বা কেন পড়ল।

২। এত দুঃখ-কষ্ট পেলাম জীবনে যে এখন এতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।

'কেন ?'

'আপনি···মানে আপনার মতো শিক্ষিত ভদ্র, আইন-জানা লোক এমন কথা বলেন কি করে ?'

'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কথাটা আমিই বলেছি। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার ? এই তো আপনার সামনেই বসে আছি।'

দারোগা খুব ধীরে কিন্তু ধমকের সুরে বলল, 'আপনি যদি তহশীলদার সাহেবের ছেলে না হতেন, তবে···।'

'তবে কি হতো ?'

'আপনাকে হাজতে পুরে দিতাম।'

শ্যাম বলল, 'দারোগা সাহেব, কান খুলে ভালো করে শুনে রাখুন, আমি এই মুহূর্তে তহশীলদার সাহেবের ছেলে হিসেবে আপনার কাছে আসি নি, এসেছি মানুষের অধিকারে। মানুষের মান-সম্মান যে কি জিনিষ তা কি আপনি জানেন না ? আপনার কথাবার্তায় অবশ্য তাই মনে হচ্ছে। আর শুধু আপনি কেন, অনেকেই জানে না। প্রেম কি, তাও কি আপনি জানেন না ? আমার ধারণা ছিল আপনি অন্ততঃ জানেন। প্রথম যেদিন আমি এই উপত্যকায় আসি সেদিনকার একটা ছবি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে—পরদিন সকালে পথ ভুলে একটা ক্ষেতের আলের কাছে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা মেয়েকে দেখেছিলাম ভেড়া-ছাগল বের করে নিয়ে আসছে। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে, আর একজন পুরুষ ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল····ঠিক আপনার মতো দেখতে · গলায় একটা ক্ষত চিহ্ন···।'

শ্যাম চুপ করল। দারোগার মুখ ফ্যাকাশে।

'জীবন ভারী অদ্ভুত জিনিষ দারোগা সাহেব। এই নিয়মটা প্রেমের চেয়েও, জুলুমের চেয়েও অনেক বেশি বিচিত্র আর সুন্দর। আপনার কি মনে হয় ?' শ্যাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দারোগার চোখের দিকে।

দারোগা চোখ সরিয়ে নিলেন। থেমে থেমে বললেন, 'আমি ··এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পারছি না···ব্যাপারটা মনে থাকবে আমার।'

আদাব জানিয়ে শ্যাম বিদায় নিল ওখান থেকে।

সব কথা শোনানোর পর শ্যাম চন্দ্রাকে বলল, 'কাজটা তুমি ভালো করলে না। মনে হচ্ছে বিরাট ভুল হয়ে গেল। ও কিছুতেই শুনবে না আমাদের কথা।'

চন্দ্রা বলল, আমি বলছি কি, 'এখন আর ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে ভাববার সময় নেই। চেষ্টা করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও মেনে নেবে। ওকে মানতেই হবে। আমি নূরাঁকে পাঠাবো। আমি নিজে গিয়ে দারোগার পায়ে ধরব…,'কথা বলতে বলতে ও থেমে গেল। হয়তো শ্যামের মুখে নিরাশার ছাপ ফুটে উঠতে দেখেছে। খুব ভারী গলায় সে শ্যামকে বলল, 'তুমি আমাকে এখানে সাহস দিতে আসো, না নিরাশ করতে?'

'চন্দ্রা', শ্যাম ধীর গলায় বলল, 'আমি তোমার মতো মেয়ে খুবই কম দেখেছি।'

৩৫

অনেক ভেবে-চিন্তে দারোগা যে সিদ্ধান্তে এলো, তার ফলে মোহন সিং-এর পাহারা আরও জোরদার করা হলো। পাহারাদার সিপাহীদের সংখ্যা বাড়ল দ্বিগুণ। আর বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হলো যাতে মোহন কিছুতেই চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে না পারে। দরকার বুঝলে চন্দ্রাকেও গ্রেপ্তার করতে হবে, কিন্তু এখনই করলে গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে। মামলার ওপর ভিন্নতর প্রভাব পড়বে। দারোগা কিছুটা পরিমাণে নূরাঁকে আর শ্যামকে ভয় পাচ্ছিল। তবে বাইরে কিছু না করলেও, সিপাহীদের গোপনে নির্দেশ দেওয়া হলো চন্দ্রার ওপর কড়া নজর রাখার।

সিপাহীরা দারোগার নির্দেশ পেয়ে মোহন সিং-এর ওপর আরও কঠোর হয়ে উঠল। আগে বাথরুমে গেলে ওর হাত কড়াটা খুলে দেওয়া হতো, এখন সেটাও বন্ধ। সবকিছু মুখ বন্ধ করে সহ্য করছিল

মোহন সিং। প্রথমে বেশ রাগ হতো, এখন বুঝে ফেলেছে সিপাহীদের গালাগালি, দুর্ব্যবহার গায়ে না মাখলেই হলো।

সেদিন ব্যাণ্ডেজ পাল্টাবার সময় খুব কষ্ট হচ্ছিলো মোহনের। ডাক্তারের মতে দু-একটা ঘায়ের অবস্থা বেশ খারাপ, গ্যাংগ্রীন হয়ে যাবার আশংকা করছিলেন তিনি। গ্যাংগ্রীন? গ্যাংগ্রীন কাকে বলে কে জানে? তবে ভীষণ দুর্বল লাগছিল তার। সর্বাঙ্গে ব্যথা, কাতরাচ্ছিল মোহন সিং।

একটা সিপাহী বলছিল, 'শুনেছো হে, ব্যাটা কোনো অজানা জায়গায় পালাতে চায়।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'বাইরে থেকে এর প্রেমিকা চন্দ্রা পালাবার ব্যবস্থা করছে। ছোকরা বিলেত যাবে, সাহেব হয়ে যাবে।'

সব সিপাহী হো হো করে হাসতে লাগল।

···কে পালাচ্ছে? মোহন সিং চিন্তা করতে শুরু করল। তবে কি চন্দ্রা ওর পালাবার ব্যবস্থা করছে? ওর সারা শরীরে এক নতুন রক্তস্রোত বইতে লাগল। হ্যাঁ, ও যেন সত্যিই পালাচ্ছে। শরীর ভালো হয়ে গেছে, চন্দ্রাকে নিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় চলে যাচ্ছে। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? সেই অচেনা দেশে চন্দ্রাকে নীচ জাত বলে কেউ ঘেন্না করবে না। কথাটা কে বলেছে? ···কে বলেছে যেন?···বসন্তকিষণ চন্দ্রাকে ছোট লোক ভেবেছিল···হ্যাঁ ···কিন্তু সে তো···উঃ···কী ব্যথা···হে ঈশ্বর···করে, মুক্তি পাব এই ব্যথার হাত থেকে? পুঁজ পড়াটা কি বন্ধ হবে না? সারা শরীরে কে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে···।

খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল মোহন সিং-এর। কেন যে চন্দ্রা আসছে না? ও আসুক, মোহনের মাথায় হাত বোলাক? চন্দ্রা এখন কোথায়? কেন সে তার হাত-পা টিপে দিচ্ছে না? আরে আমার হাত-পা গেল কোথায়? আচ্ছা গ্যাংগ্রীন কাকে বলে? কী হয় গ্যাংগ্রীন হলে? ডাক্তারটাও কি সব উল্টো-পাল্টা বকছে?

হাসির শব্দ এসে লাগছে তার কানে। কারা হাসছে? সিপাহীরা?

…বন্দুকটা গেল কোথায়? কোথায় ফেলে এলো? রাস্তার ধারে ঝোপ…মাদী শূয়োরটা ছুটে আসছে…আর এই খাটে মুখ গুঁজে কে শুয়ে আছে…?…সাহস করে উঠে দাঁড়াও হে, সাহস কারো…দরজা খোলাই আছে…সিপাহীরা হাসি-ঠাট্টায় মত্ত…এই তো সুযোগ…কিন্তু ওকি জানে না জীবনে আর কখনও পালাতে পারবে না এখান থেকে? সিপাহীরা হাসছে। তাদের হাসির দমক কার্তুজের ছররার মতো বুকে এসে বিঁধছে…বড় কষ্ট, চন্দ্রা যদি এখনও এসে পড়ত…ও পাশ ফেরার চেষ্টা করল।

মোহন পাশ ফেরার চেষ্টা করছিল। চন্দ্রার বলিষ্ঠ অথচ কোমল হাতের স্পর্শ ও পেতে চায় নিজের বুকে। ওর হাতের ছোঁয়ায় পিঠের সব ব্যথা যেন দূর হয়ে গেল। ও এতো ঝুঁকে পড়েছে কেন মুখের কাছে? ওর চোখে জল কেন? ও আমার সোনামণি চন্দ্রা, কেন কাঁদছ তুমি? আমি ভালো হয়ে যাব, তারপর এই খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে যাব…অচেনা দেশ…শুধু তুমি আর আমি…চন্দ্রা তুমি কনে সাজবে!

চন্দ্রা কনে সেজেছে…মুক্তোর মালা, চামেলী আর গন্ধরাজ ফুল খোঁপায়, লাল ঘোমটায় মুখ ঢেকে চন্দ্রা এগিয়ে আসছে তার দিকে সলাজ ভঙ্গীতে। ঘরে ঢুকল চন্দ্রা, খুব কাছে এসেছে, এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে চন্দ্রা?…চন্দ্রা, আমি রাজপুত, কাউকে কোনো কথা দিলে প্রাণ দিয়েও তা রক্ষা করি। চন্দ্রার মুখ থেকে লাল ঘোমটার উড়নীটা খসে পড়েছে আমার মুখের ওপর। শরীরে আর কোথাও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই…হাত-পায়ের বেড়ি যেন ফুলের মালা হয়ে গেছে। কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে ফুলের মিষ্টি গন্ধ…।

কিন্তু ঐ লাল উড়নীটা আমার মুখের ওপর কেন পড়ল? এটা সরিয়ে দাও চন্দ্রা। মুখ থেকে সরাও, এটার জন্যে তোমার মুখ ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। চন্দ্রা…চারদিকে এত লাল কেন? শুধু লাল আর লাল…'চন্দ্রা…চন্দ্রা।'

সিপাহীরা ঘরের কোণে বসে তাস খেলছিল, মোহন সিং-এর

মুখে চন্দ্রার নাম শুনে ছুটে এল বিছানার কাছে।

মোহন সিং তখন কিন্তু আর বেঁচে নেই। অনেক আগেই ও বোধহয় মারা গেছে।

লণ্ঠণের মৃদু আলোতে সিপাহীরা কয়েদীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি যেমন কে তেমনই আছে, শুধু কয়েদী ওদের নাগালের বাইরে চলে গেছে বোকা বানিয়ে। হাতকড়ি সমেত হাত ছুটো বুকের ওপর, যেন কোনো মুক্তোর মালা চেপে ধরে আছে।

লণ্ঠণ নামিয়ে রাখল সিপাহীরা। মুখে তাদের কথা নেই। অদ্ভুত এক শোকের ছায়া নেমে এসেছে ঘরে···সকলেরই মুখে আতংকের ভাব।

দরজা খোলাই ছিল, কিন্তু বিয়ের কনের আর আসা হলো না। সে ওই ওয়ার্ডেরই দেওয়ালের ওপারে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছিল। ছুজনের মধ্যে পার্থক্য শুধু একটা দেওয়ালের। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তার কানে গেল না কোনো শব্দ। লাল উড়নীর বদলে তার মুখ ঢাকা ছিল একটা ছেঁড়া পুরনো কম্বলে। এবং সে জানতেও পারল না, দেওয়ালের ওপাশ থেকে ওর প্রেমিক আকুল হয়ে ডেকে চলেছিল কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। অথচ দরজা খোলাই আছে।

দরজা খোলা ছিল এবং মোহন সিং মৃত। অথচ কিছুই তো ঘটল না। মোহন সিং মারা গেল, অথচ বিশ্বসংসার ঠিক আগের মতোই বেঁচে আছে, কোনো পরিবর্তন ঘটল না। মোহন সিং মারা গেছে, অথচ কেউ কাঁদছে না। সিপাহীরা চুপ করে আছে, লণ্ঠন জ্বলছে, আর দেওয়ালের ওপাশে অন্ধকারের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে চন্দ্রার ক্লান্ত চোখ।

দরজা খোলা আছে, যত দিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন খোলাও থাকবে, অথচ সে আসতে পারবে না, কেন? সে যে দেওয়ালের অন্যদিকে আছে···।

কলেজের ছুটি একসময় ফুরোলো, শ্যাম এবার লাহোরে ফিরে যাচ্ছে। সেই গোলাম হুসেন ওর সঙ্গে যাচ্ছে। সেই পথ, সেই খচ্চর। হ্যাঁ, শুধু সেই সময় আর নেই, সেই আশাও নেই। সে নিজেও আগে যা ছিল তা নেই, অর্থাৎ তিনমাস আগে যখন ও ঐ উপত্যকায় এসেছিল। কল্পনা-প্রবণ, আশাবাদী এম. এ. ক্লাসের ছাত্র, যে জীবনের যৌবনকে আশার আয়নায় প্রতিফলিত দেখতে অভ্যস্ত ছিল। অথচ সামান্য এই কয়েক মাসে তার জীবনের অণু-পরমাণুতে, প্রতিটি রক্তবিন্দুতে এখন নিরাশার দোলা, ঠোঁটের হাসি ম্লান, চোখের দৃষ্টিতে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট। খচ্চরের পিঠে বসে অন্যমনস্ক ভাবে শুনে যাচ্ছিল। গোলাম হুসেনের বকবকানি, কোনোটারই অর্থ তার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল না, কারণ বোধশক্তি কাজ করছিল না ঠিকমতো। পৃথিবীর সবকিছুই এখন তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। উপত্যকাও যেন হারিয়ে ফেলেছে তার আগেকার সৌন্দর্য। সহসা ওর চোখের সামনে কলেজের ক্যাম্পাস ভেসে উঠল। মাঝখানে অশ্বত্থ গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসে আছে ইস্টিলা। গোলাপী গাল, মুখে পালিশ করা হাসি। ও যেন ইস্টিলাকে দেখে হেসে বলল, 'হ্যালো, হ্যালো।' আঙ্গুল দিয়ে গাল ছুলো ইস্টিলার। এই প্রেম কত অগভীর কত তুচ্ছ, 'তুমি আমার চিঠির উত্তর দাওনি কেন মানে কি হয়েছিল জানো…ওহ্ মাই ডার্লিং…আজ মেট্রোতে ড্যান্স আছে না…ও. কে., এই জীবন মিথ্যে…এই প্রেম মিথ্যে …অনন্তকাল ধরে মিথ্যে…হে ভগবান…এই মিথ্যের কি কোনোদিনও অবসান ঘটবে না?…হঠাৎ নাসপাতি গাছ থেকে একটা পাখি উড়ল কোথকে আর একটা পাখি এসে তার পাশাপাশি উড়তে উড়তে অসীমে বিলীন হয়ে গেল। মানুষ কেন পাখিদের মতো এত সহজ হতে পারে না।

এখন পাতাঝরার ঋতু…পথের দুধারে গাছ, টুপটাপ করে ঝরে

পড়ছে পাতা। মাঠ থেকে ঘাস কেটে নেওয়া হয়েছে; পৃথিবীকে এখন মনে হচ্ছে লোম কেটে নেওয়া ভেড়ার মতো। একটা ভাঙ্গাচোরা গাছ দেখে ওর চোখের সামনে অন্ধকারের এক কুণ্ডলী যেন সহসা আবির্ভূত হলো। দু-সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে···

বসন্তকিষণ বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। চন্দ্রার কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। সেই রাত থেকেই ও নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, অনেকে বলে ও আত্মহত্যা করেছে। বন্তীর বিয়ের তারিখও এগিয়ে আসছিল এবং পৃথিবীর সবকিছুই যেন শ্যামের কাছে তিক্ততায় ভরে উঠেছিল এক বিজাতীয় দুঃখের দহনে তার সমগ্র জীবন আর পরিবেশ যেন ভস্মে পরিণত হয়ে গেছে।

এই বিচিত্র অনুভূতি তাকে ভীষণভাবে করে তুলেছিল অলস। বাড়ী থেকে বের হতো না, কারুর সঙ্গে দেখা করতো না। হয় বিছানায় শুয়ে, না হয় ঐ কুঞ্জে গিয়ে বইতে মুখ গুঁজে সময় কাটাতো শ্যাম। চারদিকে নিস্তব্ধতা এবং শূন্যতার সাম্রাজ্য। তার মনে হতো সেও যেন ঐ নিস্তব্ধতার, শূন্যতার একটা অংশ হয়ে উঠেছে। এই নিস্তব্ধতায় চিন্তাশক্তি নেই, বোধশক্তি নেই, অনুভব করতে পারে না, ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে জানে না···অর্থাৎ থেকেও নেই। ঠিক তেমনি খাওয়া-পরা, ঘুমোনো আর জাগা, জীবনের সমস্ত কাজগুলো যেন ঘটে চলেছে, অথচ ঘটছে না। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দোলায়িত হয়ে চলেছে। সে আছে, অথচ না থাকারই মতো করে

দিন কেটে যাচ্ছে অথচ সময় স্থির হয়ে আছে ····আর এক নিরলম্ব শূন্যতার মধ্যে পাথরের প্রাণহীন মূর্তির মতো শ্যাম দোদুল্যমান।

···ছায়া জানাল যে তহশীলদার সাহেব তার দরখাস্ত না মঞ্জুর করে দিয়েছেন।

'কি হলো?' নিরাসক্ত গলায় শ্যাম প্রশ্ন করল।

ছায়া খুব অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মামলা খারিজ হয়ে গেছে। বলেছেন, এমন কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না যাতে

রোশনলালের অভিভাবকত্ব বাতিল করা যেতে পারে। আসলে রোশন-লাল অফিসে গিয়ে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলে এসেছে। বন্তীর সঙ্গে দুর্গাদাসের বিয়ের কোনো পরিকল্পনাই নাকি তার মাথায় নেই।'

'তারপর?'

'মোকদ্দমা খারিজ হয়ে গেল। তবে আমি জানি ও গোপনে বন্তীর বিয়ে দিয়ে দেবে।'

'তারপর?'

'ভগবানের দোহাই একটা কিছু করো তুমি।'

'হুঁ।'

'শ্যাম, তুমি কি বন্তীর কথা একটুও ভাবো না?'

'হুঁ।'

'শ্যাম, তোমার বাবাকে তুমি বলো বিয়েটা বন্ধ করে দিতে।'

'হুঁ... আজই বলব।'

'তুমি বলো বা না বলো, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেবো না?' ছায়া রাগ করে কথাগুলো বলে এখান থেকে চলে গেল।

এত রেগে গেল কেন? এরা একটুতে এতো রাগে কেন? ছায়া এত তাড়াতাড়ি কেন চলে গেল? এতো ব্যাকুলতা কিসের? এখানে এই পাথরের ওপর প্রস্তরমূর্তির মতো বসে থাকাই অনেক ভালো কিন্তু ভগবানের দোহাই কিছু একটা করো...'হ্যাঁ, আজই ওঁকে বলব,'— কিন্তু কি বলবো? কাকে বলব? কিন্তু একটা কিছু বলতে তো হবেই? হবেই? কি বলব বাবাকে?

'বাবা, আমি বন্তীকে বিয়ে করতে চাই।' চুপ, নির্বোধ...'বাবা বন্তীর সঙ্গে দুর্গাদাসের বিয়ে হওয়া উচিত নয়...আসলে বন্তী তো দুর্গাদাসের বৌ হবে না, বৌ হবে স্বরূপকিষণের।'...এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?...'বাবা, ব্যাপারটা আমাকে নিয়ে।'...আমি তোমার ব্যাপারটা তোমার চেয়ে ভালো বুঝি।...তহশীলদার সাহেব দরজা বন্ধ করে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন...আর শ্যাম চিৎকার করে উঠল —'বাবা, শুনুন, বাবা, একটা কথা শুনুন...।''কিন্তু উত্তর এলো না...।

এর দুদিন পরে বন্তীর বিয়ে হয়ে গেল। বন্তীর বিয়েতে গ্রামের সকলে উপস্থিত ছিল।, তহশীলদার সাহেব ও তাঁর স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। বন্তীর বিয়ে হচ্ছিল এবং বিবাহমঞ্চের পাশে চারপাইয়ে বসে অসুস্থ বসন্তকিষণ লোলুপ দৃষ্টিতে বৌমার রূপ-যৌবন দেখছিল, বন্তীর মুখ বরফের মতো সাদা, বরং বলা যায় সে যেন এক বরফের প্রতিমার মতো রক্তশূন্য এবং প্রাণহীন অবস্থায় ছিল। আর পা ঘেঁসটে চলা দুর্গাদাসের ভূত গাঁটছড়া বেঁধে বন্তীকে নিয়ে প্রদক্ষিণ করছিল বিবাহের মঞ্চ...সৌন্দর্য এবং পশু···ফ্রাঙ্কেন স্টাইন ও নিষ্পাপ সরলতা। কারণ বন্তী 'বন্তী' ছিল না, সে ছিল 'লাজবন্তী'। লজ্জাবতী লতার মতো ··স্পর্শ করলেই সংকুচিত হয়ে যায়। মরণে মরে যাবে, তবু মনের কথাটি প্রকাশ হতে দেবে না। বন্তী ছিল আলোর উজ্জ্বল প্রতিমা, কিন্তু সম্প্রদান হয়ে যাবার পরেই সে হয়ে উঠল তুষারের প্রতিমা। চাইলেও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তার নেই। কারণ তুষার তো জমে থাকে। হায়, ওই তুষার-প্রতিমা যদি কথা বলতে পারতো....।

বন্তীর বিয়ের সময় ছায়া কিন্তু উপস্থিত ছিল না। শোনা যায়, রোশনলাল তাকে একটা ঘরে বন্দী করে রেখে দিয়েছিল, আর সারাদিন সারারাত ছায়া ওই ঘরে বুক চাপড়ে কেঁদেছিল। অথচ কেউ ওর কান্না শোনেনি। কারণ ছায়ার কান্না মাটির পাঁচিল ভেদ করে বাইরে এলেও শোনার লোক কেউ ছিল না—গ্রামের সকলেই যে তখন চলে এসেছিল বন্তীর বিয়ে দেখতে। মাটির দেওয়াল সব জেনেও চুপ করেছিল, কারণ কিছু করার ক্ষমতাই যে তার নেই। সে বন্দী করে রাখতে পারে, পথ করে দিতে পারে না। বেপরোয়া করতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা দিতে পারে না। ছায়া বন্দিনী ছিল এবং বন্তীর বিয়ে হচ্ছিল।

বন্তীর বিয়ে হচ্ছিল এবং তহশীলদার সাহেব ছায়ার দরখাস্ত খারিজ করে দিয়েছিলেন, কারণ নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে রাজী হন না কোনো। মা বাবাই সমাজ তার সুরক্ষিত চার দেওয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে আর একজনকে পালিয়ে যেতে দেয়নি, তাই তহশীলদার

সাহেব হাসছিলেন, তাঁর স্ত্রী হাসছিলেন, রোশন হাসছিল, স্বরূপকিষণও হাসছিলেন, এবং তাঁর স্ত্রী এই সুযোগে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিল পাশের ভুট্টা ক্ষেতে এবং এক শক্তসামর্থ কৃষকের কোলে বসে হাসছিল···অর্থাৎ সমগ্র সমাজই বেশ সুখে ছিল। কি সুন্দর একটা বিয়েই না হচ্ছে। এমন কি মাঠের চারাগাছগুলো পর্যন্ত খুশিতে নাচছে।

বন্তীর বিয়ে হচ্ছিল এবং আকাশে ভস্মাচ্ছাদিত চাঁদ, সারা আকাশে কে যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে। একটা ছোট আখরোট গাছের কাছে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল একটা মূর্তি। প্রায় তার পায়ের কাছ থেকেই শুরু হয়েছে ভুট্টার ক্ষেত আর একটু দূরে স্বরূপকিষণের বাড়ী, সেখান থেকে হৈ-হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে।

দেখতে দেখতে সারা উপত্যকায় সানাইয়ের সুরের প্লাবন · মনে হচ্ছে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত ভরে গেছে তার সুর। সুরগুলো কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশঃ আর্তনাদে পরিণত হচ্ছিল। এখন সানাইকে আর আনন্দের প্রতীক বলে মনে হচ্ছে না, একটা আহত পাখি যেন ওড়বার চেষ্টা করছে।...বুলবুলির করুণ সুর...মৃত্যু...বিয়ের সানাই... মৃত্যু...বুলবুলির করুণ সুর...মৃত্যু ..কীটস বলেছেন—টু সিঙ্ক আপন দ মিডনাইট উইথ পেন—বোধহয় কীটস সত্যিকথাই বলেছেন। সানাইয়ের সুরে যেন শ্মশানের গন্ধ...বেদীতে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড—দুর্গাদাস আর বন্তী প্রদক্ষিণ করছে সেই পবিত্র বেদী।

. দুটো জোনাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সামনে। ধরতে পারছে না, ইচ্ছেও নেই। কে যেন বলছে ··'এতো সুখ আমি সহ্য করতে পারব না। এই মুহূর্তে মরে গেলেই ভালো—যতদিন বেঁচে থাকবো তোমাকে ছেড়ে যাবো না'—এখন কিন্তু ও আর বেঁচে নেই—পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। অথচ শুনতে পাচ্ছে—'ওহ্ মাই ডার্লিং'। বন্তীর ঠোঁট স্পর্শ করল তার ঠোঁট, দুজনে জড়িয়ে ধরল দুজনকে 'ওহ্ মাই ডার্লিং ··' অথচ ওর ঠোঁট প্রাণহীন....এবং চাইলেও বন্তীকে চুম্বন করতে পারছিল না সে।

বন্তীর বিয়ের আসরে ঢোলোক বাজিয়ে মেয়েরা বিয়ের গান গাইছে

…আকাশে চাঁদ, আখরোট গাছের তলায় আলো—আঁধারের খেলা… সেখানে দাড়িয়ে আছে এক নিঃসঙ্গ প্রাণী নির্জীব, শান্ত, নিশ্চেষ্ট। তার কানে গানের সুরগুলো আহত পাখির আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে —'ওহ্ মাই ডার্লিং।'

আখরোট গাছে ঠেসান দিয়ে ও এক অসীম উদাসীনতায় লক্ষ্য করে যাচ্ছিল সবকিছু…আকাশে চাঁদ…পাখির আর্তনাদ…বন্তীর বিয়ে…।

এইভাবে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে এক অনন্ত শূন্যতায় ভেসে বেড়াল সে বেশ কিছুদিন। কতদিন সে খায় নি, কোথায় শুয়েছে, কোথায় গেছে খেয়াল নেই। ওর মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, বাবার চোখে জল, ছায়াকেও ওর মাথায় হাত বোলাতে দেখেছে। নায়েব তহশীলদারের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, সইদার পরনিন্দা শুনেছে।

…চন্দ্রা পাগল হয়ে গেছে। গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, জামাকাপড় ছেঁড়া, সকলকেই ও মোহন সিং মনে করে টেনে নিয়ে যেতে চায় ভূট্টার ক্ষেতে…মুখ দিয়ে লালা পড়ে সবসময়ে…আজ বন্তী ধর্মশালায় গিয়েছিল পূজো করতে। রেশমের ঝলমলে পোশাক, নাকে মুক্তোর নাকছাবি, বান্ধবীদের সঙ্গে নদীতে ফুল ভাসিয়ে এসেছে…ওর সম্বন্ধী এসে গেছেন…আশীর্বাদের সময় আসতে বলা হয়েছিল তাকে। বাগানে চেয়ার পেতে শ্যামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল…মায়ের মন প্রসন্নতায় ভরা, বাবাও ভারী মিষ্টি করে কথা বলছেন। ও খাবারও খাচ্ছিল…বেড়াতেও যাচ্ছিল কুঞ্জে গিয়ে বই পড়াও বন্ধ হয় নি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে তার অসুবিধে হচ্ছিল না যে সে আর আগের মতো নেই। সে যেন অন্য একজনকে ঐ কাজগুলো করে যেতে দেখছে চোখের সামনে।

আশীর্বাদ!…কার আশীর্বাদ হচ্ছে? কিসের এই আয়োজন? সামান্য একটা সিঁদূরের টিপ কপালে লাগিয়ে দিলেই তা কেন শত শত বছর ধরে কুষ্ঠের দাগের মতো রয়ে যাবে? আশ্চর্য লোক এরা… জীবনটাও কত বিচিত্র। শ্যামের মাঝে মাঝে মনে হয় চন্দ্রার মতো সেও পাগল হয়ে গেছে। এক মৃত আত্মাকে সানাই, ঢোলক আর

মিছরীর স্তূপের তলায় সমাধিস্থ করা কত সহজ। যার বুক থেকে ভালোবাসার হৃৎপিণ্ডটিকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তার কপালে আশীর্বাদের জয়টিকা পরাবার কোনো দরকার আছে কি? বিয়ের আশীর্বাদ? কি চমৎকার জিনিষ এই আশীর্বাদ···একটা মৃত আত্মা অপর এক তুষরের প্রতিমূর্তিকে গাঁট ছড়ায় বেঁধে বেদীর চারপাশে ঘুরবে···হোম শিখা জ্বলবে, সানাই বাজবে···চমৎকার খেলা···আর এই বিচিত্র খেলাটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে আখরোট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখতে ভালই লাগে···তার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না?

ক্ষতি হচ্ছে না? আশীর্বাদের দিন ছিল সেটা, সানাই বাজছিল। বাগান আর বাংলো দারুণ সাজানো হয়েছিল। মেয়েরা সুন্দর সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরুষরা ধপ্‌ধপে সাদা পোশাক পরেছে, কেউ কেউ খুব বেশি সাদা করার জন্যে বিশ্রী নীল দিয়ে ফেলেছে।···আহা বেচারী গাঁইয়া মানুষ।···এই মেয়েটা কে? বেশ দেখতে তো? ওই তো তহশীলদার সাহেব···ঐ ওঁর ভাবী বেয়াই ওপাশে তহশীলদার সাহেবের স্ত্রী···ছায়াও আছেন আর এপাশে এই চামচিকেটা অন্ধকার ঘরে দেওয়ালে মাথা কুটে মরছে, বেরিয়ে আসতে পারছে না।···নমস্কার পণ্ডিতজী···আহা···তহশীলদার সাহেবের স্ত্রী পণ্ডিত স্বরূপকিষণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। অজন্তার প্রতিমূর্তির মতো গম্ভীর হয়ে বসে আছেন পণ্ডিতজী···তিনি বেঁচেই আছেন ভালোভাবেই বেঁচে আছেন··· সাফল্য তাঁর করায়ত্ত· তাঁর সভ্যতা, সংস্কৃতি, কলা, সাহিত্য সব কিছুই বেঁচে আছে। গলার ওপর দিয়ে দুপাশে ঝুলে আছে শ্বেত শুভ্র চাদর·তুই আমাকে মৃত মনে করেছিলিস···মূর্খ, আমার হাসি দেখ, আমার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোন, আমি বেঁচে আছি, খালি মাঝখান থেকে তুই মরে ভূত হয়ে গেছিস···সমাজের আত্মা আমার হাতের মুঠিতে···তুই শুধু মূর্খের মতো কল্পনার জগতে ওড়ার চেষ্টা করেছিলি···

হোম শুরু হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক পড়ে চলেছেন। হুতাহুতি দেওয়া হচ্ছে। একটা থালায় চাল, জাফরান, সিঁদুর, গোলাপের

পাপড়ি, সুগন্ধী জল, ঘিয়ের প্রদীপ। 'জীবন কোথায় গিয়ে তার চলা শেষ করবে কে জানে। ঘোড়ার লাগাম হাতে নেই, রেকাবেও পা রাখতে পারি নি'—অথচ এখন লাগাম তার হাতে, রেকাবেও পা আছে, এবং গোলাম হুসেনও সঙ্গে চলেছে।

...সানাই বেজে চলেছে, ঢোলক বাজছে, গান হচ্ছে...হঠাৎ পণ্ডিত স্বরূপকিষণ ইশারা করতেই সকলে চুপ করে গেল। শুধু হোমের কাঠগুলো মাঝে মাঝে শব্দ করে পুড়ছিল...যেন জীবিত কোনো মানুষকে পোড়ানো হচ্ছে সেখানে। পণ্ডিতজী তখন শেষ শ্লোকটি পড়ছিলেন, এর পরেই চন্দন, জাফরান সিঁদুর আর গোলাপ জলের টীকা পরানো হবে তার কপালে। কী মজার এক তামাশা এবং সে একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে দৃশ্যটা দেখে চলেছে।

পণ্ডিতজী হাত নেড়ে কি যেন বললেন, এবং তহশীলদার সাহেবের স্ত্রী থালাটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করলেন। কী হচ্ছে এটা? হায় ভগবান, মহিলা যে আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। যে আমি ওঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে বেশ দূরে একটা পাথরের ওপরে বসে আছি। এখন সবাই ওর দিকে তাকিয়ে. মেয়েদের দল ওকে লক্ষ্য করে হাসছে। এটা একটা অদ্ভুত তামাশা, এতে না আছে আনন্দ, না দুঃখ। মহিলা মিষ্টি হেসে ওর দিকে এগিয়ে আসছেন, সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে কখন কুষ্ঠরোগের টীকা এঁকে দেওয়া হবে ঐ পাথরের মূর্তির কপালে। না, না, এই আশীর্বাদ তার নয়, ও তো পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে, ও কোনো পাপ করে নি, করতে পারে না। আমি তো শুধু দর্শক' তোমাদের তামাশা দেখে চলেছি। ঐ কুষ্ঠ যেন আমাকে না স্পর্শ করে। ওটা তো সিঁদুরের টীকা নয়, জ্বলন্ত মশাল, সেই মশালের আগুনে আমি জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাব... না, না, আমি এমন কোনো অপরাধ করিনি যে পুড়ে মরতে হবে......

হঠাৎ ওর কানে এলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট মেয়ে বলছে, বন্তী মরে গেছে...বন্তী মরে গেছে।'

ওই পাথরের মূর্তি হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে গেল। এক ঝটকায় মার হাত কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে ও ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, সাদা চাদরের ওপর ছিটকে পড়ল থালাটা।

৩৭

শ্যাম ছুটে চলেছে, পিছন থেকে তার মা-বাবা এবং চাকরবাকররা ছুটছে, ডাকছে তার নাম ধরে। ওর অবশ্য মনে হচ্ছিল কারা যেন অন্য এক দেশ থেকে তার নাম ধরে ডাকছে। মানুষের ঐ কোলাহল তার কানে ঢুকছিল অসংখ্য কামানের গর্জনের মতো মৃত্যুর সংকেত নিয়ে, বন্তী মরে গেছে...'বন্তী মরে গেছে'...। ঐ বজ্রপতনের গর্জনে তার কানের পর্দা যেন ফেটে গেছে, তবু ও শুনতে পাচ্ছিল 'বন্তী মরে গেছে।' ...বন্তীর মৃত্যু সংবাদ কানে যেতেই শ্যাম তার অনুভূতিগুলো ফিরে পেয়েছে। সারা শরীরের রোমকূপে অসহনীয় জ্বালা। শ্যাম ছুটছিল স্বরূপকিষণের বাড়ীর দিকে।

বন্তী স্বরূপকিষণের বাড়ীতেই ছিল। সকালে নদীতে স্নান করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। স্বরূপকিষণের স্ত্রী দুর্গা হবে ভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলেন বন্তীর মৃত্যুতে তিনি খুশি। কারণ বন্তীর পবিত্র যৌবন, এবং ফুলের মতো নিষ্পাপ সৌন্দর্য দুর্গার কুৎসিত রূপ এবং প্রৌঢ়ত্বকে আরও বেশি প্রকট করে তুলছিল। ঐ বিয়েতে বন্তী যে সুখী হয় নি এটা দুর্গা জানতেন। সুখী হতেও পারে না। দুর্গাদাসকে বলতে গেলে তাড়িয়েই দিয়েছে বন্তী, কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। গোলাপের মতো সুন্দর মুখখানিতে এখন বিষণ্ণতার ছাপ, চোখে হিমশীতল দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যায় দুর্গাদাস আর স্বরূপকিষণ। দুর্গার ধারণা বন্তী মেয়েটাই অপয়া।

বিয়ের পর বন্তীর সখীরা তাকে হাসাবার কতো চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। খুব হাসির কথা বললে, ঠোঁটে হাসির রেখা ভেসে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যেতো।

বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরেও বন্তীর ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছিল। একলা বাড়ী থেকে বেরোনো নিষিদ্ধ তো ছিলই, ঘরেও কখনো একা থাকতে দেওয়া হতো না। অবশ্য বন্তী কিছুই অনুভব করতে পারতো না। সে যেন সবসময়ে অন্য এক জগতে বিচরণ করত। সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার উর্দ্ধে চলে গিয়েছিল বন্তী। তার চোখে নেমে এসেছিল মৃত্যুর করাল ছায়া…।

যখন ওর সখীরা ওকে জানালো তহশীলদার সাহেবের ছেলের বিয়ের আশীর্বাদ বিয়ের চেয়েও বেশি জাঁকজমক করে করা হচ্ছে, তখনও ওর চোখে-মুখে কেউ কোনো ভাবান্তর দেখতে পায়নি। বন্তীর হৃদয়ের গভীরে কী হয়েছিল কেউ জানে না, তবে তার ঠোঁটে ফুটে উঠেছিল এক বিচিত্র হাসি, তাতে তিক্ততা, মাধুর্য আর মমতাও ছিল। সে হাসির মর্ম তখন কেউ বোঝেনি।

সখীরা জিজ্ঞেস করেছিল তহশীলদারের ছেলের আশীর্বাদে বন্তী যাবে কিনা? বিচিত্র হাসিতে ভরে উঠেছিল তার মুখ, 'নিশ্চয়ই যাব।' আশীর্বাদের দিন সকালবেলাতেই সখীদের নিয়ে স্নান করতে গেল বন্তী। এদিন আর মান্দর নদীতে না, অনেকটা দূরে রোড়ীনালায়। একটা জায়গা একটু ঘিরে সুন্দর ঝিলের মতো করা আছে ওখানে। পাশে বুনো ডুমুরের গাছ।

স্নানের পর বন্তী পোশাক পাল্টালো। আজ সেই পোশাকটাই পড়েছে যেটা সে গঙ্গু মিশরের ছেলের বিয়ের দিন পরেছিল। আপন মনে বন্তীকে হাসতে দেখে সখীরা একটু ঘাবড়ে যায়। কিন্তু তাদের রঙ্গ-রসিকতায় সাড়া না দিয়ে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। অপূর্ব সুন্দর লাগছিল তাকে। দূরে গরু চরাবার মাঠে কুয়াশা ছড়াচ্ছিল। আজ শ্যামের সঙ্গে তার দেখা হবে, পিয়া-মিলনের সেই শুভ লগ্নটির কথা চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্কের মতো পথ হাঁটছিল বন্তী।…দূরে নীলাধারা পাহাড়ের গায়ে ঝোপ, তার পাশে প্রিয়তম শ্যামের কোলে মুখ রেখে শুয়ে আছে সে…অসংখ্য ফুল ঝরে পড়ছে যেন আকাশ থেকে …সেই অনাস্বাদিত সুখের অনুভূতিতে হঠাৎ পা টলতে লাগল বন্তীর,

সারা পৃথিবী দুলে উঠল। মাটিতে লুটিয়ে পড়া বন্তীর দেহ আঁকড়ে ধরে সখীরা চেঁচামিচি শুরু করে দিল। আস্তে আস্তে বন্তীর নিঃশ্বাস মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে একসময়ে নেমে গেল।···দুটো ঠোঁট, কখনো তার ঠোঁট, কখনো গলা, কখনো ঘাড় স্পর্শ করে যাচ্ছে··· দুটো জোনাকী জ্বলছে আর বলছে—'যতদিন বেঁচে থাকবো তোমায় ছেড়ে যাবো না···'

সখীদের শত চিৎকারেও বন্তীর ঘুম ভাঙল না। কারণ সে তো অনেক···অনেক দূরে চলে গেছে। একটা গাছের তলায় পড়ে আছে বন্তীর দেহ···সেই গাছের ডালে বসে সবুজ রঙের টিয়াগুলো যেন বলছে, 'বন্তী ওঠো, বন্তী জাগো··আজ তোমার প্রিয়তমের জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভদিন···দেখো পাহাড়ে অন্ধকার নেমে আসছে···সূর্যের সোনা নদীর বুক বেয়ে বয়ে চলেছে···ওঠো বন্তী···লাজবন্তী···লজ্জাবতীর মতো লাজুক কুমারী তুমি, জেগে ওঠো, দেখো তোমার প্রিয়তমের কপালে আশীর্বাদের মঙ্গল-চিহ্ন, তোমার সিঁথিতে সিঁদুর শোভা পাচ্ছে। ওঠো ···গাছের ডালে গোলাপী ফুল···তোমার প্রিয়তমের স্পর্শের মতোই কোমল, মধুর···ওঠো···।

টিয়ারা অনেক ডাকলো বন্তীকে, সখীরাও অনেক চেষ্টা করল বন্তীর ঘুম ভাঙাতে, কিন্তু উপত্যকার ঐ সৌন্দর্য; পাখির ঐ গান বা অন্য শত প্রলোভনেও সাড়া দিল না সে।

বন্তীর মা, শ্যাম, পণ্ডিত স্বরূপকিষণ, দুর্গাদাস এবং আরও অনেকে পৌঁছে গেছে ঐ গাছের তলায়। শ্যাম এগিয়ে গিয়ে দুহাতে তুলে নিল বন্তীর দেহ। তার কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে মাটি পর্যন্ত। বন্তীর সজল চোখে এক অতল হ্রদের গভীরতা; সেখানে শুধু শান্তির আশ্বাস। বন্তীর বুকে মাথা গুঁজে পাগলের মতো কাঁদতে লাগল শ্যাম, 'হে মাই ডার্লিং···', 'হে মাই ডার্লিং··'

···এখন শ্যামের শুধু এইটুকুই মনে আছে মান্দরের নদীর তীরে জ্বলছে একটা চিতা, তার শিখাগুলো নাচছে নদীর তটরেখায়। এক শ্বেত হিমশিলা রূপোলী ভস্মে পরিণত হয়ে চলেছে চোখের সামনে।

বাতাসও যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আকাশে মেঘ। চিতার কাছে একটা গাছ, তার ফলফুল সব ঝরে গেছে। বসন্ত তাকে রিক্ততায় ভরিয়ে দিয়ে গেছে যেন। মৌনতার প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গাছটা। চিতা জ্বলছে…তুষারের মূর্তি ধীরে ধীরে রূপোর বিভূতি হয়ে যাচ্ছে।

চিতার কাছে দুর্গাদাস দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে। আগুনের শিখায় তাকে এক বীভৎস ভূতের মতো দেখতে লাগছিল। শ্যামের ছায়াও কাঁপছিল ভূতের মতো; বলভদ্র, স্বরূপকিষণ সকলেরই ছায়া চিতার অগ্নিশিখার কম্পনে ভূতের মতো দেখাচ্ছিল…আর এই মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা চিতা জ্বলছিল হু হু করে।

…এবং সেই গাছটি নিঃসঙ্গতার প্রতিমূর্তির মতো একা দাঁড়িয়েছিল।